ভারতের সাধনা

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কার্ত্তিক, ১৩২৯।

উদ্বোধন কার্য্যালয়

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।

[মূল্য ১৷৹ টাকা।
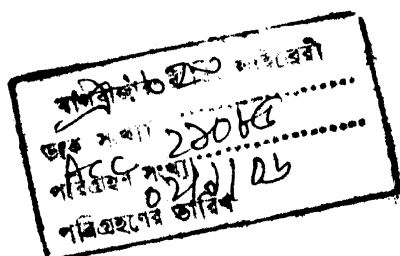
দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"ভারতের সাধনা"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। মূল গ্রন্থের সহিত ভাব ও যুক্তির ঐক্য ও পারম্পর্য্য দেখিয়া এবং উহার পাঠ ও বোধে অনেকটা সহায়তা হইবে ভাবিয়া, বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থকার-লিখিত পুরাতন "উদ্বোধনে" প্রকাশিত দুইটী নূতন প্রবন্ধ গ্রন্থশেষে "পরিশিষ্ট"রূপে এবং একটী তদানীন্তন অপ্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থপ্রারম্ভে "সূচনা"রূপে -সংযোজিত করা হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থের কলেবর প্রায় ৭৫ পৃষ্ঠা বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমরা উহার মূল্য কিঞ্চিৎ বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। বর্ত্তমান সংস্করণ খানি পাঠকবর্গের নিকট অধিকতর উপাদেয় হইলে, এবং বহু সমস্যাসঙ্কুল বর্ত্তমানকালে জাতীয়-জীবনের যথার্থ পথনির্ণয়ে অধিকতর সহায়তা করিলে, আমাদের উদ্দেশ্য সফল মনে করিব। ইতি—

বিনীত—

প্রকাশক।

সূচীপত্র

ভূমিকা।

"ভারতের সাধনা" প্রকাশিত হইল। ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে যখন ইহা "উদ্বোধন"পত্রে সাধারণের গোচরে প্রথম উপস্থিত হয়, তখন হইতে ইহার মৌলিকতাপূর্ণ গবেষণা চিন্তাশীল পাঠকবর্গের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণেতিহাস অবলম্বনে ভারতের জাতীয়তার ভূতপূর্ব্ব স্বরূপ নিরূপণ পূর্ব্বক উহার ভবিষ্যৎ গঠনপ্রণালী বিষয়ে লেখক ইহাতে যে সকল মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন, সেই সকল যে বর্ত্তমান ভারত-ভারতীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য একথা তাঁহারা প্রায় একবাক্যে স্বীকার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন আমরা, শত বর্ষেরও অধিককাল হইতে চলিল, পাশ্চাত্যের চক্ষু দিয়া ভারতকে দেখিয়া আসিতেছি; সুতরাং প্রাচীন ভারতের গৌরবের কথা ইতিহাসাদিতে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইলেও পাশ্চাত্যভাবমাত্রপরিশূন্য ভারতের তাৎকালিক জাতীয়তার যথার্থ স্বরূপ কীদৃশ ছিল—তাহা ধারণা করা দূরে থাকুক, কল্পনাতে আনয়ন করিতেও কিছুকাল পূর্ব্বে সক্ষম হইতাম না। দেশে পাশ্চাত্য ভাব ও ভাষা-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বাস্তবিক এমন একটা সময় গিয়াছে, যখন পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ হইয়া আমরা প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্ম্ম-কর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই নিন্দনীয় এবং বর্ব্বরতার পরিচায়ক জ্ঞানে দূরপরিহার করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম। মহামনীষী রাজা রামমোহন রায়কে দীর্ঘ

সুষুপ্তিমগ্ন ভারতে প্রথম জাগ্রত ব্যক্তি বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন—কথা অনেকাংশে সত্য হইলেও তিনিও যে আপনাকে ঐ পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ দূরে রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। দেশে স্বাধীন-চিন্তার স্রোত পুনঃপ্রবাহিত করিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী ও ইংরাজী ভাষার প্রবর্ত্তনরূপ যে উপায় তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাতে তাঁহার অসাধারণ ত্যাগস্বীকারাদির কথা সত্য হইলেও, উহা যে তাঁহার অন্তরে পাশ্চাত্যভাবপ্রাধান্যের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমিত হয়। দিব্যপ্রতিভাসম্পন্ন স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে বারম্বার বলিয়াছিলেন,—"রাজা রামমোহন ইংরাজীভাষার প্রাধান্য স্বীকারপূর্ব্বক বিদ্যালয়সমূহে উহার প্রচলন করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসরের জন্য উহাতে দেশটাকে পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ঐরূপ না করিয়া, যদি তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রচলন রাখিতেন এবং পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানাদি বিদ্যা ও গ্রহণযোগ্য চিন্তাসমূহ ঐ ভাষায় অনূদিত করিয়া গ্রন্থাবলী প্রকাশপূর্ব্বক বিদ্যালয়সমূহে পঠন-পাঠন করাইতেন, তাহা হইলে অতি শীঘ্রই দেশময় ঐ সকলের প্রচার সাধিত হইয়া সমগ্র জাতিটা উন্নতির পথে অগ্রসর হইত।" স্বামীজীর ঐ কথা তখন বুঝিতে না পারিলেও এখন বুঝা যায় যে, যে প্রণালী অবলম্বনে দেশের লোক নূতন ভাব ও সত্য গ্রহণে বহুকাল অভ্যস্ত হইয়াছিল, ইংরাজী ভাষার প্রচলনে সেই প্রণালী এককালে দূরপরিহৃত হওয়ায় দেশের জনসাধারণের ঐ সকল ভাব ও সত্য গ্রহণে অনর্থক অনেক বিলম্ব হইয়াছে ও হইতেছে। রাষ্ট্রনীতিকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্ব্বক ভারতের জাতীয়তার পুনর্গঠনে যাঁহারা অধুনা

বদ্ধপরিকর, তাঁহারা যে ঐরূপ ভ্রমের পুনরভিনয়ে নিযুক্ত নহেন—একথা কে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে ?

পাশ্চাত্য মোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া ভারতের জাতীয়তার যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের প্রাচীন শিক্ষা-দীক্ষা-গঠিত শ্রীভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাশ্চাত্যভাবমাত্রপরিশূন্য অলোকসামান্য জীবনের সহিত পরিচয়ই যে তাঁহাকে ঐবিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য ভাবে ভাবিত স্বামীজী, ঐ জীবনের সংঘর্ষে আসিয়া, প্রতি পদে উহাকে পরীক্ষাপূর্ব্বক যে সত্যে পৌঁছিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরে বিষম ভাবপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল। বিস্মিত হইয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন—এই কঠোর সংযম ও গভীর আত্মত্যাগ, এই তীব্র নিষ্ঠা ও অসীম উদারতা, এই নির্ভীক সত্যানুরাগ ও তন্ময় ধ্যানশীলতা, এবং সর্ব্বোপরি এই অপার করুণা, মাধুর্য্য, শ্রদ্ধা ও প্রেম যদি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, দীক্ষা ও জাতীয়তার ফলস্বরূপে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাশ্চাত্য বিদ্যাভিমানে আমরা উহাদিগের যে মূল্য এতদিন নির্দ্ধারিত করিয়া আসিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম হইয়াছে। সিষ্টার নিবেদিতা, তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম সম্মিলনকে 'প্রাচীন ও বর্ত্তমান ভারতের পরস্পর পরিচয় লাভপূর্ব্বক প্রেমসম্বন্ধে চিরসম্বদ্ধ হওয়া'রূপে বর্ণনা করিয়াছেন; একথা বাস্তবিক সত্য। কারণ, উহা হইতেই বর্ত্তমান ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়াছিলেন—ত্যাগ ও চরমসত্যের অপরোক্ষজ্ঞানকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বন করিয়াই ভারতের জাতীয়তারূপ সুমহান্ সৌধ চিরকাল দণ্ডায়মান রহিয়াছে,

ঐ জাতীয়তার প্রাণশক্তি ভারতের ধর্ম্মের ভিতরেই নিহিত,—হিন্দুর আচার-নিয়ম, বিবাহবন্ধন, সমাজবন্ধন, স্বদেশপ্রীতি, রাজনীতি, অন্তর্জাতীয় সম্বন্ধ প্রভৃতি যাহা কিছু আছে—মোট কথায় তাহার বাহ্যজগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তির সহিত ব্যবহারসম্বন্ধ ঐ উদ্দেশ্যে নিয়মিত হইয়াছে ও আবহমানকাল ঐরূপ হইতে থাকিবে।

ঐরূপে ভারতের জাতীয়তার স্বরূপজ্ঞান লাভপূর্ব্বক স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা ও গ্রন্থাবলী মধ্যে ঐ সম্বন্ধে যে সকল কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, অথবা সূত্রভাষ্যের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন, সেই সকল অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থকার এই বিশদ টীকা প্রণয়পূর্ব্বক সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। ভারতের জাতীয়তারূপ জটিল সমস্যার সমাধান, উহাতে কতদূর সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার ভার আমরা পাঠকবর্গের উপরেই প্রদান করিতেছি। উহার বলিবার ও বুঝাইবার পথে যে অনেক ত্রুটি নানা অপরিহার্য্য কারণে রহিয়া গিয়াছে, লেখক তাহা স্বয়ং তাঁহাদিগকে সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছেন। উপসংহারে আমরা কেবল ইহাই বলিতে পারি যে—ভারতের প্রাচীন ও বর্ত্তমান জীবনকে অঙ্গাঙ্গিভাবসম্বন্ধে বিদ্যমান একই অখণ্ড পদার্থরূপে একযোগে দর্শনপূর্ব্বক এরূপ সম্পূর্ণরূপে স্বদেশীভাবের যুক্তিযুক্ত ও মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। প্রবাদ আছে—'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী';—লেখকও এই গ্রন্থোক্ত প্রশ্নের সমাধানে আজীবন উদ্যম এবং অশেষ ক্লেশ ও নির্যাতন স্বীকার করিয়া যে বর্ত্তমান মীমাংসার আলোকে উপস্থিত হইয়াছেন, একথা তাঁহার সেবা-ব্রতধারী, চিন্তাশীল জীবনের সহিত যাঁহারা

পরিচিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিদিত আছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিসমূহের প্রাচীন ও বর্ত্তমান জীবনেতিহাস তুলনায় আলোচনা করিবার বিশেষ যোগ্যতা যে তাঁহার ছিল, একথাও তাঁহারা অবিদিত নহেন। কিন্তু পূর্ব্ব শিক্ষা-দীক্ষাদিসহ নিজ সমগ্র জীবন যদি তিনি অঞ্জলিস্বরূপে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিতে না পারিতেন এবং ঐরূপে শ্রীবিবেকানন্দগতপ্রাণতা যদি তাঁহার উপরে সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার না করিত, তাহা হইলে তিনি যে এই অপূর্ব্ব আলোক জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া শান্ত ও উপরত হইতে সক্ষম হইতেন না, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। "ভারতের সাধনা"য় লেখক যে সকল বিষয়ের অপরিস্ফুট ইঙ্গিতমাত্র করিয়া গিয়াছেন, সন ১৩১৯ সালে (ইং ১৯১৪খৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের ইংরাজী মাসিক পত্রের অন্যতম "প্রবুদ্ধ ভারতে"র সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি সেই সকলের অনেকাংশে বিবৃতি করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাহা বাকি ছিল তাহারও বিশদ্ ব্যাখ্যা ঐরূপে প্রকাশিত হইত; কিন্তু বিধাতার নিগূঢ় ইচ্ছায় উহা আর সিদ্ধ হইল না! কারণ, কৈশোরে সংযত চরিত্রবান্ ও সত্যের সাধক বলিয়া, যৌবনপ্রারম্ভে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী ও অক্লান্ত দেশসেবক বলিয়া, এবং ঐ কালের পূর্ণতায়—পরমার্থপ্রেমিক, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলিয়া যাঁহার পরিচয় পাইয়া আমরা এতকাল মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সন ১৩২৫ সালের ৭ই বৈশাখ তারিখে তিনি হৃদ্‌রোগে সহসা মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুর পরমপদাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন! যাঁহার মধুময় চরিত্রের চরম পরিণতি দেখিতে ও স্বার্থশূন্য নেতৃত্বে চালিত হইয়া সত্য-লাভের আশয়ে অনেকে এতদিন উদ্‌গ্রীব ছিল, তাহাদিগকে পথের ইঙ্গিতমাত্র প্রদানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের ও নিজ নিজ আত্মার

উপরে দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া দাঁড়াইতে বলিয়া, দেবব্রত-প্রজ্ঞানন্দ নশ্বর সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন! তাঁহার দেহাবসানের প্রায় ছয় বৎসর পূর্ব্বে "ভারতের সাধনা"র রচনা আরব্ধ হইয়াছিল। অতএব বুঝিতে পারা যায়, আজীবন সাধনায় তিনি যে সকল সত্য প্রাণে-প্রাণে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, লোককল্যাণসাধনাশয়ে জীবনের শেষ ছয় বৎসর সেই সকলের প্রকাশেই ব্রতী হইয়াছিলেন। ঐরূপে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি যে সত্যের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন—হে পাঠক, আইস, আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণহৃদয়ে "ভারতের সাধনা"পাঠে তাহারই অনুধ্যানে কিছুকাল নিমগ্ন থাকিয়া, আমাদিগের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ব্যাপার উহার সহায়ে সংসাধিত হইলে উহা চরম উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে কি না, তচ্চিন্তায় নিযুক্ত হই। অলমিতি—

শ্রীসারদানন্দ।

লেখকের নিবেদন।

"উদ্বোধন" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া "ভারতের সাধনা" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। পুরাতন "উদ্বোধনে"র পাতা কাটিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া, হিমালয়বাসী লেখকের কাছে উপস্থিত। উদ্দেশ্য—ঐ পাণ্ডুলিপিতে অভিপ্রায়মত পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি করাইয়া লওয়া।

১৩১৮ সালের মাঘ মাস হইতে "উদ্বোধনে" "ভারতের সাধনা" বাহির হইতে আরম্ভ হয়। লেখক তখন "উদ্বোধন"কার্য্যালয়ে বাস করিতেছেন, এবং মাসে মাসে "উদ্বোধনে"র ৬৪পৃষ্ঠা যাহাতে প্রবন্ধাদির দ্বারা পূর্ণ হয়, সে জন্য তিনি দায়ী। এ অবস্থায় প্রধানতঃ এই পৃষ্ঠা-পূরণের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কোন কোন মাসে তাঁহাকে "ভারতের সাধনা" লিখিয়া দিতে হইত, এবং এই ভাবে প্রবন্ধপর্য্যায়ের প্রায় অর্দ্ধেক লিখিত হইয়াছিল। বাকি অর্দ্ধেক, নানাস্থান হইতে উদ্বোধনে প্রকাশিত হইবার জন্য অবসরমত লিখিত ও প্রেরিত হইত। তখনও, আরব্ধ কার্য্যকে নিতান্ত অসমাপ্ত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যে অনুচিত, এই ভাবই বাকি প্রবন্ধগুলির রচনায় আসল প্রেরণা। যাহা হউক, ৩৭ মাসের মধ্যে এইরূপে "ভারতের সাধনা"র ১৫টী প্রবন্ধ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হইতে প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে "ভারতের সাধনা"-শীর্ষক প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের পাঠকের জন্য লিখিত হইয়াছিল, পাঠ্য পুস্তকের অঙ্গরূপে লিখিত হয় নাই। তাহা যদি

হইত, তবে গোড়া থেকেই গাঁথুনি অন্য রকম হইত। তাহা হইলে ভাব ও উক্তির সমাবেশে পুনরুল্লেখ অল্পই দেখা যাইত, যুক্তির যোজনায় পারম্পর্য্য ও শৃঙ্খলার দিকে অধিক দৃষ্টি রাখিতে হইত, প্রসঙ্গগুলি বারম্বার পরস্পর-সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়িত না এবং প্রত্যেক বিচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণগুলিকে আরও পরিস্ফুট করিয়া দিবার চেষ্টা থাকিত। কেন না, এইরূপ সাবধানতার সহিত গ্রথিত না হইলে, সাহিত্য কোনও গ্রন্থকে আপনার আসরে স্থান দিবে কেন?

কিন্তু এখন আর উপায় নাই। "ভারতের সাধনা"কে যে এখন আবার রূপান্তরিত করিয়া প্রকৃত গ্রন্থের মর্য্যাদাভাগী করিয়া দিব, সে সম্ভাবনা নাই, উৎসাহও নাই,—কেন না, সে অধিকারই নাই। পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বেকার "ভারতের সাধনা"র লেখক যে আজও সেই "ভারতের সাধনা"র লেখকই আছেন, তাহা ত দেখিতেছি না; অতএব আজ যদি তাঁহার দ্বারা "ভারতের সাধনা"র পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধনাদি করাইতে হয়, তবে তাঁহার পক্ষে "ঢেলে সাজা" ছাড়া আর উপায় নাই। তাহা হইলে "ভারতের সাধনা"—নূতন স্বরূপ্ না হউক—নূতন রূপ ধারণ করিবে; তাহাকে কোন্ হিসাবে "উদ্বোধন" হইতে পুনর্মুদ্রিত বলা চলিবে? লেখকের জীবনেও একটা ত পরিণাম আছে। "ভারতের সাধনা" লিখিবার দশ বৎসর আগে যদি লেখককে "ভারতের সাধনা"র মত একটা কিছু লিখিতে হইত, তবে অভারতীয় সাধনার দ্বারা ভারতকে প্লাবিত করিবার উৎসাহ, অনেক পাশ্চাত্য-ভাবভাবিত দেশহিতৈষী বিদ্বৎব্যক্তি অপেক্ষা তাঁহার মধ্যে কিছু কম দেখা যাইত না। যতই দিন গিয়াছে ততই দেশের সহিত, দেশের নিগূঢ় আত্মশক্তির সহিত পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিয়াছে; দেশের শ্রেষ্ঠ সাধনায় ব্রতী হওয়ায় দেশের আর সমস্ত সাধনার গতি

ও প্রকৃতি দৃষ্টিগোচর হইয়া যাইতেছে। নিজে দেশকে যোল আনা ধরা না দিলে দেশ কি কাহাকেও ধরা দেয়? ভারতকে চিনিয়া ফেলা কি এতই সহজ?

আজ আবার নূতন করিয়া "ভারতের সাধনা" লিখিতে যাওয়া যে অনাবশ্যক, তাহা ১৩২১ সালের কার্ত্তিক মাসে "ভারতের সাধনা"র "শেষ কথা"য় লিখিত নিম্নোদ্ধৃত বাক্য হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়:—"বলিবার বুঝাইবার, কথা অনেক বাকি আছে। অনেক রকমে সে কথা বহুদিন ধরিয়া বলিয়া যাইতে হইবে। তবে সে কথার সারাংশ 'ভারতের সাধনা'য় ইঙ্গিত করা রহিল। এই সমস্ত ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া চিন্তাশীল পাঠক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ভারতের সাধনার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত হইবেন।" ভারতের সাধনার কথা যে অনেক রকমে বহুদিন ধরিয়া বলিয়া যাইতে হইবে, শ্রীভগবান্ এ প্রতিশ্রুতি লেখকের দ্বারা এখনও পূরণ করাইয়া লইতেছেন; তবে সে "উদ্বোধনে"র পৃষ্ঠায় নহে—অন্য মাসিক পত্রে। আর "ভারতের সাধনা"য় যে, সত্য ও তথ্যের ইঙ্গিতমাত্রই অধিকাংশ স্থলে দেওয়া হইয়াছে, এ ত্রুটি লেখকই এই উক্তিতে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। অতএব আজ হঠাৎ "ভারতের সাধনা"র লেখককে, লেখকের তদানীন্তন অভি-প্রায়কে অতিক্রম করিবার আবশ্যকতা কি?

"উদ্বোধনে" "ভারতের সাধনা" পড়িলে বুঝা যাইত যে, লেখক তাঁহার লেখায়, সম্ভাবিত বিচারতর্কের প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখিতেছেন না; তাঁহার দৃষ্টি, যাঁহারা ভারতের সাধনার সাধক হইবেন, তাঁহাদের উপরই নিবদ্ধ। সাহিত্যের জন্য, সমালোচনের জন্য, তিনি যে একটা কিছু সৃষ্টি করিতেছেন, একথা তাঁহার মনে স্থান পাইত না; প্রকৃত

দেশসেবার জন্য একটা ব্যগ্র আহ্বানের ভাব তাঁহার মন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিত। এ অবস্থায়, পাঠক যদি আজ প্রবন্ধগুলিতে লিপিকৌশল বা যুক্তিযোজনাকৌশল খুঁজিয়া দেখিতে চাহেন, তবে নিরাশ হইবেন, চাই-কি বিরক্তও হইতে পারেন। যুক্তি ও প্রমাণের সংগ্রহে বা প্রয়োগে যে "ভারতের সাধনা"র লেখক কাতর, তাহা নহে; কিন্তু দেশসেবার আহ্বানে সাধককে প্রকৃতভাবে মাতাইয়া তোলাই তাঁহার প্রধান ও প্রথম উদ্দেশ্য, যুক্তি ও প্রমাণ তাহার পরের কথা। কেন না, যে সেই আহ্বানে মজিয়াছে, সর্ব্বত্যাগী হইয়া কাজের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছে, যুক্তি ও প্রমাণ শুধু তাহার কাছেই বর্ম্মস্বরূপ, অপরের কাছে কেবল তর্কবুদ্ধি শানাইবার চর্ম্ম-স্বরূপ।

এই সমস্ত কারণে, দোষে-গুণে "ভারতের সাধনা" যেমনটী "উদ্বোধনে" প্রকাশিত হইয়াছিল, ঠিক তেমনি আকৃতি ও মূর্ত্তিতে আজ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের শীর্ষে "উদ্বোধন"-সংখ্যার তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া রহিল। কেবল উপসংহারের দুইটী প্রবন্ধ একীভূত হইল এবং "রাজনীতি ও পলিটিক্স" শীর্ষক একটী নূতন প্রবন্ধ* ঐ "শেষ কথার" পূর্ব্বে সংযোজিত হইল। পূর্ব্বে "উদ্বোধনে" যে, ধর্ম্ম, সমাজ ও শিক্ষার পরে 'পলিটিক্সে'র অবতারণা করা হয় নাই, তাহা তাড়াতাড়ির একটি কুফল; এই তাড়াতাড়ির কথা প্রথমেই স্বীকার করিয়াছি। ইতি ২৪শে পৌষ, ১৩২৪।

---

* সন ১৩২৫ সালের ৭ই বৈশাখ তারিখে লেখকের হৃদ্‌রোগে সহসা দেহত্যাগ হওয়ায় উক্ত নূতন প্রবন্ধ সংযোজনরূপ তাঁহার অভিপ্রায় অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ইতি—

প্রকাশক

সূচনা।

(দেশের কাজ।*)

আজকাল আমাদের দেশের যুবকগণ দেশের কাজ করিবার জন্য একটা প্রবল অকৃত্রিম উৎসাহ অনুভব করিয়াছে। এই উৎসাহ-তরঙ্গে দেশের পুঞ্জীকৃত তমোভাব ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে বলিয়া আশা হয়। অতএব এই উৎসাহ যাহাতে ম্লান না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, সেরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

---

* প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে, ১৩১৯ সালের শেষ ভাগে, লেখক যখন "উদ্বোধন"-পত্রে "ভারতের সাধনা"শীর্ষক প্রবন্ধপর্য্যায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন কতিপয় বন্ধুর সহিত ঐ বিষয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে সংক্ষেপে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধাকারে তাহা লিপিবদ্ধ করেন। বলা বাহুল্য সাধারণে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে তখন ইহা লিখিত হয় নাই; বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাঁহাদিগকে "ভারতের সাধনা"য় আলোচিত মতবিশেষের সংক্ষেপ পূর্ব্বাভাষ দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এই দীর্ঘকাল পরে জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে লেখকের স্বহস্তলিখিত এই প্রবন্ধটী পাইয়া ইহা পাঠে মূলগ্রন্থে বিবৃত মতবিশেষের অনুধাবনে অনেক সহায়তা হইবে মনে করিয়া "ভারতের সাধনা"র প্রারম্ভেই ইহা সংযোজিত করিয়া দিলাম। প্রবন্ধারম্ভে লেখক যে দেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা ও রাজনীতিপন্থিগণের যুক্তি ও মতবাদের সংক্ষেপে অবতারণা করিয়া উহাদের সমালোচনা ও দেশীয়ভাবে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধনকল্পে উহাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন, সুধী পাঠক তাহা এক্ষেত্রে শুধু প্রাসঙ্গিকভাবে ধরিয়া লেখকের মূল চিন্তাধারাটীর অনুধাবন করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে। ইতি—

প্রকাশক।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, দেশের কাজ কি তাহা সুনিশ্চিতরূপে স্থির করা হইয়াছে কি না। এই প্রশ্নের বিচারে প্রথমতঃ দেখা যাউক যে, সম্প্রতি দেশের কাজ বলিতে দেশের অধিকাংশ লোক কি বুঝিতেছেন।

দেশের কাজ বলিতে আজকাল অনেকে অনেক রকম বুঝেন। তবে মোটামুটি ইঁহাদিগকে তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যায়; যথা—

(১) দেশের কাজ বলিতে এক সম্প্রদায় যাঁহারা কংগ্রেস করেন, তাঁহারা এই বুঝেন যে—ইংরাজ-নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাজনীতিক সাধনায় দেশের লোককে একযোগ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতির সংস্কারে সচেষ্ট থাকাই দেশের কাজ।

(২) দেশের কাজ বলিতে আর এক সম্প্রদায় এই বুঝেন যে, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে কালের উপযোগী করিয়া দেশে প্রতিষ্ঠিত করিবার সমবেত চেষ্টাই দেশের কাজ।

(৩) তৃতীয় সম্প্রদায় পাশ্চাত্য নেশনের ইতিহাস ও স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্বাধীন রাজশক্তি বা ষ্টেটের অস্তিত্বই একটা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির মূল উৎস, অতএব তাঁহারা দেশের কাজ বলিতে বুঝেন স্বাধীন শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া।

আমাদের দেশের যে সমস্ত যুবক অকৃত্রিম অনুরাগ ও পূর্ণ স্বার্থত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা সম্প্রতি কংগ্রেসের কার্য্যপ্রণালীর উপর

কোন আস্থাই রাখে না। অতএব, প্রথম সম্প্রদায়ের কথা এখানে আলোচনা করার দরকার নাই।

দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয়া ছিলেন সিষ্টার নিবেদিতা। এ সম্প্রদায়ের অনেক ধীসম্পন্নলোক সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত রহিয়াছেন। ইঁহারা প্রাচীন শিল্পকলা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রভৃতির পুনরুদ্ধারে বিশেষ ভাবে যত্নবান। ইঁহারা বলেন যে, আমাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গ যদি আমরা পুনরায় অনুশীলন করিয়া যাই, তবে ভারতে আবার নেশন গড়িয়া উঠিবে। প্রার্থিরূপেই হউক বা বিরোধিরূপেই হউক, ইংরাজ-রাজার সঙ্গে সংশ্রব রাখা ইঁহারা আবশ্যক মনে করেন না। ইঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রাচীন সভ্যতার পুনরুদ্ধার কল্পে দেশশুদ্ধ লোক একযোগ হইয়া উঠুক, একটা নেশনের সূচনা হউক, তারপর রাজশক্তিরূপ নেশন-অঙ্গের প্রসঙ্গ উঠিবে।

এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতামত পরে বিচার করিব। অগ্রে তৃতীয় সম্প্রদায়ের কথা আলোচনা করা যাউক। তৃতীয় সম্প্রদায় বলেন যে ইংরাজের দাসত্বমোচন করাই প্রকৃত দেশের কাজ। ইঁহাদের মতামত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদভাবে বুঝিয়া দেখা যাউক।

প্রঃ—ইংরাজের দাসত্বমোচন মানে কি?

উঃ—দেশের শাসনভার বিদেশীর হাত থেকে কাড়িয়া লইয়া স্বদেশীয়দের হস্তে অর্পণ করা।

প্রঃ—অর্থাৎ প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন, কেমন?

উঃ—হাঁ।

প্রঃ—স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই কি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইল ?

উঃ—না ; কল্যাণ সাধনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হইল। কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্যই দাসত্ব-মোচন করা আবশ্যক। রাজনৈতিক দাসত্ব থাকিতে স্থায়ী-কল্যাণের সম্ভাবনা নাই।

প্রঃ—কেন নাই ?

উঃ—ইংরাজ ভারতে নিজের স্বার্থপোষণের জন্য রাজত্ব করে ; সেই স্বার্থের অনুরোধে দেশে শান্তিরক্ষা করে। কিন্তু আমাদের ঐহিক উন্নতি, তাহার স্বার্থে আঘাত করিবেই, কারণ আমাদের ঐহিক কল্যাণ ও তাহাদের ঐহিক কল্যাণ পরস্পর বিরোধী। বৈদেশিক শাসন-কর্ত্তৃত্ব আমাদের ঐহিক কল্যাণের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় ঐ শাসন কর্ত্তৃত্বের উচ্ছেদ না করিলে আমরা প্রকৃত ভাবে অগ্রসর হইতে কোন মতেই সক্ষম হইব না।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার কথায় দাঁড়াইতেছে এই যে, ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে গেলেই প্রথমতঃ স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতা লাভ করাই আবশ্যক হয়।

উঃ—হাঁ, তাহাই বটে ; জগতে যেখানেই অধুনা কোনও নেশন গড়িয়া উঠিতেছে, সেখানেই দেখিতেছি তাহাদের ঐহিক কল্যাণের মূলে স্বাধীন রাজশক্তি বিদ্যমান। স্বাধীনতা না থাকিলে ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

প্রঃ—যদি আমাদের দেশ, কেবল যতদূর পর্য্যন্ত যাইলে ইংরাজের সহিত বিরোধ না হয়, ততদূর পর্য্যন্তই ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় ?

উঃ—যদি তাই হয়, তবে অচিরে আমাদিগকে মরিতে হইবে ; কারণ, ইংরাজের গোলাম থাকিয়াই যদি আমরা সন্তুষ্ট থাকি, তবে একটা প্রাচীন দেশ বলিয়া আমাদের কোনও বিশেষত্ব থাকিবে না ; উদরান্নের জন্য ক্রমশঃই একটা হীন দাসজাতিতে আমরা পরিণত হব। আধুনিক জগতে কেবলমাত্র ইংরাজের দাস বলিয়াই যদি আমাদের পরিচয় হয়, যদি আধুনিক জগতে আর কোনও কার্য্য আমাদের না থাকে, তবে বলিতে হইবে আমরা মরিয়াছি, আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপ আর নাই।

প্রঃ—তাহা হইলেই দেখিতেছি মরণ-বাঁচনের কথা আসিয়া পড়িল। আপনার যুক্তি এই যে, বাঁচিতে হইলেই আমাদিগকে ঐহিক কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং ঐ পথে অগ্রসর হইতে গেলেই পথরোধকারী ইংরাজ-শাসন বিনষ্ট করিতে হইবে। আচ্ছা, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, "আমরা বাঁচিব"—এই কথাটার অর্থ কি ?

উঃ—আর পাঁচটা নেশন জগতে যেমন বাঁচিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আমরাও সেইরূপ দাঁড়াইব। অবশ্য "আমরা বাঁচিব" অর্থে আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপ বজায় রাখিয়া দাঁড়াইবই বুঝায়। নতুবা যে "আমরা" পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ভাল-মন্দ নানা ভাবে ইতিহাসে আত্মপরিচয় দিয়াছি, সেই "আমরা" যদি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইয়া একটা স্বাধীন নেশন গড়ি, তবে বলিতে হইবে যে একটা নূতন নেশন ভারতে গড়িয়া উঠিল।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার মতে দেখিতেছি তিন রকম পরিণতি ভারতবাসীদের ঘটিতে পারে :—১ম, সম্পূর্ণ ইংরাজ-কৃপাজীবী দাসজাতিরূপ পরিণাম ; ২য়, সম্পূর্ণ নূতন ভাবে

গঠিত স্বাধীন জাতিরূপ পরিণাম ও ৩য়, আমাদের ঐতিহাসিক সনাতন স্বরূপ বজায় রাখিয়া জগতে স্বাধীন হইয়া বাঁচিয়া থাকা। এই তিনটি পরিণামের মধ্যে আপনার কিরূপ পরিণাম অভিপ্রেত ?

উঃ—যে রূপেই হউক, আমি চাই ভারতবর্ষ বাঁচিয়া থাকে ;—প্রথম পরিণামটিকেই আমি মৃত্যু বলিয়া গণ্য করি। যদি ঐরূপ ভাগ্যকে আমরা বরণ করিতে না চাই, তবে আমাদের সনাতন স্বরূপ বজায় রাখিয়া স্বাধীন হইতে গেলেও ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে, এবং সেই স্বরূপ বদ্‌লাইয়া স্বাধীন হইতে গেলেও, ইংরাজ শাসন ঘুচাইতে হইবে।

প্রঃ—বেশ কথা। যদি ধরুন আপনি পূর্ব্ব-স্বরূপ বজায় না রাখাই শ্রেয়ঃ মনে করেন, তবে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় "আমরা" শব্দটি কি অর্থে ব্যবহার করিবেন ?

উঃ—তখন "আমরা" বলিতে বুঝিব, যাহারা স্বাধীনতার চেষ্টায় একযোগ হইতেছেন। তাহারাই শেষে নূতন জাতি বা নেশনের প্রতিষ্ঠা করিবেন।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনার মতে আমাদের দেশের লোককে ঐহিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে ইংরাজ-শাসন ধ্বংস করিতে একযোগ করা সম্ভবপর এবং একযোগ করিবার সময় দেশের কর্ম্মীদের পূর্ব্ব-স্বরূপ আলোচনা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই।

উঃ—পূর্ব্ব-স্বরূপ বিচার করিবার এইটুকু প্রয়োজন যে, তাহাদের প্রকৃতিতে যুগযুগের সংস্কার বশতঃ এমন একটা নির্দ্দিষ্ট খাত গড়িয়া গিয়াছে যে, উৎসাহ বা উদ্দীপনাকে স্থায়ীভাবে সেই প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিতে হইলে, সেই নির্দ্দিষ্ট খাতটি

অবলম্বন করিতে হইবে; তাহা না করিলে দেশের লোকের কাছে কাজ আদায় করা যাইবে না। সেইজন্য ইংরাজ-শাসন বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব পরমার্থভাব অনুস্যূত করিয়া দিতে হইবে।

প্রঃ—তাহা হইলে আপনি আমাদের পূর্ব্ব-স্বরূপের খেয়াল রাখা আবশ্যক মনে করেন?

উঃ—হাঁ, মনে করি। কিন্তু যতটুকু উপস্থিত কার্য্যের জন্য দরকার, কেবল সেইটুকু খেয়াল রাখাই আমার অভিপ্রায়। স্বাধীনতার সেবকদের মধ্যে যে ক্ষেত্রে যেরূপ ভাব বা খাতের ভিতর দিয়া উদ্দীপনা জাগাইয়া রাখা সম্ভব, সেই ভাব বা খাত দিয়াই সেখানে শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে।

প্রঃ—তাহা হইলে সংক্ষেপে আপনার মত এই যে, আমাদিগকে বাঁচিতেই হইবে,—বাঁচিতে হইলেই আমাদিগকে ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইবে,—ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইলেই উহার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য ইংরাজশাসন ঘুচাইতে হইবে; অতএব ইংরাজ-শাসন ঘুচাইবার চেষ্টাই প্রকৃত দেশের কাজ। ঐ কাজের অনুরোধেই যেখানে যতটুকু পূর্ব্ব সংস্কারের সহায়তা লওয়া আবশ্যক, সেখানে ততটুকু লইলেই চলিবে।

* * * *

দাসত্ব-মোচনপ্রয়াসী প্রাগুক্ত তৃতীয় সম্প্রদায়ের মতামত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বিশদভাবে প্রকাশ করা হইল। ইঁহাদের যুক্তির তিনটী সোপান রহিয়াছে, আমরা দেখিয়াছি;—প্রথম সোপান, আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, "আমরা বাঁচিব" বলিলেই ত চলিবে না,—কেমন

করিয়া, বা কি হইয়া বাঁচিব তাহা বল। তখন উত্তর পাই,—'আর পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।' এই উত্তরের মধ্যেই গোল রহিয়া গিয়াছে। আমগাছ বাঁচে, আমগাছ থাকিয়াই; তালগাছ তালগাছ থাকিয়াই বাঁচে। জগতের আর পাঁচটা নেশন প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বরূপ লইয়া বাঁচে; আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে —আমাদের স্বরূপটা কি, অর্থাৎ—আমরা কি ছিলাম, কি আছি এবং কি হইব। জগতে প্রত্যেক নেশনই মানবসমষ্টির উপস্থিত বা স্থায়ী কল্যাণের জন্য কিছু-না-কিছু দিবার জন্যই বাঁচে। জগতে কি দিবার উদ্দেশ্যে আমরা বাঁচিব, আমাদের বাঁচার লক্ষ্য কি—তাহা অগ্রেই স্থির করিয়া তবে বাঁচিবার চেষ্টা করিলে ঠিক্-ঠিক্ বাঁচা বা বাঁচিবার পথে যাওয়া সম্ভবপর। নচেৎ বাঁচিব বলিয়া সাম্‌নে দৌড় দিলেই বাঁচিবার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যেমন আম দিবার জন্য আমগাছ বাঁচে—আমগাছ হইয়া; তাল দিবার জন্য তালগাছ বাঁচে—তালগাছ হইয়া; তেমনি যাহা দিবার জন্য আমরা বাঁচিব তাহাই নির্ণয় করিয়া দিবে—আমাদের বাঁচিবার রকম বা ধাঁজটী কি,—আমাদের নেশনরূপে একযোগ হওয়ার বিশেষত্ব কি।

আমরাও সহস্রবার স্বীকার করি যে, আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে; কিন্তু "আমরা বাঁচিব" বলিতে কাহারা বাঁচিবে বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া দেখা আবশ্যক মনে করি। প্রশ্ন এই যে, আর পাঁচটা নেশন যেমন করিয়া বাঁচে, আমরাও কি তেমন করিয়া বাঁচিব? উত্তর এই যে, নেশনরূপে বাঁচার মধ্যে সকলেরই এক জায়গায় মিলও আছে, আবার এক জায়গায় গরমিলও আছে;

যেমন বৃক্ষজীবনে বৃক্ষত্ব-হিসাবে সকলেরই মিল আছে, আবার—ফলধারণ হিসাবে,—ফলপ্রসবরূপ লক্ষ্যসাধনে,—সকলের মধ্যে গরমিলও আছে। নেশনের নেশনত্ব—নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য সাধনে; এই নেশনত্বের হিসাবে সব নেশনকেই একরূপ হইতে হইবে,—প্রত্যেকের বাঁচায় এই জায়গায় মিল; কিন্তু গরমিল এইখানে যে, কে কিরূপ লক্ষ্যসাধন করে,—এই লক্ষ্যসাধনের হিসাবে বাঁচায় প্রভেদ রহিয়াছে। সেইজন্য "আর পাঁচটা নেশন যেমন বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইয়াছে, আমরাও সেইরূপ বাঁচিয়া জগতে দাঁড়াইব"—এই সংকল্প-বাক্যের প্রকৃত অর্থ এই যে, 'আর পাঁচটা নেশন যেমন নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য-সাধনে দণ্ডায়মান আমরাও সেইরূপ নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্য-সাধনে দণ্ডায়মান হইব।' রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন-প্রয়াসীদের যুক্তির প্রথম সোপানটি আমরা এই ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া বলিতে চাই।

উহাদের যুক্তির দ্বিতীয় সোপান কি?—না, "বাচিতে গেলেই ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইবে।" বেশ কথা; নেশনের পক্ষে বাঁচা কাহাকে বলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এখন যুক্তির এই দ্বিতীয় স্তরটীকে আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ছাঁচে ফেলিলে, কথাটা দাঁড়ায় এই,— 'বাঁচিতে গেলেই, অর্থাৎ নেশনরূপে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া একলক্ষ্যসাধনে দাঁড়াইতে গেলেই, ঐহিক কল্যাণ খুঁজিতে হইবে।'

কথাটী কি ঠিক? উত্তর,—না। কারণ, নেশন হইয়া বাঁচা মানেই দেখিতেছি দুইটী ব্যাপার;—প্রথমটী, নিজশক্তিতে একযোগ হওয়া; দ্বিতীয়টী, একলক্ষ্য স্থির থাকা। অতএব লক্ষ্য

যতদিন না স্থির হয়, ততদিন অগ্রসর হওয়াই ভ্রান্তি। সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্যটী স্থির করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে উহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় একযোগ হইতে হইবে; তারপর একযোগে লক্ষ্যসাধন করিতে গেলেই কি কি বস্তুর প্রয়োজন, বা অভাব ঘটে,—ঐহিক কল্যাণ, না আর কিছুর—তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত লক্ষ্যই স্থির নাই, এবং নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যকে ধরিয়া একযোগ হইবার চেষ্টাও আমাদের মধ্যে নাই, সে পর্য্যন্ত প্রকৃতপক্ষে বাঁচিবার উদ্যোগই আমাদের মধ্যে আসে নাই। বাঁচিবার উদ্যোগ আসিলে, তবে ত দেখিব বাঁচিবার জন্য ঐহিক কল্যাণ, বা আর কিছু আমাদের দরকার কিনা!

নেশনরূপে বাঁচা মানেই একলক্ষ্যসাধনে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া থাকা। আমরা বাঁচিতেছি, কি না বাঁচিতেছি, কিম্বা আমরা কেমন করিয়া বাঁচিতেছি, ইহা সর্ব্বাগ্রে না বুঝিলে বাঁচিবার যথার্থ উদ্যোগই আসিতে পারে না। বাঁচিবার উদ্যোগ আসিলে তারপর দেখা দরকার যে, আমাদের বাঁচিতে গেলে প্রথমেই কি প্রয়োজন,—ঐহিক কল্যাণ, বা আর কিছু।

অতএব প্রথমেই জিজ্ঞাস্য যে, কি লক্ষ্যসাধনে আমরা নিজশক্তিতে একযোগ থাকি, বা থাকিতে পারি। এই খানেই আমাদের সনাতন স্বরূপটীর কথা আসিয়া পড়ে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনায় আমরা প্রাচীনতমযুগে নিজ শক্তিতে একযোগ হইয়াছিলাম। তারপর কালের প্রবাহে সেই পরমার্থ-লক্ষ্য আমরা বুকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছি বটে, কিন্তু একযোগের ভাবটী বারম্বার ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া গিয়াছে এবং

নিজশক্তিতে একযোগ হওয়াও আর ঘটিয়া উঠে নাই। আমাদের লক্ষ্যটাই ঠিক যাহাদের লক্ষ্য নহে, এরূপ অনেকেই,—যথা, বৌদ্ধ, মুসলমান, বা ইংরাজ,—আমাদিগকে একযোগ করিতে গিয়াছে বটে, কিন্তু সে আমাদের বিশেষ লক্ষ্যটার সাধনায় নহে। আর যাহাদের লক্ষ্য, তাহাদের নিজশক্তিই একযোগ করিতে প্রযুক্ত হওয়া চাই। তাহাও প্রাচীন যুগের পর আর ঘটিয়া উঠে নাই।

তাহা হইলে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্যের সাধনোদ্দেশ্যে আমাদিগকে নিজশক্তিতে একযোগ হইয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইতে হইবে। একযোগ হইয়া দাঁড়াইবার পর, সেই লক্ষ্য-সাধনায় যে বিঘ্ন আসে তাহা সরাইতে হইবে, যে অভাব ঘটে তাহা মোচন করিতে হইবে।

"পেটে খেতে না পেলে আমরা বাঁচিব কি করে"—এই কথাটাতে বেশ একটা চটক্ আছে; তাই রাজনৈতিক স্বাধীনতা-প্রয়াসীদের মুখে কথাটা শুনিয়াই প্রথমে মনে হয়—ঠিকই ত বটে। কিন্তু বাপু হে, পেটে খেতে পাওয়া' ও 'জীবন ধারণ করা' একার্থবাচক নহে; ব্যাধিতে প্রাণ লইয়া এমন টানাটানি পড়িতে পারে যে, তখন জল-সাগু ছাড়া খাদ্যই দেওয়া যায় না। যে সুস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে সেই 'পেটে খাবার' অধিকারী। যে মৃত্যুশয্যা থেকে বেঁচে উঠিল, তার জন্যই অন্ন-পথ্যের ব্যবস্থা করা যায়। তোমরা যে যুগ যুগ ধরিয়া মৃত্যুশয্যায় পচিতেছ—তাহা বিধাতা চোখে অঙ্গুলি দিয়া আর কত বুঝাইবেন? সেইজন্য আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না,—আগে নেশন-শরীরের শীর্ণতার দিকে না চাহিয়া, উহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা কর, আগে প্রকৃতপক্ষে বাঁচিয়া উঠ,—আগে চিরন্তন লক্ষ্যটা গ্রহণ

করিয়া নিজশক্তিতে একযোগ হও, তারপর বাঁচিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেই, 'পেটে খাবার' যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইবে। এখন শতকরা ২৫টা লোক অন্নকষ্টে মরিতেছে বলিয়াই কি দিশাহারা হইয়া রুগ্ন নেশনটার পেটে অন্ন ঠাসিবার জন্যই কেবল ব্যস্ত হইবে? রোগটা যে প্রাণ লইয়া, পেট লইয়া ত নহে। নেশনের প্রাণ হইতেছে—নিজ লক্ষ্যসাধনায় নিজশক্তিতে একযোগ হওয়া; এই প্রাণটা পরিপুষ্ট কর, এই প্রাণটা রাখিবার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে কর, তারপর স্বাভাবিক প্যাথের ব্যবস্থা যথাসময়ে হইবে। যদি প্রাণটা বাঁচাইবার সন্ধান পাইয়া থাক, তবে এখন শতকরা দেশে ৪০জন মরিলেই বা ক্ষতি কি; আর যদি প্রাণটা বিদায় লইতে থাকে, তবে মুখে মুখে পায়সান্ন গুজিবার যোগাড় করিতে পারিলেও কোনও ফল নাই।

"আমরা বাঁচিব" অর্থে বুঝায় যে, আমরা সুস্থ বা স্বস্থ হইয়া জগতে নেশনরূপে জীবন ধারণ করিব। সুস্থ বা স্বস্থ হইতে হইলে আগে স্বলক্ষ্য স্থির হওয়া চাই; অতীত বুঝিয়া স্বলক্ষ্য স্থির হইলে, সকলে নিজ চেষ্টায়, পরের অপেক্ষা না রাখিয়া, এক-যোগ হওয়া চাই। পরমার্থরূপ লক্ষ্যসাধনোদ্দেশ্যে একযোগ হইবার পর বিবেচ্য—আমাদের লক্ষ্যসাধনার পথে বিঘ্ন কি। বিঘ্নের কথা তখন আসিবে।

যদি বল বিঘ্নের কথা ত আগেই আসিয়া পড়িতেছে; —ইংরাজ আমাদিগকে একজোট হইতে দিবে কেন? উত্তরে আমরা বলি—ইংরাজ নিজের বিরুদ্ধে একজোট হইতে দিবে কেন? ইংরাজ দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রটা সর্ব্বপ্রকারে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস, সমাজতত্ব ও

অভিজ্ঞতার ফলে এই বুঝিয়া নিশ্চিন্ত আছে যে, রাজনীতিই সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের মূল,—অতএব রাজনীতি-ক্ষেত্রে আপনি ছাড়া আর কোন সমকক্ষ শক্তির অভ্যুত্থান না হইলে, তাহাদের প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক থাকিবে; সেইজন্য তাহারা আমাদের আধ্যাত্মিক বা সামাজিক সাধনা বা অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করে না;—তাহারা মনে করে যে, ভারতবাসীরা ধর্ম্ম লইয়া যত ইচ্ছা নাড়াচাড়া করুক, রাজনীতিরূপ পক্ক ফলটীর উপর লোলুপ দৃষ্টি না করিলেই হইল। আবার এই পর্য্যন্ত আমরা রাজনীতিক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্থান পাইতে যে আন্দোলন-অভিযোগাদি করিয়াছি, যদি সত্য-সত্যই সে সমস্ত একেবারে পরিহার করিয়া ঘোষণা করি যে, পাশ্চাত্য রাজনীতিক সাধনা আমাদের জাতীয়তার অঙ্গীভূত নহে—আমাদের জাতীয় সাধনা সম্পূর্ণ পারমার্থিক, তবে ঐরূপ মতামত লইয়া একজোট হইতে ইংরাজের বাধা দেওয়া দূরে থা'ক, আবশ্যক মত সাহচর্য্য পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতে পারে;—কারণ, তাহারা এইরূপ সম্প্রদায়ের উদ্ভবে বুঝিবে যে, রাজনৈতিক বিরোধী সম্প্রদায়ের হাত হইতে উহাদের সাহায্যে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবে।

সম্প্রতি ইংরাজ সকল রকম সমবেত সাধনাকেই সন্দেহের চক্ষে দেখে,—নিজেদের প্রতি সকল রকম সভাসমিতির ব্যবহার লক্ষ্য করে! কিন্তু ইহাতেও আমাদের ক্ষতি নাই; কারণ—যতদিন কেবল ধর্ম্ম লইয়া একজোট হওয়াই আমাদের আসল কাজ, ততদিন ইংরাজের সহিত ব্যবহারে বিরুদ্ধভাব পোষণ বা প্রদর্শন করার ত কোনও আবশ্যকতা বা সাফল্য নাই। আমাদের একযোগ হইবার চেষ্টায় ত কোনও বিদ্বেষভাব নাই,—শুধু ধর্ম্মভাব ও সনাতন

ধর্ম্মের প্রতি প্রাণপণ অনুরাগই বিদ্যমান। বিদ্বেষভাবের খাদ থাকিতে ভারতীয় নেশনের গড়ন সুসম্পন্ন হইবে না।

এইখানে এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, পরমার্থরূপ লক্ষ্য ধরিয়া একযোগ হইবার পথে ইংরাজ যদি সত্যই দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ দণ্ডায়মান হয়, তবুও রাজনীতিরূপ পরের 'কোর্টে' দাঁড়াইয়া ইংরাজের সহিত শেষ সংগ্রাম করা অপেক্ষা নিজের 'কোর্টে' দাঁড়াইয়া যুঝিতে-যুঝিতে মরা ভাল। নিষাদ-তাড়িত হরিণ যখন মনঃপুত কোণটী অধিকার করিয়া মরণযুদ্ধ যুঝিতে দাঁড়ায়, তখন তাহার শরীরে দশটা হরিণের শক্তি বিদ্যুৎবেগে খেলা করে; তেমনি হে ভারতের, সনাতন ধর্ম্মের আশাস্থল যুবকবৃন্দ! তোমরা নিশ্চয় জানিও, হাজার-হাজার বৎসরের প্রাচীন সনাতনধর্ম্মের আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া সনাতন-ধর্ম্মের জন্য তোমরা যদি মরিতে প্রস্তুত হও, তবে তোমাদের বাহুতে অলৌকিক শক্তির আবেশ হইবে, এবং আরও যাহা হইবার সম্ভাবনা তাহা এখন বলিলাম না;—কেবল এইটুকু স্মরণ রাখিও, যে যদি মরিতে হয়, তবে এমন মরণ তোমার পক্ষে আর নাই,—যদি মরিতে হয়, তবে যাহার আশ্রয়ে, যে সনাতন ধর্ম্মের কোলে আমরা একদিন জীবন লাভ করিয়াছি, যেন তাহারই কোলে মৃত্যুশয়নে শায়িত হই; যে সনাতন ধর্ম্মের জন্য কৃষ্ণার্জ্জুন, রাঘব পরশুরাম প্রভৃতি জীবনপাত করিয়াছেন, যেন তাহার জন্যই আমরা মরিতে পাই। সেজন্যই বলি যে—যদি মরিতে হয়, তবে সনাতন ধর্ম্মের নিজের 'কোর্টে' দাঁড়াইয়া মরিব,—পাশ্চাত্য রাজনীতির কোর্টে মরিতে যাইব কেন?

অতএব ইংরাজ যদি ধর্ম্ম লইয়া আমাদিগকে একজোট না হইতে দেয়, তবে তাহারও সদুপায় আছে। অন্য ভাবে একজোট

হইতে যাওয়া ত আমাদের পক্ষে বাঁচা নহে;—পরমার্থ লইয়া একযোগ হওয়াই আমাদের স্বরূপ। যদি জীবনে আমরা ঐ স্বরূপ লাভ না করি, অন্ততঃ মরণে করিব—বাঁধার সহিত সংগ্রামে মরিতে-মরিতেও করিব।

আর একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, পরমার্থ লইয়া দেশ-শুদ্ধ লোককে কিরূপে এক করা যায়; কারণ দেশে নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক রহিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে যিনি প্রথম ভারতীয় নেশন-গঠনের উপায় দেখাইয়া দেন, যিনি পরমার্থ লইয়া একযোগ হইবার জন্য প্রথম স্বদেশ-বাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনিই—স্বামী বিবেকানন্দই—এই সমস্ত আপত্তি খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার দ্বারা প্রযুক্ত যুক্তির উল্লেখ করিব না,—লেখা বিষমরূপে বাড়িয়া যাইবে। স্বামীজীর জীবনে দেখিতে পাই, তিনি জগতের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন—এক ভারতীয় পরমার্থতত্ত্বে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের সমাচার, এবং ভারতের জন্য ঘোষণা করিয়াছেন—সেই পরমার্থরূপ লক্ষ্যসাধনায় নেশন-নির্ম্মাণ। তাঁহার জীবনের এই দুইটী সমাচার যিনি সম্যক্ রূপে বুঝিবেন, তাঁহার পক্ষে এ আশঙ্কা হওয়া অসম্ভব যে, পরমার্থ-লক্ষ্য ধরিয়া একজোট হইতে গেলেই, মুসলমান প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। বরঞ্চ, পরমার্থ-তত্ত্বটী যতই আমরা দেশের সম্মুখে প্রকটিত করিতে থাকিব, ততই দেশের ধর্ম্মকলহ উপশমিত হইতে থাকিবে এবং যে ব্যক্তি সেই তত্ত্বটী স্বীকার করিবে,—তাহার সাধনপথ ইস্‌লাম-নির্দ্দিষ্টই হউক বা চার্চ্চ-নির্দ্দিষ্ট হউক,—সে ব্যক্তি আমাদের নেশন-গঠন কাজে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে।

এতদ্ব্যতীত আর একটী কথা এই যে, ইতিহাসে দেখিতেছি—সনাতন ধর্ম্ম হইতেই ভারতে প্রাচীনকালে, সমাজ বল, শিক্ষা বল, বাণিজ্য বল, শৌর্য্য-বীর্য্য বল, যাহা কিছু মনুষ্যোচিত তাহাই উদ্ভূত হইয়াছিল। সেই সনাতন ধর্ম্ম এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে; আর আমরাও বুঝিয়াছি যে, পরমার্থ বা সেই সনাতন ধর্ম্মের সাধনা লইয়াই আমাদিগের মধ্যে দৃঢ় সমবায় গড়িয়া উঠা সম্ভব। এ অবস্থায় আমাদের উচিত কি? আমরা কি একটা কল্পিত বা বৈদেশিক নেশন-আদর্শের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমাদের প্রাচীন-ভিত্তি পরমার্থসাধনকে বর্জ্জন করিব? আমরা কি সংখ্যার আধিক্য বজায় করিতে গিয়া, উদ্দীপনার একমাত্র উৎস সনাতন নেশন-ভিত্তি পরমার্থসাধনকে পরিহার করিব?—কখনই না। আমাদের উচিৎ—যথাসম্ভব সংখ্যাবাহুল্য লইয়াই একযোগ হইবার জন্য ভারতের পক্ষে নিত্যসত্য পরমার্থভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হওয়া। তারপর এই দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যদি প্রকৃত ভাবে একটা দৃঢ়িষ্ট সমবায় গড়িয়া উঠে, এবং স্বামী বিবেকানন্দের মত উদ্দীপনা ও জ্ঞান সম্পদ্ যদি থাকে, তবে সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য আশঙ্কা নাই। এমন সহর এবং বড় গ্রাম নাই, যেখানে ঐ সমবায়ের প্রভাব অল্প সময়ের মধ্যেই সঞ্চারিত না হইতে পারে। তখন মুসলমানকে উহার মধ্যে অঙ্গীভূত না করিতে পারিলেও ক্ষতি নাই। আমাদের দেশের প্রধান অভাব সমষ্টি-বদ্ধতার; যে সঙ্ঘ যথার্থ সমষ্টিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার জনসংখ্যা অল্প হইলেও, অপরাপর সঙ্ঘের তুলনায় তাহার প্রতিপত্তি অনেক বেশী। অতএব পরে মুসলমান জাতি আসিবে, কি না আসিবে—তাহা এখন ভাবিবার দরকার নাই; যদি আসে তবে তাহাদের

পক্ষেই ভাল, সর্ব্বপ্রকারেই ভাল; আর যদি না আসে তবে তাহাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া সনাতন-ধর্ম্মাশ্রিত ভারতবাসী নিশ্চয়ই তাহাদিগকে আত্মসাৎ (absorb) করিয়া লইবে।

সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে দেশের কাজ বলিতে রাজনীতি বুঝায় না; দেশের কাজ বলিতে আপাততঃ বুঝায়—দেশের সনাতন লক্ষ্য ধরিয়া দেশটাকে একজোট করা,—অর্থাৎ, প্রকৃত ভিত্তিতে দেশটাকে organise করা। পরমার্থ-সাধনরূপ লক্ষ্য ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াই রহিয়াছে; এই লক্ষ্যের প্রচার চাই। দেশের লোককে লক্ষ্য স্বীকার করানর সঙ্গে-সঙ্গেই লক্ষ্য সাধনার জন্য তাহাদিগকে বদ্ধপরিকর করিতে হইবে এবং ঐ সাধনাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে একজোট করিতে হইবে। অগ্রসর হইবার পথ এইরূপে নির্ণীত রহিয়াছে।

কিন্তু এখানে একটা প্রশ্ন এই যে, পথ নির্ণয় হইলেও, উহা দেশের যুবকবৃন্দের পক্ষে রুচিকর হইবে কি না; কারণ, পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা তাহাদের চিত্ত অনেকস্থলেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহারা অনেকেই ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না,—অথচ দেশের কাজ করিবার জন্য তাহাদের উৎসাহ অকৃত্রিম। এই সকল উৎসাহীযুবকের জন্য উপায় কি? উপায়—যথাসম্ভব মনোমত কাজের মধ্য দিয়াই তাহাদিগকে পরমার্থসাধনে ব্রতী করা। প্রকৃত পরমার্থসাধনে সঙ্কীর্ণ গণ্ডী নাই, যার যেমন প্রকৃতি উহাতে তার জন্য সেইরূপ সাধনপথ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। অতএব অনেকেরই এ সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই। এখন যুবকদের মনের অবস্থা ভাবিয়া দেখা

যাক্ ;—দেখা যাক্ আমাদের নেশন-লক্ষ্যের সাধনায় ব্রতী হইবার পক্ষে তাহাদের প্রকৃতিগত বিঘ্ন কি আছে।

দেশে যখন ইংরাজশাসন আরম্ভ হয়, তখন দেশের লোক একটা তমোভাবের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল—অবশ্য বেশী ভাগ লোকের কথাই বলা হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রবল তমোভাব দেখিয়া রজোভাবের দ্বারা উহাকে দূরীভূত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তারপর ইংরাজ ও পাশ্চাত্য-জাতিদের সঙ্ঘবদ্ধতার ভাব দেখিয়া এবং ইংরাজের স্বার্থান্ধতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া, ঐ তমোভাবকে দেশের যুবকবৃন্দ অনেকটা বিনাশ করিয়াছে। সেইজন্য আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, যুবকদের উৎসাহ ও উদ্যম দেশের তমোভাবকে বিনষ্ট করিবে।

কিন্তু রাজোভাব তমকে নাশ করে বটে, উদ্যমশীল করে বটে, কিন্তু উহার মাথা নাই—অর্থাৎ, প্রবৃত্তি দ্বারাই উহা চালিত হয়। আমরাও দেখিতেছি যে, বর্ত্তমান রজোভাবের অভ্যুদয়ের মূলে ইংরাজবিদ্বেষ বিদ্যমান। অবশ্য অনেক যুবকের হৃদয়ে বিদ্বেষ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ কামনাই প্রবল, কিন্তু ইংরাজবিদ্বেষ প্রায় কম-বেশী সকল জায়গায়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা বিঘ্নের বিরুদ্ধে বিদ্বেষরূপ প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই আমাদের দেশে রজোভাব মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, তমঃ অপেক্ষা রজোভাব মানুষের পক্ষে প্রীতিকর ; যে রজোগুণের আস্বাদ পাইয়াছে, সে আর তমোগুণের কাছে ঘেঁসে না। এমন কি, তাহার মনে একটা আশঙ্কা থাকে—যাহাতে সে তমোগুণের কুহকে আর না ডুবে। এইজন্য আমাদের দেশে বিঘ্নের প্রতি বিরোধ লইয়া রজোভাবের

অভ্যুদয় ঘটিয়াছে বলিয়াই, দেশের যুবকবৃন্দ ঐ ভাবটী কতকটা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে। এখন যদি তাহাদিগকে এমন একটি কর্ম্মক্ষেত্রে আহ্বান করা যায়, যেখানে বিঘ্নের প্রতি বিরোধভাব লইয়া দাঁড়াইবার কথাটা চাপা পড়িয়া যাইতেছে, তাহা হইলে তাহাদের সেরূপ কাজে মন উঠে না। এমন কি, তাহারা তর্ক করিবে যে, যে কাজে বিঘ্নবিরোধিত্বের ভাবটি নাই, সে কাজ করিতে যাইলে দেশ আবার তমোমোহে ঘুমাইয়া পড়িবে।

রজোভাবের মধ্যে যাহা উপাদেয় তাহার নাম উত্তম, আর যাহা হেয় তাহার নাম প্রবৃত্তি। দেশ যখন তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন প্রবৃত্তি বা বিঘ্নবিরোধিতার সাহায্যে উত্তম আনিতে হইয়াছে; এখন সমস্যা এই যে, উত্তমকে বজায় রাখিতে হইলে আমাদের মধ্যে বিঘ্নবিরোধিতার ভাবটি অপরিহার্য্য কি না। বিঘ্নবিরোধিতার ভাব ভিন্ন উত্তমকে বজায় রাখিবার কি অন্য উপায় নাই?

উত্তর,—আছে। প্রমাণ—স্বামী বিবেকানন্দের জীবন; তিনি উত্তমের মূর্ত্তিমান্ অফুরন্ত উৎস ছিলেন, কিন্তু সে উত্তম প্রবৃত্তি-প্রসূত নহে। মহান্ আদর্শের মধ্যেও উত্তমের বীজ নিহিত থাকে। জগতের সমস্ত কর্ম্মবীরের জীবন আলোচনা কর, দেখিতে পাইবে—তাঁহারা এক একটা মহদাদর্শ ধরিয়া আপনা-দিগকে সেই আদর্শের সহিত একীভূত করিয়া দিয়াছেন, এবং সেই আদর্শ হইতে তাঁহাদের জীবনে উত্তমের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। অতএব একটা আদর্শ যদি কেহ হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারে, তবে উত্তমের জন্য সামান্য প্রবৃত্তির দাস হওয়ার কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

আমাদের দেশের যুবকগণ যদিও বিঘ্নবিরোধিতাপ্রসূত প্রবৃত্তির

বশবর্ত্তী হইয়া বহুকালপোষিত তমোভাবকে বিনষ্ট করিতে পারিয়াছে, প্রবৃত্তির বশ্যতা এখন আর তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে। তাহারা যে উদ্যমের আস্বাদ পাইয়াছে, যে রজোভাবের উত্তেজনা অনুভব করিতেছে, এখন সেই উদ্যম ও উত্তেজনাকে প্রবৃত্তির হাত হইতে রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন ; কারণ, তমোমূলক রজোভাব, প্রবৃত্তিমূলক উদ্যম লইয়া দেশে উপযুক্ত ক্ষত্রিয়শক্তির উদ্ভব হইবে না। আমাদের প্রাচীন ক্ষাত্রশক্তি সত্ত্বমূলক রজোভাবের বিকাশ। ঐ ক্ষাত্রশক্তিকে আবার আমাদের দেশে জাগাইয়া তুলিতে হইলে, উদ্যমের মূলে প্রবৃত্তিকে না জাগাইয়া, একটা মহান্ আদর্শকে ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। সনাতনধর্ম্মের সংরক্ষণ, সনাতনধর্ম্মের জন্য দেহ-মন-প্রাণ উৎসর্গ করাই ঐ মহান্ আদর্শ।

অতএব দেখা গেল যে, বিঘ্নবিরোধিতা ছাড়াও উদ্যমকে জাগাইয়া রাখিবার প্রকৃষ্টতর উপায় রহিয়াছে। এখন এই বিঘ্নবিরোধিতার ভাবটা আমাদের হৃদয় হইতে সরাইয়া দিতে হইবে ; কারণ, উহা একদিকে যেমন প্রকৃত ক্ষাত্রশক্তির উদ্ভবের বিরোধী, অপরদিকে তেমনই যে পরমার্থসাধনার উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশকে একযোগ করিতে হইবে, সেই পরমার্থসাধনারও বিরোধী। আমাদের প্রথম কাজ—নেশন লক্ষ্য ধরিয়া—অর্থাৎ, পরমার্থসাধনার জন্য—একজোট হওয়া ; ক্ষাত্রশক্তি প্রভৃতির বিকাশ তার পরের কাজ। অতএব দেখিতেছি গোড়াথেকেই বিঘ্নবিরোধিতার ভাবটা বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি বিঘ্নঘটার মধ্যে কোন উপকারিতাই স্বীকার কর, তবে কোন ভাবনা নাই—পথে ভবিষ্যতে অনেক বিঘ্নই ঘটিবে ; কিন্তু এখন থেকে বিঘ্নের ধ্যানে

চিত্ত নিযুক্ত রাখিয়া গোড়ার কাজ কেন মাটি করিব,—হীনভাবরূপ গলদ গোড়াতেই কেন প্রবিষ্ট করিব ?

অতএব বিঘ্নের প্রতি বিরোধভাব যদি চিত্ত হইতে সরাইয়া ফেল, তবে—হে যুবক ! তোমার প্রকৃতি যেরূপই হউক, পরমার্থ-সাধনে যদি তোমার আগ্রহ থাকে, তবে ঐ সাধনায় তোমার স্থানও আছে। পরমার্থসাধন বলিতে মোটামুটি কি বুঝায় জান ?—ত্যাগ ও সেবা,—The national ideals of India are *renunciation* and *service*,—স্বামীজী বুঝাইয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম-সাধনার প্রণালী অনেক রকম আছে,—সনাতন ধর্ম্মের পরিচয় লাভ হইলে একথা বুঝিবে ; কিন্তু সমস্ত রকম সাধনপ্রণালীর মধ্যে গতি-নির্ণয়, উন্নতির হিসাব, কি উপায়ে হয় ? উপায়,—ত্যাগের প্রতি লক্ষ্য রাখা। যিনি যেমনই সাধনার সাধক হউন, যে পরিমাণে তাঁহার ত্যাগ বাড়িতেছে,—অর্থাৎ, আসক্তি কমিতেছে,—তিনি সেই পরিমাণে উন্নত। সেই জন্য পরমার্থসাধনার 'কম্পাস' হইতেছে—ত্যাগ বা অনাসক্তি। অতএব ধর্ম্ম বলিতে কিছু একটা কিম্ভূত-কিমাকার বুঝায় না, বুঝায়—অনাসক্তি। যিনি পরম অনাসক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাণ, ব্রহ্ম, বা পরাভক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন। পরম অনাসক্তির দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যেমন জ্ঞানমূলক, ভক্তিমূলক সাধনপথ আছে, তেমনই আবার কর্ম্মমূলক সাধনপথ আছে। এই কর্ম্মমূলক সাধনপথের নাম—সেবা। কর্ম্মমূলক সেবা বা কর্ম্মযোগ আবার অনেক রকমের আছে। কর্ম্মযোগ জ্ঞানসাপেক্ষ হইতে পারে, ভক্তিসাপেক্ষ হইতে পারে, আবার নিরপেক্ষ হইতেও পারে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইত্যাদির ভাবটী রক্ষা করিতে হয়,—

সমস্তই ব্রহ্ম—অন্যভাবে যে দেখি সেটা অজ্ঞান, সেটাকে বর্জ্জন করিতে হইবে; অজ্ঞানের মূল হ'ল অহংভাব;—'আমি' বলিতে যা বুঝি, বা 'আমার' বলিতে যা বুঝি, তাহাকে ব্রহ্মার্পণ করিতে হইবে,—'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই জ্ঞানে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। এই ভাবে আপনাকে দিয়ে দেওয়ার নাম—জ্ঞানসাপেক্ষ সেবা। ভক্তিসাপেক্ষ সেবায় জীব ও জগৎকে নিজ ইষ্টেরই মায়ারূপ বলিয়া ধারণা করিতে হয়,—অর্থাৎ, নিজ ইষ্টদেবতাই বিচিত্রাবস্থাপন্ন জীবরূপে আমার সেবা গ্রহণ করিতে উপস্থিত রহিয়াছেন; তিনিই আমার পূজা লইতে কখনও দরিদ্র-আতুর, কখনও বিদ্যাবুদ্ধিহীন ইতরলোক, কখনও সংসারতাপদগ্ধ সাধন-ভজনহীন অজ্ঞানী সাজিয়া আমার কাছে আসিতেছেন; আমি উপযুক্ত উপকরণ দ্বারা তাহার অভাব মোচন করিলেই—তাঁহার সেবা করা হইল। এইরূপ স্থির-ভক্তির চক্ষে জীবগৎকে দেখিয়া সেবা করার নামই—ভক্তি-সাপেক্ষ সেবা। নিরপেক্ষ সেবায় সেবক ভাবে যে, সেবা করাই তাহার ধর্ম্ম; সে' সেবায় নিজের বা অপরের কোন সুফল হউক বা না হউক, সেবকের কিছু আসিয়া যায় না;—জীবসেবাই তার স্বধর্ম্ম; জীবসেবার জন্য সে সব সময় যেন কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে—সুযোগ বা আহ্বান পাইলেই হইল। বিশ্বমৈত্রী, বিশ্বপ্রেম প্রভৃতি সাধন করিবার অপেক্ষায় বুদ্ধদেব একরকম কর্ম্মযোগ প্রচার করিয়াছিলেন; উহার মূলকথা—বিশেষ ভাবসাধন-উদ্দেশ্যে জীবসেবা। জৈনমতে অশুভ আস্রবের নাশ, বা বৌদ্ধমতে বিশেষ-পারমিতার প্রাপ্তির জন্য যে কর্ম্ম সাধককে করিতে হয়, তাহাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-সেবা বলা যায় না। নিরপেক্ষ-সেবাধর্ম্মে আশু অভাব-মোচন ছাড়া

আর কোনরূপ গৌণ ফলপ্রত্যাশা নাই—মান-যশ, প্রতিপত্তি, আত্মগৌরব ত দূরের কথা।

কিন্তু নিরপেক্ষ-সেবাধর্ম্মে যে সেবকের কোন রকম হুঁসিয়ারি নাই, তাহা নহে। জ্ঞানসাপেক্ষ সেবায় ব্রহ্মভাবের হুঁস থাকা চাই; ভক্তিসাপেক্ষ সেবায় ইষ্টের অধিষ্ঠানের প্রতি হৃদয়-মনের হুঁস থাকা চাই; তেমনি নিরপেক্ষ সেবায় হুঁস থাকা চাই নিরপেক্ষতার উপর,—অর্থাৎ, সেবায় যাহাতে অভাব-মোচন ছাড়া আর কোনও রকম ফলপ্রত্যাশা না থাকে, সেদিকে তীব্র লক্ষ্য রাখা চাই। সেবায় কোন রকম 'পলিসি' ত থাকিবেই না, আবার নিজের কোন রকম লাভও থাকিবে না—আধ্যাত্মিক উন্নতি-চেষ্টা পর্য্যন্ত নয়,—অথবা নিজের দয়া প্রভৃতি কোন বৃত্তির পরিতৃপ্তিও নয়। অথচ সেবাটী ঠিক-ঠিক সেবা হওয়া চাই—দেহ-মন-বুদ্ধি সেবায় ঢালিয়া দিতে হইবে,—দেহ আলস্য বা আরাম খুঁজিতেছে না, মন সেবা-কাজ ছাড়া আর কিছুতে বিক্ষিপ্ত হয় না, বুদ্ধিতে আপনাকে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন রকম হিসাব বা ধারণা নাই। এইরূপ নিরপেক্ষ সেবাধর্ম্মকেই প্রকৃত নিষ্কামকর্ম্ম বলে; ইহার অধিকারী এ পর্য্যন্ত দুর্লভ ছিল। এই নিষ্কামকর্ম্মও পরমার্থসাধনা,—কারণ ত্যাগেই ইহার গতি।

দেশের কাজ বলিতে আমরা বুঝিলাম কি? বুঝিলাম—

(১)

পরমার্থরূপ জাতীয় লক্ষ্য ধরিয়া দেশের সর্ব্বত্র একযোগ হওয়া।

(২)

লক্ষ্যধরার অর্থ—লক্ষ্যবুঝা, লক্ষ্য প্রচার করা, লক্ষ্য সাধন করা।

সকলেই সবটা বুঝে না, বা প্রচার করিতে পারে না ; কিন্তু সকলেই অল্পাধিক লক্ষ্যের সাধন করিতে পারে। সকলেই একজোট হইতে পারে।

(৩)

লক্ষ্যসাধনের দুইটীর মধ্যে একটী প্রধান অঙ্গ—সেবা। লোক-সেবার তিনটী বিভাগ,—শারীরিক অভাব-মোচন, মানসিক অভাব-মোচন বা শিক্ষাদান ও আধ্যাত্মিক অভাবমোচন বা ধর্ম্মদান। কিন্তু সেবাকার্য্য যেন জ্ঞানসাপেক্ষ, বা ভক্তিসাপেক্ষ, বা পূর্ণ নিরপেক্ষ হয় ; তাহা না হইলে উহা দ্বারা পরমার্থের সাধনা হইবে না। জ্ঞান, বা ভক্তির দ্বারা সেবার ভিত্তি গড়িয়া লওয়াই অধিকাংশস্থলে শ্রেয়স্কর।

(৪)

উদ্যমের মূলে যেন ইংরাজ-শাসনরূপ বিঘ্নের প্রতি বিরোধভাব না থাকে। আমাদিগকে বাঁচিবার জন্য দেশে নেশন খাড়া করিতে হইবে ; দাঁড়াইবার পর পথের বিঘ্ন হিসাব করা যাইবে। লোক-সেবার দ্বারাই ক্ষত্রিয় বীর্য্যের প্রকৃত পত্তন হইবে।

(৫)

উৎসাহ পাইবার জন্য, ভালবাসিবার জন্য, হৃদয়ে যদি কিছু ধারণ করিতে চাও, তবে সনাতনধর্ম্মকে গ্রহণ কর। উহার প্রতি প্রাণপণ অনুরাগ, উহার জন্য দেহ-মন সমর্পণ, উহার জন্য বাঁচা-মরার ভাব পোষণ কর। সনাতনধর্ম্মই আমাদের দেশে নেশন গড়িতে সক্ষম—সনাতনধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যতীর্থে পরিণত করিয়াছে, নহিলে পাশ্চাত্য স্বদেশভাবের কোনও অর্থ আমাদের পক্ষে নাই। অতএব সনাতনধর্ম্মকেই ভালবাসিতে শিখ ও শিখাও।

(৬)

দেশকে নেশনরূপে organise করার কাজ স্বামী বিবেকানন্দ আরম্ভ করিয়াছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত "রামকৃষ্ণমিশন" ঐ কার্য্যে ব্রতী। "উদ্বোধনে" "ভারতের সাধনা" নামক প্রবন্ধ পর্য্যায়ে ঐ ব্রত উদ্‌যাপনের কথা আলোচিত হইতেছে। অতএব স্বামীজীর পতাকার নিম্নে আসিয়া দেশকে একজোট হইতে হইবে। দেশের যে যেখানে আছ প্রকৃত দেশের কাজ আরম্ভ করিয়া দাও, রামকৃষ্ণমিশন এক সময় সকলকেই একত্র সন্নিবিষ্ট করিবে।

(৭)

দেশের কাজ করিবার জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, তাহাদের জন্যই এত কথা বলা হইল। যাহারা সে আসরে নামে নাই, তাহাদের জন্য বিশেষ ভাবে কিছু বলা হইল না। তাহাদিগকেও যথাসম্ভব আদর্শ দিতে হইবে।

প্র/৩২৩

ভারতের সাধনা।

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে; বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষামাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য্য কর্‌ছে, সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যে দিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে, সে দিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ দারিদ্র্য, ঘরে বাইরে উৎপাত স'য়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে—সেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।"

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য"—স্বামী বিবেকানন্দ।

প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা।

(উদ্বোধন—মাঘ, ১৩১৮)

পাশ্চাত্যে "নেশন" কথাটার ভারি প্রচলন, কিন্তু শব্দটার ঠিক বাঙ্গালা অনুবাদ হয় বলিয়া মনে হয় না। তার কারণ আছে। অথচ প্রসঙ্গের সূত্রপাতেই প্রশ্ন উঠিতেছে যে, ভারতে কখনও নেশন ছিল কি না, বা হইতে পারে কি না।

পাশ্চাত্যে যেখানে নেশন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখিতে পাই—দীর্ঘকাল একত্র বসবাস করিবার পর একটা লোক-সমষ্টি ঐ নেশন-সংজ্ঞা পাইয়াছে। নানা ঘটনাবিপর্য্যয়ের নাড়াচাড়ায়, ভাষা, ভাব, ধর্ম্ম প্রভৃতির সাম্য ও বৈষম্যের ঘাতপ্রতিঘাতে, একটা

লোকসমষ্টি অনেক কাল পরে নেশনে পরিণত হয়। কিন্তু নেশনে পরিণতি যখন একবার ঘটিয়াছে, তখন আর পূর্ব্ব অবলম্বন ও উপকরণগুলি অপরিহার্য্য বলিয়া গণ্য হয় না। গর্ভাশয়ে যে সমস্ত অবলম্বন শিশুজীবনের পক্ষে অপরিহার্য্য, ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেগুলি আর অপরিহার্য্য নহে; সেইরূপ যে সকল ঐক্য-সূত্রের অবলম্বনে একটা লোক-সমষ্টির মধ্যে "নেশনত্বের" সঞ্চার হয়, নেশন একবার গড়িয়া উঠিলে সে সমস্ত ঐক্যসূত্র আর অপরিহার্য্য নহে। পাশ্চাত্যে অনেকস্থলে ভাষা, ধর্ম্ম ও জাতির বৈচিত্র্যসত্ত্বেও অপ্রতিহত ভাবে নেশনের উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

সেইজন্য আরও সূক্ষ্মভাবে আধুনিক নেশনগুলিকে পরীক্ষা করিলে তিনটী মূল লক্ষণ পাওয়া যায়। প্রধান লক্ষণ এই যে, প্রত্যেক পরিণত নেশনের একটা সার্ব্বজনীন ও সর্ব্বব্যাপক লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট থাকে বা নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে,—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Immanent End। দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, নেশনের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ও রীতিনীতিতে, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সাধনায় ঐ লক্ষ্যই আশু না হউক চরম সাধ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে পরিমাণে যে নেশন তদনুষ্ঠেয় সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে স্বীয় লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য, সেই পরিমাণে সে দৃঢ়সম্বদ্ধ ও সুপরিপুষ্ট। তৃতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠাকে সুবিহিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নেশন একটী কেন্দ্রশক্তি স্বীকার করে; সাধারণতঃ নেশনের লক্ষ্য যাহার বা যাহাদের উপলব্ধ, সে বা তাহারাই ঐ কেন্দ্রশক্তির আশ্রয়। অতএব কোন্ লোকসমষ্টি নেশনে পরিণত তাহা বুঝিতে হইলে, তিনটী লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখিতে হইবে,—যথা, লক্ষ্যেকনির্দ্দেশ,

প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা।

সর্ব্বসাধনায় লক্ষ্যৈকসাধ্যত্ব এবং সাধ্য-সাধনার যোগস্থাপনে এক কেন্দ্রশক্তির নিয়ন্তৃত্ব।

পাশ্চাত্য নেশনসমূহ একই লক্ষ্য অবলম্বনে গড়িয়া উঠিয়াছে; এককথায় তাহাদের সে লক্ষ্য—ঐহিক প্রতিপত্তি। তবে উহাদের মধ্যে পরস্পরে একটু বিশেষত্বও রহিয়াছে। সেটা এই যে, একএকটা নেশন একএকটা বিশেষ সূত্রে স্বকর্তৃত্বের ভাবটা অপেক্ষাকৃত সহজে বুঝিতে পারে; যেমন, ইংরাজ নেশন আয়-ব্যয়ের অধিকারসূত্রে স্বকর্তৃত্ব সহজে বুঝে। যেরূপ কর্তৃত্বসূত্রেই হউক, ঐহিক প্রতিপত্তিলাভই পাশ্চাত্য নেশনসমূহের চরম উদ্দেশ্য।

যার লক্ষ্য যে ব্যক্তিতে সুসিদ্ধ, তার শ্রদ্ধাও সেই ব্যক্তিতে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট। প্রাচীনকালে নেশন গঠনের সূচনায়, ঐহিক প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য লক্ষ্যরূপে আশ্রিত হইয়াছিল,—তাই ঐ লক্ষ্যসিদ্ধির প্রতীকরূপে রাজাই নেশন-গঠনে নিয়ন্তার আসন পাইয়া আসিয়াছেন। প্লেটোর "রিপাব্লিক" বা দেশে জ্ঞানীর শাসনতন্ত্রতা, ইউরোপের একটা স্বপ্নমাত্র; প্রাচীন খৃষ্টানদের ধর্ম্ম-মণ্ডলী ইউরোপের জমিতে টিকিল না, একটা প্রভাবমাত্র রাখিয়া নেপথ্যে সরিয়া পড়িল। ঐহিক প্রতিপত্তি যেখানে লক্ষ্য, রাজ-শক্তির নিয়ন্তৃত্ব সেখানে অনিবার্য্য, এবং রাজশক্তি যেখানে নিয়ন্ত্রী, রাজনীতির উপরই সেখানে সকল ব্যবস্থার ভার সমর্পিত হইবেই।

তবে রাজনীতি রাজশক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন পাশ্চাত্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে গড়িয়া তুলিয়াছে। রাজা ঐহিক প্রতিপত্তির

আদর্শস্থানীয় বটে, কিন্তু যখন সমগ্র লোক সমষ্টি সেই প্রতিপত্তির ভিখারী, তখন রাজাকে প্রজামধ্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল সমৃদ্ধির বণ্টন করিতে হয়। কিন্তু সম্পদের নেশা "চমৎকারা", স্বার্থপরতা উহার অঙ্গীভূত। এইজন্য স্বার্থপর রাজার সহিত প্রজার বিরোধ-কুজ্ঝটিকায় পাশ্চাত্য ঐতিহ্যগগন সর্ব্বকালেই আচ্ছন্ন। রাজনীতি এই বিরোধের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া এক এক দেশে এক এক রকম শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্যে সর্ব্বত্র রাজশক্তিই কেন্দ্রশক্তি; তবে উহা সম্প্রতি প্রজাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত লক্ষ্যাভিজ্ঞ নেতৃগণের মধ্যে অবস্থিত; এবং রাজপদ কোথাও বা প্রজাকর্ত্তৃক অপাকৃত, কোথাও বা রাজশক্তির প্রাচীন নিদর্শনরূপে উচ্চাসনপ্রদানে স্বীকৃত।

ঐহিক প্রতিপত্তিকে লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করায় পাশ্চাত্য নেশন-সমূহে রাজনীতির প্রাধান্য অনিবার্য্য হইয়াছে। যদি বল, নেশন-মাত্রেরই ঐ এক লক্ষ্য স্বীকার করা চাই, নচেৎ নেশন বলিয়া সে গণ্য হইবে না, তবে এইখানেই আমাদের পূর্ব্ব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, অর্থাৎ এইখানেই স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতে কখনও নেশন ছিল না, হইবেও না। কিন্তু যখন দেখিতেছি নেশনের মূল লক্ষণে লক্ষিত হইয়া প্রাচীন কালেও একটা লোকসমষ্টি মানবেতিহাসে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি রাখিয়াছে, তখন একটা সঙ্কীর্ণ অর্থে নেশন শব্দকে আবদ্ধ করা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক। পাশ্চাত্যদেশে লক্ষ্যবিশেষের সাধনে সম্প্রতি যেমন এক একটা দেশব্যাপী সাধকসমবায় গড়িয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ একই লক্ষ্যের সাধনে একটা সমগ্র দেশব্যাপী সমাজকে

দীক্ষিত দেখিতে পাই। লক্ষ্যৈকনিষ্ঠতা উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে বিদ্যমান, কেবল লক্ষ্যের নির্ব্বাচনেই তদুভয়ের পার্থক্য। লক্ষ্যের ঐরূপ নির্ব্বাচনে লোকসমষ্টির স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করিয়া একটীমাত্র লক্ষ্যের সঙ্গেই যদি নেশনত্ব সংলগ্ন করিয়া দাও, তবে বলিব ভারতে "নেশন" কখনও গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু তদনুরূপ "সাধকসমবায়" নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তবে "ন্যাসন্যাল" শব্দটী আজকাল নাকি "ভারতীয়" অর্থে অধিকাংশ স্থলেই গৃহীত হইয়াছে, সেইজন্য আমাদের বুঝা আবশ্যক কি অর্থে এদেশে "নেশন" শব্দের প্রয়োগ করা চলে।

নেশনের তিনটী প্রধান বা মৌলিক লক্ষণ প্রাচীন ভারতেও অভিব্যক্ত হইয়াছিল। একটী লক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া এদেশেও বিশাল লোকসমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছিল; তাহাদের সর্ব্ববিধ ক্রিয়া-কলাপে, সর্ব্ববিধ সাধনায় একই লক্ষ্য অনুস্যূত থাকিয়া চরম-সাধ্যরূপে গণ্য হইয়াছিল এবং সমস্ত সাধনাকে সেই চরম-সাধ্যের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য নিয়ন্তৃশক্তিও সুনির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ভারতে নেশন গড়িবার ছাঁচটী পাশ্চাত্যের ছাঁচ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিলে ভারতে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে "নেশন" না বলিয়া থাকিতে পার না, কিন্তু জগতে ঐরূপ নেশন আর কোথাও গঠিত হয় নাই।

তাহার কারণও যথেষ্ট রহিয়াছে। প্রথমতঃ, লক্ষ্যনির্দ্দেশে প্রবল পার্থক্য। পাশ্চাত্যের লক্ষ্য ঐহিক প্রতিপত্তি, ভারতের লক্ষ্য বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সাধনা। পাশ্চাত্যে ঐশ্বর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণই পথনির্ণায়ক, ভারতে বেদ বা পরমজ্ঞানই পথ-

নির্ণায়ক ; সেইজন্য পাশ্চাত্যে নেশন-লক্ষ্য আলোছায়ার মধ্য দিয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে, ভারতে নেশন-লক্ষ্য প্রথমেই, সেই বৈদিকযুগেই সুনির্ণীত ; পাশ্চাত্যে সুচিরার্জ্জিত স্থূল অভিজ্ঞতার উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা, ভারতে সমাধিলব্ধ সত্যের উপর নেশনের প্রতিষ্ঠা।

পাশ্চাত্য ও ভারতের মধ্যে এই নেশন-লক্ষ্যের পার্থক্যই আর সমস্ত পার্থক্যের মূলভিত্তি। এই পার্থক্য যিনি বুঝিয়াছেন, আর সমস্ত রকম পার্থক্য তিনি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। আমরা দেখিয়াছি পাশ্চাত্য নেশনে রাজনীতি কেন চরমমীমাংসক, রাজনীতিক্ষেত্রেই কেন নেশনের নিয়ন্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ; প্রাচীন ভারতে চরম-মীমাংসার ভার রাজনীতি গ্রহণ করে নাই,— রাজশক্তি ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃপদ পায় নাই। কারণ সহজেই অনুমেয় ; লক্ষ্যবিৎই লক্ষ্যসাধনে নিয়ন্তা হন, অর্থাৎ লক্ষ্য যাঁহাতে সুসিদ্ধ, কর্ম্মক্ষেত্রে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠায় তিনিই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইউরোপে রাজশক্তিতেই পাশ্চাত্য নেশন-লক্ষ্য সর্ব্বাপেক্ষা সুসিদ্ধ, তাই রাজশক্তিই স্বভাবতঃ নিয়ন্তৃপদ পাইয়াছেন। ভারতের লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞে সুসিদ্ধ, তাই ব্রহ্মজ্ঞই ভারতীয় নেশনের নেতা ও নিয়ন্তা। রাজার কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা অবলম্বন তাহাই রাজনীতি, সেই রাজনীতিই পাশ্চাত্যে চরম মীমাংসক। ব্রহ্মজ্ঞ কর্ম্মক্ষেত্রে যাহা আশ্রয় করেন, তাহা পরমজ্ঞান বা বেদ, সেই বেদই ভারতে মীমাংসক।

এইজন্য আমরা বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের দেশে যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে রাজনীতিকে প্রধান সাধনক্ষেত্র

বলিয়া ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যাহারা মনে করেন রাজনৈতিক সাধনাই আমাদের সকল সমস্যার পূরণ করিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ তাঁহাদের এখনও কাটে নাই। পাশ্চাত্য রাজনীতিকে পরিহার করা শুধু এই কারণেই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে, আরও কারণ আছে; তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য ও নিয়ন্তার পরিচয় পাইলাম। এখন সেই নিয়ন্তা লক্ষ্যকে কর্ম্মে কিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাই বিবেচ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি নেশনের দ্বিতীয় লক্ষণ, সর্ব্বকর্ম্মে সাধ্যসাধনার পারম্পর্য্য, অর্থাৎ—মনুষ্যোচিত সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা সাধনায় নেশনের লক্ষ্যকেই পরমসাধ্যরূপে স্বীকার করা। পাশ্চাত্য নেশনসমূহে এই দ্বিতীয় লক্ষণটী ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হইতেছে। সমস্ত কর্ম্মবিভাগই ঐহিক প্রতিপত্তিরূপ নেশন-লক্ষ্যের পরিপোষকতায় নিয়োজিত হইতেছে। জ্ঞানই বল, বিজ্ঞানই বল, ধর্ম্মসাধনই বল,—যে সাধনা যে পরিমাণে নেশন-লক্ষ্যের পরিপোষক, সেই পরিমাণে উহা সমগ্র নেশনকর্ত্তৃক সমাদৃত ও আশ্রিত। পাশ্চাত্যে অধুনা সমস্ত তত্ত্ব ও সমস্ত ব্যবহারকে নেশনের কাজে লাগাইবার স্পষ্ট প্রয়াস বিদ্যমান। সেখানে সর্ব্ববিধ সাধনার গতি ঐহিক প্রতিপত্তির দিকে; এই গতি নির্ণয়ের মূলসূত্র ভোগাধিকার বা right, অর্থাৎ—ভোগাধিকারের তারতম্যে ঐহিক প্রতিপত্তির হিসাব হয়। ঐহিক প্রতিপত্তিই মুখ্য উদ্দেশ্য, ভোগাধিকারের বৃদ্ধি উহার গৌণ সোপানস্বরূপ। কিন্তু অধিকার-সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া ঐ বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়, নতুবা সর্ব্বত্রই তুমুল বিরোধ বাধিয়া যায়; ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতির দ্বারা পাশ্চাত্য নেশন ঐ সামঞ্জস্য রক্ষার

উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লয়। রজঃপ্রধান পাশ্চাত্যের মূলমন্ত্র,—বিরোধের সামঞ্জস্য; এই মন্ত্র সহায়ে সে লক্ষ্যের প্রতি অগ্রসর হয়। প্রথমেই ভোগের অভিমুখে গতি, দ্বিতীয়তঃ ভোগাধিকার লইয়া বিরোধ, তৃতীয়তঃ সেই বিরোধের একটা সামঞ্জস্য; তারপর আবার নূতন ভোগের প্রতি গতি হইতে আরম্ভ ও আবার একটা সামঞ্জস্যে স্থিতি। লক্ষ্যাভিমুখে উন্নতির ইহাই পাশ্চাত্য প্রণালী। ইহা ব্যষ্টিতে যেমন প্রযোজ্য, সমষ্টিতেও তেমনি; নেশনের অভ্যন্তরে যেমন কার্য্যকরী, বাহিরেও তেমনি।

পাশ্চাত্যে যেমন ভোগাধিকার বা স্বাধিকারের বৃদ্ধিই চরম লক্ষ্যের প্রতি গতিনির্ণায়ক, ভারতে তেমনই স্বধর্ম্মের বৃদ্ধিই ঐ গতি নির্ণয় করে। পাশ্চাত্যে যার যত স্বাধিকার বা rights বেশী সে তত লক্ষ্যের সন্নিকট, ভারতে যার যত স্বধর্ম্ম বেশী সে তত লক্ষ্যের সন্নিকট। অতএব পাশ্চাত্যে অধিকার-অর্জ্জন এবং প্রাচ্যে ধর্ম্মার্জ্জনই মানুষের নেশন-নির্দ্দিষ্ট আশু লক্ষ্য।

ভারতীয় নেশনে ব্রহ্মজ্ঞ-নিয়ন্তা মনুষ্যসুলভ সমস্ত কর্ম্মকে স্বধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন। মানুষের সমস্ত কর্ম্ম, জড় ও জীবের সহিত তাহার যোগাযোগ-বিধানে পর্য্যবসিত। এই যোগা-যোগকে ব্যবহার বলে। সমস্ত ব্যবহারে জড় ও জীবের সহিত যে আদান-প্রদান, তাহার আদান বা আদায়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে পাশ্চাত্যের স্বাধিকারভাব পাওয়া যায় এবং প্রদান বা দেয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহারে প্রবৃত্ত থাকিলে প্রাচ্যের স্বধর্ম্মভাব (duty) পাওয়া যায়। ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃগণ এই স্বধর্ম্মভাবকে সর্ব্বব্যবহারের মূলসূত্ররূপে

গ্রহণ করিয়া নেশন গড়িয়াছিলেন, সেইজন্য প্রাচীন সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে স্বধর্ম্মের উল্লেখ-বাহুল্য। যেমন আমার স্বাধিকার অর্থে 'আমার কি প্রাপ্য' বুঝায়, তেমনি আমার স্বধর্ম্ম অর্থে 'আমার কি দেয়' বুঝায় ;—একটী ভোগদৃষ্টি, অপরটী ত্যাগদৃষ্টি। যার যাহা স্বাধিকার যদি সে পায়, তবে পাশ্চাত্য নেশন নির্ব্বিবাদে উন্নতি করে ; যার যাহা স্বধর্ম্ম যদি সে করে, তবে ভারতীয় নেশনও নির্ব্বিবাদে উন্নতি করে। ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞ-নেতা এই ত্যাগমূলক স্বধর্ম্মসূত্রকে প্রয়োগ ও অবলম্বন করিয়া সমাজ গড়িয়াছিলেন ; ফলে স্বধর্ম্মপালনে প্রতিপদে পরমার্থরূপ চরমলক্ষ্যের সাধনাও সাধিত হইত। স্বধর্ম্মপালনজনিত ত্যাগে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইত, এবং লক্ষ্যসিদ্ধির অধিকার বা সামর্থ্য জন্মিত। ত্যাগ অর্থে হেয়াংশের বর্জ্জন ও উত্তমাংশের গ্রহণ ; স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা প্রতিপদে অধম আমিত্বের বর্জ্জন ও উত্তম আমিত্বের গ্রহণ নিষ্পন্ন হইত, এবং ক্রমশঃ মহৎ হইতে মহত্তর আমিত্বের আরোপ মানুষকে ব্রহ্মভাবে পৌঁছাইয়া দিত। পাশ্চাত্যের অধিকার-সামঞ্জস্যের মধ্যেও একভাবে আমিত্বের প্রসার হয় বটে, কিন্তু সে আমিত্বে ভোগবীজ বা বাসনা নিহিত থাকায় সোপানপরম্পরায় আমিত্ব বৃহৎ বা মহা-শক্তিসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু মহৎ বা মহাসত্ত্বসম্পন্ন হয় না। আমাদের পুরাবৃত্তে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে তীব্র-তপস্যাসম্পন্ন সকাম সাধক ত্রিলোকের উপরও ভোগাধিকার স্থাপন করিয়াছে ; রজোভাবের এই প্রবল অথচ সূক্ষ্ম উৎকর্ষকে শাস্ত্র আসুরিক বলিয়াছেন, উহা মায়াপ্রবাহে বৃহৎ বুদ্‌বুদের মত একদিন অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বরপুত্র

নেপোলিয়নের জীবনলীলা একদিন বুদ্‌বুদের মত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ত্যাগে যে মহৎ আমিত্বের সঞ্চার হয় উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত; সত্য ব্রহ্মপ্রকাশক।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় নেশন-নিয়ন্তৃগণ কিরূপ মূলসূত্রের প্রয়োগে সর্ব্বকর্ম্মের মধ্যে নেশন-লক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা দেখিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় নেশন বলিতে কি বুঝায়, তাহাই আলোচ্য,—সেইজন্য সংক্ষেপে লক্ষণত্রিতয়ের বিচার করা হইয়াছে; প্রাসঙ্গিকভাবে বক্তব্য বিষয় ও আপত্তি অনেক উঠিতে পারে; এ প্রবন্ধে সে সমস্ত আলোচনা করা হইল না, ভবিষ্যতে হইবে। উপসংহারে কেবল একটী আপত্তির বিচার করিব।

ভারতীয় নেশনের প্রথম লক্ষণ অর্থাৎ লক্ষ্যৈক-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে একটা আপত্তি হইতে পারে। আপত্তি এই যে, বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ব্যক্তিগত সাধনারই লক্ষ্য হইতে পারে,—ঐ লক্ষ্য সাধনের জন্য একটা সমাজ বাঁধিবার আবশ্যকতা কিরূপে হয়? বৈদিক ঋষি ব্রহ্মলাভ করিবার পর একটা "নেশন" গড়িবার কার্য্যে কেন হস্তক্ষেপ করিলেন?

প্রশ্নের এককথায় উত্তর—'জগদ্ধিতায়'। বৈদিক ঋষি দেখিলেন "পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।" মানুষ স্বভাবতঃ বহির্মুখ, ভোগান্বেষী; এই মানুষকে শ্রেয়ের প্রতি চালিত করিবার শুভসংকল্প আদিম ঋষি হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, ঋষি বিশ্ব-মানবের দিকে চাহিয়া নেশন গঠনে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, বিশ্বের

প্রাচীন ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা।

মঙ্গলই ভারতীয় নেশনের মূল অভিপ্রায়। শ্রেয়ঃকামনায় ঋষির কোনও গণ্ডী ছিল না, শ্রেয়ের বিতরণেও ভারতীয় নেশনের কোনও গণ্ডী নাই। সেইজন্য বিশদভাবে বলিতে হইলে, ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য—পরমার্থের অর্জ্জন, অনুশীলন ও প্রচার।

সমাজস্রষ্টা ঋষি ব্রহ্মরূপ যে মহারত্ন লাভ করিলেন, বিশ্ব-মানবের জন্য তৎসংরক্ষণের উপায়ও তিনি উদ্ভাবিত করিলেন; সেই উপায়ই ভারতীয় প্রাচীন সমাজ বা নেশন। এই নেশন বা সমাজের উদ্ভব আর্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান অথবা পরমার্থ হইতে, ইহার স্থিতি সেই পরমার্থ লইয়া, এবং ইহার লক্ষ্য সেই পরমার্থের সংরক্ষণ ও ঘোষণা। এমন একটী নেশন-নির্ম্মাণ ব্যতীত যুগপরম্পরায় পরমজ্ঞানের অনুশীলন ও সংরক্ষণের আর কি উপায় হইতে পারে? এরূপ নেশনরূপ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে ব্রহ্মজ্ঞের অভিব্যক্তি যেমন সম্ভাবিত, ঋষিলব্ধ পরমার্থরত্নের স্থায়িত্বও সেইরূপ সম্ভাবিত। এই সুমহৎ কৌশলের অভিজ্ঞতা হইতে আমরা ভগবৎ-প্রতিশ্রুতি পাইয়াছি—"সম্ভবামি যুগে যুগে।" যথাসম্ভব বিশদভাবে এই কৌশলের পরিচয় দেওয়াই "ভারতের সাধনা"শীর্ষক প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য; আশা করি এই পরিচয় লাভে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যাসমূহের মীমাংসায় আমরা সহজেই উপনীত হইব।

ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব।

(The type of Indian Nationalism)

(উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩১৮)

"প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাজাতির মধ্যে আমাকে বেড়াইতে হইয়াছে, তাই জগতের কতকটা আমি দেখিয়াছি। সব জায়গায় আমি দেখিয়াছি যে প্রত্যেক নেশনের মধ্যে তার মেরুদণ্ডস্বরূপ একটা চরম আদর্শ রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে রাজনীতিই এই চরম আদর্শ, কাহারও মধ্যে বা সামাজিক উৎকর্ষ, আবার কাহারও মধ্যে বা মানসিক উৎকর্ষ,—এইরূপে জাতীয় প্রতিষ্ঠার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ প্রত্যেকেই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু আমাদের জন্মভূমি আশ্রয় করিয়াছেন পরমার্থকে, যে পরমার্থই তাহার আধার, যে পরমার্থই তাহার মেরুদণ্ড, যে পরমার্থরূপ পাষাণ-ভিত্তির উপরই তাহার বিশাল জীবনপ্রাসাদ স্থাপিত হইয়াছে। * * আমি এখন বিচার করিতেছি না, কিরূপ আদর্শের মধ্যে একটা নেশন বা জাতির প্রাণশক্তি নিহিত থাকা ভাল—পারমার্থিক আদর্শের মধ্যে কি রাজনৈতিক আদর্শের মধ্যে; কিন্তু একথা পরিষ্কাররূপে স্বীকার্য্য যে, ভালর জন্যই বল বা মন্দর জন্যই বল, আমাদের প্রাণশক্তি আমাদের ধর্ম্মের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে। তুমি ইহাকে আর পরিবর্তন করিতে পার না; ইহার পরিবর্ত্তে, ইহাকে নষ্ট করিয়া, প্রাণশক্তির জন্য অপর আশ্রয় স্বীকার করিতে পার না। * * ভালই হউক বা মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের অভ্যন্তরে পারমার্থিক আদর্শই প্রবিষ্ট হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীপ্তস্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি ভারতাকাশ ধর্ম্মতত্ত্বের সাধনায় পরিব্যাপ্ত,—ভালর জন্যই বল আর মন্দর জন্যই বল, আমাদের

জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্ম্মাদর্শেরই সাধনক্ষেত্রে। ফলে ঐ সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে, উহার প্রত্যেক বিন্দুর সহিত ধমনীতে ধমনীতে স্পন্দিত হইতেছে, এবং আমাদের ধাতের সঙ্গে, জীবনীশক্তির সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্ম্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ায় কি গভীর শক্তি তোমাকে প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ! হাজার হাজার বৎসরে যে খাত ঐ প্রবাহের দ্বারা কর্ত্তিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখ তোমাকে উহা আবার পূর্ণ করিতে হইবে! তুমি কি বল, হিমতুষারগর্ভে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্ব্বার নূতন পথে প্রবাহিতা হইবে? তাও যদিই বা সম্ভব হয়—তবু জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থসাধনরূপ বিশেষ জীবনখাতটী পরিহার করা অসম্ভব, এবং রাজনৈতিক বা অন্যভাবে আবার জীবন প্রবাহের সূত্রপাত করাও অসম্ভব।"*

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা নেশনের স্বরূপলক্ষণ নির্ণয় করিয়াছি এবং ভারতবর্ষে কিরূপ নেশনের পত্তন অতীতে হইয়া গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছি। সেই নেশন গঠনে লক্ষ্য ছিল পরমার্থের উপলব্ধি, অনুশীলন ও প্রচার, নিয়ন্তা ছিলেন লক্ষ্যবিৎ ব্রহ্মজ্ঞ এবং কর্ম্মজালরচনায় মূলসূত্র ছিল স্বধর্ম্মভাব।

ভারতীয় নেশনের এই অনন্যসাধারণ গঠনপ্রণালী প্রথমেই সম্যগ্‌রূপে বুঝা আবশ্যক। ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও যদি প্রকৃতভাবে হৃদয়ঙ্গম না করেন, তবে উন্নতির পথে এক পদও আমরা অগ্রসর হইব না। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণ যে নেশনচক্র প্রাচীনতম যুগে একবার চালাইয়া দিয়াছিলেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সে চক্রের গতি একেবারে রুদ্ধ হইবার

* "বেদান্তের সাধানির্দ্দেশ" নামক কুম্ভকোনমে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

উপক্রম হইলেই নব নব ভগবৎ-বিধানে উহা রক্ষা পাইয়াছিল। কিন্তু ভারতে ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বে ঐ চক্রের বেগ একেবারে নিঃশেষিত হইতেছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একটা সমষ্টিবদ্ধ জীবন যে এদেশে রচিত হইয়া রহিয়াছে, সে ধারণাই তখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল; তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমষ্টিবদ্ধ হইবার আশা স্বভাবতঃই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এই দুরাশার পশ্চাতে পশ্চাতেই তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন প্রথম আমাদের গৃহদ্বারে প্রবেশার্থী হইল, তখন প্রথমেই কিন্তু আমাদের হৃদয়ে পাশ্চাত্যের আদর্শে কোনও রাজনৈতিক আশা সুস্পষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নাই,—তখন আমাদের ধাতে যাহা ছিল, তাহারই প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। পাশ্চাত্য আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালীর মেধা সর্ব্বাগ্রেই ধর্ম্মসমন্বয়ের সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এইখানেই প্রাচীন নেশনের ধমনীস্পন্দন স্পষ্ট লক্ষিত হয়। কারণ, ধর্ম্মসমন্বয়ই আমাদের নেশন-সৌধের ভিত্তি-স্বরূপ। জগতের সমস্ত নেশনই এক এক রকম সমন্বয়কে সর্ব্বাবয়বগঠনে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "ইউরোপে রাজনৈতিক আদর্শের দ্বারা নেশনসংহতি গঠিত হয়, প্রাচ্যে ধর্ম্মের আদর্শ নেশনসংহতি গঠন করে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মাদর্শের সমন্বয়ের উপর ভারতের ভাবী কল্যাণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।" "ভারতের ভবিষ্যত" শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজি বলিয়াছেন যে, "this is the first step", অর্থাৎ পা বাড়াইতে প্রথমেই এই ধর্ম্মসমন্বয়ের কাজ। আমাদের

ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব।

প্রাচীন নেশনের ভিত্তি এখনও মজবুত আছে কি না তাহা এই কাজটীতেই প্রমাণিত হইবার কথা।

সর্ব্বকালে ধর্ম্মসমন্বয়ের সামর্থ্যই আমাদের নেশনের প্রথম বিশেষত্ব। যে দিন এই সামর্থ্য লোপ পাইবে, সে দিন উহার মৃত্যু অবধারিত।

ভারতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে, এই ধর্ম্মসমন্বয়ই দিগদর্শনযন্ত্র-স্বরূপ এবং ছোট বড় এক একটা সমন্বয়ের যুগ যেন এক একটা ষ্টেশন বা বিরামকেন্দ্র। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা ভাব বা তত্ত্ব কিরূপে প্রকটিত হইয়া সমন্বয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বিচার করাই ভারতে ঐতিহাসিকের আসল কাজ। সমন্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য দ্বারা ইতিহাসের সমগ্র পথটা কালসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ পৌর্ব্বাপর্য্য বিশদভাবে নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। তবে মোটামুটী এইরূপ ইঙ্গিত করা যায় যে, বেদের "একংসদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্ষেত্রের গীতাসমন্বয় পর্য্যন্ত প্রাচীন যুগ; কলির প্রারম্ভে বিপুল ভাবসংমিশ্রণ হইতে বৌদ্ধসমন্বয় পর্য্যন্ত মধ্যযুগের প্রথম পর্ব্ব, শঙ্করাচার্য্যের প্রাচীন বৈদিক ভিত্তি অবলম্বন পর্য্যন্ত ঐ যুগের দ্বিতীয় পর্ব্ব ও মুসলমানাধিকার হইতে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘর্ষ পর্য্যন্ত ঐ যুগের তৃতীয় পর্ব্ব। এই তৃতীয় যুগপর্ব্বে ধর্ম্মের মতবৈচিত্র্য খুবই প্রসারতা লাভ করিয়াছিল এবং সমন্বয়ের অভাবও অত্যন্ত তীব্র হইয়াছিল। তাহারই উপর ভারতে আবার খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া প্রথমেই

বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে ধর্ম্মসমন্বয়-চেষ্টার উন্মেষ হয়। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনে এই চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। কিন্তু অলোক-সামান্য মেধার সাহায্যে তিনি প্রকৃত সমন্বয়ে উপনীত না হইয়া এক অপূর্ব্ব সমীকরণে উপনীত হইলেন। সমীকরণকে ইংরাজীতে equation বলে; সমীকরণের দ্বারা নানা ধর্ম্ম মতের অবান্তর তত্ত্বসমূহ বাদ দিয়া এমন একটি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় যাহার সম্বন্ধে মত বিরোধ বা আপত্তির সম্ভাবনা থাকে না। সমন্বয়কে ইংরাজীতে synthesis বলে; সমন্বয়ের দ্বারা নানা ধর্ম্মমতের অন্তর্বর্ত্তী তত্ত্ব-সমূহকে স্বীকার করিয়া তদতিরিক্ত এমন এক তত্ত্ব-ভূমিতে উপনীত হওয়া যায়, যাহার অধিষ্ঠানে সমস্ত বৈচিত্র্যের স্বার্থকতা সম্পাদিত হয়। সমীকরণ বৈচিত্র্যের প্রতি উদাসীন, সমন্বয়ের নিকট বৈচিত্র্য উপাদেয়। সমীকরণ ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য বিচার করিয়া বিশ্লেষণের দ্বারা সাধারণ লক্ষণ আবিষ্কার করে, সমন্বয়ের কাছে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য নাই, সমন্বয় সর্ব্বাঙ্গ স্বীকার করিয়া তন্মধ্যেই এক তুরীয় তত্ত্বের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। চরম মেধাশক্তি-প্রয়োগে সমীকরণ সুসিদ্ধ হয়, চরম অধ্যাত্মসাধনার দ্বারা সমন্বয় সুসিদ্ধ হয়।

পঞ্চদশী ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্বগুণ-ব্রহ্মবাদকেই রাজা রামমোহন রায় সমীকরণের দ্বারা ধর্ম্মমতসমূহের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে তিনি এমন একটী সাধকসম্প্রদায়ের সূচনা করিয়াছেন, যাহাদের দ্বারা আশা করা যায় আমাদের প্রাচীন সনাতনধর্ম্মের অঙ্গবিশেষ সম্যক্ পুষ্টি লাভ করিবে। সাধকের প্রকৃতি ও সুবিধা ভেদে সনাতনধর্ম্মে সাকার ও নিরাকার, প্রতীকের বহুলতা ও বিরলতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতা, সকল প্রণালীই বিহিত

হইয়াছে। কিন্তু সমন্বয়ের ভিত্তি এ সমস্ত ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঐ ভিত্তি অভিব্যক্ত হইয়াছিল, বর্ত্তমানযুগে আবার ব্যক্ত হইয়াছে। সে কথা পরে আলোচনা করিব।

সর্ব্বকালেই বহুল বৈচিত্র্যের মধ্যেও ধর্ম্মসমন্বয়ের অক্ষয় সামর্থ্য আমাদের জাতীয়তার প্রধান বিশেষত্ব। ভারতীয় নেশন অনন্ত ধর্ম্মমতের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। মার্কিণ নেশন যেমন যথাসম্ভব জাতি-বৈচিত্র্যের মধ্যেও সামাজিক সমন্বয়-গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, ইংরাজ নেশন যেমন যথাসম্ভব বৃত্তি-বৈচিত্র্যের মধ্যেও অর্থাধিকারমূলক সমন্বয় বজায় রাখিতে পারে, ভারতীয় নেশনও তেমনি যথাসম্ভব মতবৈচিত্র্যের মধ্যেও ধর্ম্মসমন্বয়কে অখণ্ডিতভাবে রক্ষা করিতে পারে। এক একটা নেশন এক এক রকম সমন্বয়কে গৃহনির্ম্মাণে প্রধান খুঁটিরূপে ব্যবহার করিয়াছে।

ভারতীয় জাতীয়তার আর একটী বিশেষত্ব তাহার রাজনীতি-নিরপেক্ষতা। শাস্ত্রে দেখিতে পাই প্রাচীনকালে রাজনীতি সম্যক্‌রূপে নিরূপিত হইয়াছিল। ব্রহ্মজ্ঞ সমাজস্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন সমাজ-কক্ষে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম যখন নির্দ্দিষ্ট করিলেন, তখন সকলের স্বধর্ম্মপালনে অভিভাবক ও রক্ষকরূপে রাজার স্বধর্ম্মও নির্ণীত হইল। সর্ব্বসম্প্রদায়ের স্বধর্ম্মপালনে বিঘ্নাপসারণ ও সুবিধা বিধানই রাজার স্বধর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাজার চিরসাথী রাজ-বৈভব এই নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মপালনে নিয়োজিত হইত এবং ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্বের মাদকতা হইতে যথাসম্ভব রক্ষা পাইবার জন্য রাজা আশৈশব সুশিক্ষার্থী হইতেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ

করিতেছে যে, ক্ষাত্রশক্তি বারংবার ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্ম-সীমা অতিক্রম করিয়া সম্পদমদমত্ত ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিত, এবং যেহেতু ক্ষাত্র-শক্তির প্রাধান্য ভারতীয় নেশন-নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী, সেইজন্য দেখিতে পাই বারংবার এই উচ্ছ্রিত শক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে হইয়াছে। অজ্ঞ ঐতিহাসিক বলেন যে প্রাচীনযুগে ক্ষাত্রবলের বিনাশসাধন ব্রাহ্মণের ঈর্ষাসম্ভূত। ইঁহারা ভারতীয় নেশন-তত্ত্ব বুঝিতেই পারেন নাই। মহাভারত পড়িলে বুঝা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতসারেই ভারতের ক্ষত্রিয় শক্তির বিলোপসাধন করাইলেন ; ভাগবত স্পষ্টই বলিতেছেন যে, রাজশক্তির দমন কৃষ্ণাব-তারের একটী প্রধান লীলা। কুরুক্ষেত্রে সমাকৃষ্ট বিপুল রাজশক্তি আধুনিক জগতের নিকট কি অপূর্ব্ব ও লোভনীয়! কুরুক্ষেত্রে ঐ রাজশক্তি একেবারে ভস্মসাৎ হইল। গাণ্ডীব পর্য্যন্ত অন্তর্দ্ধান করিল। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, নেশন-সারথি শ্রীভগবানের একি অদ্ভুত লীলা! কিন্তু এ রহস্য ভেদ করা এখন আর কঠিন নহে। মহাভারত-নায়ক যদি সেই সন্ধিযুগে ক্ষাত্রশক্তিকে উন্মূলিত না করিতেন, তবে রজোমত্ত রাজশক্তির হাতে ভারতের ভাগ্য চির-কালের জন্য সমর্পিত হইত। তারপর, জগতের অন্যান্য প্রাচীন দেশের রাজসিক অভ্যুদয় যেমন কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, ভারতেও সেইরূপ হইত।

সেইজন্য আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের গভীর শিক্ষা আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভারতীয় নেশনকে স্বধর্ম্মপালনে যদি রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হইতে হয়, তবে নির্ব্বিঘ্নে নেশন-লক্ষ্য সাধিত হইবার পক্ষে কোনও নিশ্চয়তা নাই। হিন্দুকে, ভারতীয় নেশনকে,

ভারতীয় জাতীয়তার বিশেষত্ব।

যথাসম্ভব রাজনীতি-নিরপেক্ষ করিবার জন্যই ভারতের ভাগ্যবিধাতা প্রাচীনযুগে রাজশক্তিকে বারংবার খর্ব্ব করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী কালে সাধারণ ভারতবাসীর জীবনকে রাজনীতি হইতে বার বার আড়ালে সরাইয়া আনিয়াছেন। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে ইতিহাসের এই সমস্ত ইঙ্গিত ও শিক্ষা আমরা বিশদভাবে আলোচনা করিব। এখন কেবল এইটুকু মনে রাখিলেই যথেষ্ট যে, ভারতে স্বধর্ম্মপালন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার ভার রাজশক্তির হস্তে সংন্যস্ত নয় বলিয়া পাশ্চাত্যে যেমন উন্নতিপথে নেশনের প্রতিপদক্ষেপ রাজনীতি-সাপেক্ষ, ভারতে মোটেই সেরূপ নহে।

ভারতীয় নেশনের তৃতীয় বিশেষত্ব সর্ব্বক্ষেত্রে স্বধর্ম্মসূত্র প্রয়োগ। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্‌গণ যেখানে কাহার কি স্বাধিকার বা প্রাপ্য (right), তাহার বিচার দ্বারা মানুষে মানুষে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, ভারতীয় নীতিতে সে স্থলে কাহার কি স্বধর্ম্ম বা দেয় (duty), তাহাই বিচার করিয়া মানুষের সামাজিক ও গার্হস্থ্য সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার ফলে পাশ্চাত্যে সর্ব্ববিধ উন্নতির মূলে প্রথমতঃ স্বাধিকার ভাবের উৎকর্ষ বাঞ্ছনীয়। প্রাচ্যে লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য, স্বধর্ম্মসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ। পাশ্চাত্য ও ভারত শিক্ষাদ্বারা পৃথগ্বিধ ফলের প্রত্যাশা করেন। এই পার্থক্য যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তবে শিক্ষাপ্রচারের দ্বারা সুফললাভের কোনও স্থিরতা নাই, বরং পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রচারে কুফল যথেষ্ট ফলিবে। স্বধর্ম্মভাবের উপর আমাদিগের সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। স্বাধিকারভাব স্বধর্ম্মভাবের পরিপন্থী। মন স্বাধিকার-ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে স্বধর্ম্মভাব শিথিল হইয়া যায়, অন্তর্দৃষ্টি

ম্লান হয় এবং বহির্মুখতা, স্বার্থপরতা, সমাজের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধিকারভাবকে স্বধর্ম্মভাবের আসনে বসাইলে যেমন কুফল ফলে, সংস্কার-কার্য্যেও সেইরূপ। এ ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যের সহিত ভারতের প্রণালীগত ভেদ বিদ্যমান। উভয়ত্রই সংস্কারকার্য্যের প্রবৃত্তি শিক্ষার উপর নির্ভর করে; শিক্ষার যত প্রচার হয়, সকল ক্ষেত্রেই সংস্কার তত অনায়াসে, সহজেই, সম্পন্ন হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে সংস্কারের সূচনা স্বাধিকারভাবের বৃদ্ধি বা পরিপুষ্টি হইতে, অর্থাৎ যাহারা স্বাধিকার হইতে আপনাদিগকে বঞ্চিত বলিয়া বুঝে তাহারাই প্রথমে স্বাধিকার পাইবার জন্য আন্দোলন বা বিরোধের সৃষ্টি করে। ভারতে সংস্কারের সূচনা স্বধর্ম্মভাবের বৃদ্ধি হইতে, অর্থাৎ যাহারা স্বধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত তাহারাই অপরের সম্বন্ধে নিজেদের ব্যবহারে যে ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহার সংশোধন করে। পাশ্চাত্ত্যে আন্দোলনের মূলে বিরোধকে আশ্রয় করিতে হয়, ভারতে আন্দোলনের মূলে ত্রুটি-স্বীকারকে সর্ব্বসম্মত করা চাই।

সমাজদেহ-শোণিতে স্বধর্ম্মভাবই আমাদের প্রধান উপকরণ। যদি এই উপকরণের অভাব ঘটে তবে সমস্ত সংস্কার-চেষ্টাই নিষ্ফল, কারণ মূলরক্তে বিকার থাকিলে কোন রোগের প্রতিকার হওয়া অসম্ভব। এই সঙ্কট অবস্থাকে ধর্ম্মের গ্লানি বলা হইয়াছে; ধর্ম্মে যখন সর্ব্বত্রই গ্লানি দেখা দেয়, তখন কেহ-বা সমাজ বা পরিবারের সংস্কার করে, কেহ-বা সেই সংস্কারোদ্দেশ্যে প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করে, কেহ-বা পথ নির্ণয় করে; সমস্ত নেশন বা সমাজই গ্লানিসঙ্কুল

হইয়া উঠে। ধর্ম্মের এই গ্লানি উপস্থিত হইলে, গীতায় ভগবান্ বাসুদেব আশ্বাস দিতেছেন যে, স্বয়ং তিনি নেতা ও নিয়ন্তারূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহার আবির্ভাবে সমাজদেহে নব শোণিতের সঞ্চার হয়, এবং ধর্ম্মভাব পুষ্টিলাভ করে।

শাস্ত্রের এই অবতারবাদ ভারতীয় নেশন-নীতির একটী প্রধান অঙ্গ; যথাস্থলে ইহার আলোচনা করা যাইবে।

ভারতীয় নেশন স্বধর্ম্মসূত্র অবলম্বন করিয়া আর একটী ক্ষেত্রে বিশেষত্বের পরিচয় দিয়াছে। মানুষ জীবিকার জন্য বৃত্তি বা profession আশ্রয় করে। পাশ্চাত্যে competition বা প্রতিযোগিতাসূত্রে সমস্ত বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হয়। বর্ত্তমানে সকল ক্ষেত্রেই ঐ প্রতিযোগিতা কিরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। ভোগই, যে সমাজের আহরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সে সমাজে ত একটা ছুটাছুটি কাড়াকাড়ি সর্ব্বত্রই থাকিবে, তার উপর ভোগার্জ্জন, উন্মুক্তদ্বার ও স্বকৃত-চেষ্টাসাপেক্ষ হওয়ায়, প্রতিযোগিতা তুমুল সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের স্বাধিকারসূত্র মানুষের স্বাভাবিক স্থূল ভোগান্বেষণকে সমাজ-খাতে প্রবাহিত করিয়া সুস্পষ্টতর ও বলবত্তর করিয়া দিয়াছে। ভারতে ধর্ম্মই আহরণীয় ও শ্রেষ্ঠতাবিধায়ক, সেইজন্য সমাজ স্বাভাবিক ভোগান্বেষণকে অযথা প্রশ্রয় দেয় না, ধর্ম্মার্জ্জনের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করে। ভোগার্জ্জনে প্রতিযোগিতার যে তীব্রতা উপস্থিত হয়, স্বভাবতঃ ধর্ম্মার্জ্জন ব্যপদেশে সেরূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। তা ছাড়া ভারতে পেশা বা বৃত্তি অনেকটা প্রাগ্‌নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিত, [illegible] যোগিতায় মন্থনে অশান্তির গরল উত্থিত
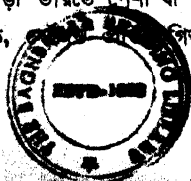
হয় নাই। বৌদ্ধযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে একটা বিশাল জাতি-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল এবং সকল বৃত্তি ও সাধনাতেই অনেকটা অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেই যুগে ভারত-বাসীর স্বাভাবিক ভোগদৃষ্টি যদি প্রবল শক্তিতে ত্যাগ ও নির্ব্বাণের দিকে আকৃষ্ট না হইত, তবে ভারতীয় নেশনের সর্ব্বাঙ্গে পাশ্চাত্য ভোগার্জ্জনের ভাব অনিবার্য্যরূপে সঞ্চারিত হইয়া যাইত। সেই নানাজাতির সংমিশ্রণ ও ভাববিপ্লবের মধ্যে প্রাচীন যুগের স্বধর্ম্ম-নির্দ্দেশ তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল এবং ভারত নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া অবাধ-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্ররূপে গণ্য হইয়াছিল। এমন সময় ভগবান্ বুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া যেন ঘোষণা করিলেন, "নির্ব্বাণই পরম লক্ষ্য, এই একমাত্র লক্ষ্যসাধনে প্রতিযোগিতা কর।" এই ঘোষণার ফলে প্রতিযোগিতার অদম্য প্রবাহ ভোগার্জ্জনের প্রতি স্বাভাবিক নিয়মে চালিত না হইয়া ভারতীয় নেশন-লক্ষ্যের প্রতিই প্রত্যাবৃত্ত হইল। প্রাচীন যুগের অবসানে পৌরাণিক কলিযুগের পূর্ব্বাহ্নে কলির প্রথম ধাক্কা ভারতীয় নেশন এইরূপে সামলাইয়া গেল, নচেৎ সেই জাতিবিপ্লবে নিশ্চয়ই ডুবিতে হইত। কিন্তু অবাধ-প্রতিযোগিতার কুফল ভারত এড়াইতে পারে নাই,—তাই দেখি, সেই যুগে সকলেই বৌদ্ধ-নির্ব্বাণের অধিকারী হইতে ছুটিয়াছে। এই কুফল যে কিরূপ সুদূরস্পর্শী তাহা "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে" আচার্য্য বিবেকানন্দ ইঙ্গিত করিয়াছেন।

ভারতীয় নেশন কর্ম্মবল রচনায় স্বধর্ম্মতত্ত্বকে মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত ও সমবায়ী অনুষ্ঠানেই ইহার একটা বিশেষত্ব রহিয়াছে। স্বাধিকারভেদপ্রয়োগে

গঠিত পাশ্চাত্য নেশনসমূহের সহিত তুলনা করিয়া পাঠক সেই বিশেষত্ব সর্ব্বক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন। উদাহরণস্বরূপ, আমরা এইখানে একটী বিশেষত্বের উল্লেখ করিতেছি।

পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা সম্প্রতি আমাদের দেশে একরকম patriotism বা স্বদেশপ্রেম সংক্রামিত হইয়াছে। সেই স্বদেশ-প্রেমের মূল উপাদান একদেশবর্ত্তিতার ভাব। পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠে দেখিতে পাই যে, একদেশবর্ত্তিতা হইতেই প্রত্যেক নেশনের উদ্ভব; যাহা কিছু লইয়া তাহাদের গৌরব বা নেশনত্ব, সাক্ষাৎ ভাবে হউক বা না হউক, তাহারা মাটি হইতেই তাহা আদায় করিয়াছে। ভোগের মূলে যে স্বস্বামিত্বের ভাব, জমির অধিকারসূত্রেই উহার অভিব্যক্তি, আবার নেশনত্বের মূলে যে সমষ্টিবদ্ধতার ভাব বিদ্যমান, উহা একই ভূখণ্ডে আবাস-স্থাপনার সূত্রে অভিব্যক্ত। এই জন্য পাশ্চাত্যে সর্ব্বাঙ্গীন নেশন-গঠনের মূলে একদেশ-বর্ত্তিতার ভাব বিদ্যমান। এই ভাবটিই পাশ্চাত্য জাতীয়তার পরম-শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং এই ভাবের প্রতি হৃদয়ের যে অর্ঘ্য বা অর্চ্চনা তাহার নামই পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেম।

কিন্তু একদেশবর্ত্তিতার ভাব ভারতীয় জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ উপাদান নহে। অবশ্য স্বীকার করি যে, নেশন-গঠনে একদেশবর্ত্তিতার ভাব অপরিহার্য্য এবং আমারাও নেশন গড়িবার পূর্ব্বে মা বসুন্ধরার শরণাপন্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু পাশ্চাত্য জাতিদের মত লক্ষ্যহীনভাবে, রিক্তহস্তে নহে। আমাদের মূল উপাদান আমরা সর্ব্বাগ্রেই আহরণ করিয়াছিলাম, মূল মাটির কাছে আমরা ভোগভিখারী হই নাই। একদেশবর্ত্তিতা আমাদের সমষ্টিবদ্ধতার সহায়ক,—বিধায়ক নহে।

বেদের প্রকাশ বা সনাতন ধর্ম্মই আমাদের জাতীয়তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাদান, একদেশবর্ত্তিতা নিমিত্তমাত্র।

স্থূল মাটি পার্থিব ভোগের চরম উৎস, পাশ্চাত্যের সকল সম্পদই স্থূল মাটির দান, সেই জন্য পাশ্চাত্য স্বদেশপ্রেমে স্থূল মাটির আসন সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত। ঠিক এই ভাবের স্বদেশপ্রেম আমাদের দেশে প্রচলিত করা সমীচীন নহে। পাশ্চাত্যে স্থূল মাটি নিজ গৌরবের জন্য আর কাহারও কাছে ঋণী নহে, আমাদের দেশে স্থূল মাটির গৌরব, ধার-করা গৌরব। আমাদের দেশে ধর্ম্মই মাটির তীর্থত্ব সম্পাদন করে। পাশ্চাত্যেরা স্বাধিকৃত মাটিতে বাস করে, আমরা ধর্ম্মাধিকৃত তীর্থে বাস করি।

সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ আমাদের দেশের মুখ্যভাব, স্বদেশরূপ তীর্থের প্রতি অনুরাগ তদন্তর্গত একটি গৌণভাব মাত্র। আমাদের যাহা কিছু ছিল, যাহা কিছু আছে বা হইবে, সবই যে সনাতন ধর্ম্মের দান,—সেজন্য সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই আমাদের Patriotism। এই অনুরাগই ভারতকে তীর্থে পরিণত করিবে। তখন স্বদেশতীর্থের হিতসাধন অর্থে কি বুঝায় তাহা প্রকৃতভাবে উপলব্ধ হইবে। এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্থূল মাটি লইয়া কাড়াকাড়ির ভাবই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষাসূত্রে আমাদের দেশে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে।

অথচ সনাতন ধর্ম্মের প্রতি যে গভীর অনুরাগ ও আনুগত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হৃদয়ে উদ্রিক্ত না হইলে ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একেবারেই অসম্ভব, সে অনুরাগ ও আনুগত্য আজ কোথায়? হে দেশের যুবকবৃন্দ! তোমরা জননীকে আজও

চিনিলে না, পাশ্চাত্য শিক্ষা-মোহে কেবল অন্ধকারেই কর-সঞ্চালন করিলে। তাই যে জড়সত্তা বারম্বার বিজেতৃখড়্গের স্পার্শাধীন, সেই সত্তাকেই পাশ্চাত্যের অনুকরণে রূপকচ্ছলে মা বলিয়া সিদ্ধান্ত, করিয়াছ, কিন্তু অনুভব কর নাই কি, হৃদয় রূপকের গণ্ডী মানিতে চাহে নাই? তোমাদের হৃদয়ের অন্তরালেই যে সনাতন-ধর্ম্মরূপিণী মা অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। তোমাদের ব্যাকুল পূজা তাঁহারই প্রাপ্য; তাঁহার জন্যই তোমাদের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যা বুদ্ধি, যাহা কিছু সমস্তই তাঁহারই চরণে ডালি দিতে হইবে। তোমাদের বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যে, ভারতীয় জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্মের সাধনপ্রবাহে যিনি বিশ্বমানবের জন্য মোক্ষদায়িনীরূপে আবির্ভূতা, তিনিই তোমাদের জননী, তাঁহার প্রতি প্রাণপণ অনুরাগ, তাঁহার প্রতি আজীবন-মরণান্ত শ্রান্তিহীন আনুগত্যই তোমাদের পক্ষে একমাত্র patriotism। পাশ্চাত্যেরা যেমন শৈশব হইতে স্থূল মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে শিখে, তোমরা তেমন আশৈশব এই সনাতন ধর্ম্মকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে শিক্ষা কর,—দেখিবে ভারতীয় নেশন আবার জাগিয়া উঠিয়া মর্য্যাদায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।

এইবার ভারতীয় নেশনে সনাতন ধর্ম্মের আত্মপ্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ।

(উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩১৮)

"আমাদের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের পক্ষে পরম পদ ও মুক্তি লাভ করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা বেদে রহিয়াছে। কেহ নূতন আর কিছু উদ্ভাবন করিতে পারে না। সকল তত্ত্বের সীমায় যে অখণ্ডৈকত্ব বিদ্যমান, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; বেদ এই শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়া অসম্ভব। যখন 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, অধ্যাত্মতত্ত্ব তখন সম্পূর্ণতা লাভ করিল; এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল বাকি রহিল, মানুষকে যুগে যুগে দেশকালভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার তারতম্যে, বেদব্যক্ত লক্ষ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রিত করা, সেই সনাতন পথে পরিচালিত করা; এবং এই উদ্দেশ্যেই মহান্ নেতৃদিগের, মহিমান্বিত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে এই সত্যটী যেমন পরিষ্কারভাবে প্রকটিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই:—

'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

এই অবতারবাদরূপ ধারণা ভারতের অস্থিমজ্জাগত।"*

গতবারের প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় নেশনের কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী বিশেষত্বের পরিচয় পাইয়াছি। অবশ্যম্ভাবী কেন, না ভারতে যেরূপ লক্ষ্যকে আশ্রয় করিয়া নেশন-স্বরূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে,

* 'The Sages of India' (ভারতীয় মহাপুরুষগণ) শীর্ষক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

তাহাতে ঐ সব বিশেষত্ব স্ফুরিত হইবেই হইবে। বেদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সাধনা যে নেশনের লক্ষ্যস্থানীয়, অমুল্লঙ্ঘনীয় নিয়মে ব্রহ্মবিদ্-ই সে নেশনের নিয়ন্তৃপদ পাইবেন এবং সর্ব্ববিধ ব্যবহারে গৌণ ও মুখ্য হিসাবে স্বধর্ম্মপালন ও ব্রহ্মপ্রতিপাদনই উদ্দেশ্যসূত্ররূপে অবলম্বিত হইবে।

এখন প্রথম কথা এই যে, ভারতে নেশন-লক্ষ্য যে বেদ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই বেদ কি, বা কিংস্বরূপ? বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে পৌরাণিক ব্যাখ্যাবাহুল্য এখানে বিবৃত করা অসম্ভব;—সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমক্ষে বেদ কিরূপে প্রকাশিত হইল, এবং সেই বেদই কিরূপে স্ফুটিত হইয়া সৃষ্টিরূপে পরিণত হইল,—ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা এখানে প্রাসঙ্গিক হইবে না। এইজন্য সংক্ষেপে অথচ সারসঙ্কলনে বেদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

"সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি"

ব্রহ্মই সেই পরমপদ, প্রণব তাঁহার প্রতীক। ব্রহ্মনিরূপণ ব্রহ্মেই সম্ভব,—"ব্রহ্মবস্তু কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।" অতএব বেদ বলিতে স্বরূপতঃ ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান, বা পরম জ্ঞানই, বেদ শব্দের মুখ্য অর্থ। এই অর্থে বেদ অপৌরুষেয়, দেশ ও কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। বস্তুতঃই ব্রহ্মনিরূপণ ও ব্রহ্ম একার্থসংজ্ঞক, ব্রহ্মই বেদরূপ পরম জ্ঞান।

বেদের শব্দশরীর আবার বেদ শব্দের গৌণ অর্থ। শরীরীকে অর্থাৎ তাহার বাক্‌শক্তি ও মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বকে আশ্রয় করিয়া যখন অপৌরুষেয় অশরীরী বেদ আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তখন উহা

গৌণার্থসূচিত শব্দরাশিতে ব্যক্ত হইলেন। ব্রহ্ম স্বয়ংই মুখ্য বেদ, সেইজন্য বেদের শব্দশরীর বা গৌণ বেদকেও তাহারই সার ও প্রতীকরূপে উদ্‌গীথ, বা প্রণবকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়।

এই শব্দব্রহ্ম-বেদও এক অর্থে অপৌরুষেয়, কারণ পুরুষের বাক্‌শক্তি ও মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বকে অবলম্বন করিয়া পরমবেদ আপনার শব্দ-শরীর আপনি রচনা করিয়াছেন। লোকে সচরাচর যে বাক্য রচনা করে, তাহাতে তাহার বুদ্ধির প্রেরণাই আমরা স্বীকার করি, এবং অহংবুদ্ধি সকল বুদ্ধিরই আশ্রয় বলিয়া সেই রচনার রচয়িতাও আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টাকে বুদ্ধির অতীতে যাইতে হয়; যে প্রেরণায় তাঁহার বাক্‌শক্তি কাজ করে, তাহা তাঁহার স্থূল ও সূক্ষ্ম সত্তার অতীত,—তাহার মধ্যে অহংবুদ্ধির স্থান নাই, ততদূর অহংবুদ্ধির দৌড়ই নাই। পরমহংসদেব যেমন বলিতেন, সেখানে "মা-ই রাশ ঠেলে দেন"।

এই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব ঋষিত্বের প্রধান অঙ্গ; অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, যিনি এই মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিয়াছেন, তিনিই ঋষি। এই অর্থে ঋষি শব্দটী ব্যবহার করিলে, দেশ ও কালের একটা গণ্ডী দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু আমাদের ইতিহাসে এক সময় ঋষি শব্দটীকে একটা বিশেষ অর্থে আবদ্ধ করা হইয়াছিল। সত্যযুগ হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত বেদের শব্দশরীর বর্ত্তমানাকারে সুনির্দ্দিষ্ট ছিল না। এই দীর্ঘকালের মধ্যে নব নব মন্ত্রদ্রষ্টার মন্ত্র সেই শরীরে অঙ্গীভূত হইয়াছে, আবার অনেক মন্ত্র একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই প্রাচীন যুগে মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বের একটা সর্ব্ববাদিসম্মত পরিচয় ছিল;

এবং মন্ত্র আবিষ্কৃত হইলে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি শিষ্যপরম্পরায় সেই মন্ত্র-বিদ্যার শিক্ষা দিতেন। এইভাবে প্রধানতঃ ভিন্ন ভিন্ন ঋষিসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বেদ প্রাচীন যুগে প্রচলিত ছিল। তারপর কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদসঙ্কলন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত বেদের সংগ্রহ করিয়া, উহাকে সংহিতা-ব্রাহ্মণ-সমন্বিত চারটী ভাগে, অর্থাৎ ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব ভাগে, বিভক্ত করিলেন এবং চারটী শিষ্যের উপর চতুর্ব্বেদ সংরক্ষণ ও প্রচলনের ভার অর্পণ করিলেন। প্রাচীন যুগে যজ্ঞাদিতে পুরাণ-কথকতার নিয়ম ছিল। তখন নানা পুরাণ-কথাও নানাস্থানে নানাসম্প্রদায়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল। উহাদের সঙ্কলনে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাস নূতনভাবে প্রচার করেন, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণেতিহাস মহর্ষি ব্যাসের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি গ্রহণ করেন ও শিষ্যপরম্পরায় প্রচলিত রাখেন।

এই শাস্ত্রসঙ্কলনরূপ সুমহৎ অনুষ্ঠানের প্রভাব যে কি গভীর ও সুদূরস্পর্শী তাহা অনেকে ভাবিয়া দেখেন নাই। কলিযুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণনামা দুইটী নেতৃপুরুষের আবির্ভাব সকলেই স্বীকার করেন; একজন ঋষিকুলসম্ভূত, একজন রাজকুলসম্ভূত; একজন ঋষিসমাজের অতীতার্জ্জিত সর্ব্বসম্পদের অধিকারী, আর একজন সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন আর্য্যসমাজের অতীতার্জ্জিত সর্ব্বসম্পদের অধিকারী। যিনি তত্ত্বদৃষ্টিসম্পন্ন, তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, একই কালাধিষ্ঠিত অখণ্ড পরমপুরুষ একই নামপরিচয়ে অথচ দেহদ্বয়াশ্রয়ে অবতীর্ণ হইয়া, কলির প্রারম্ভে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে অভিব্যক্ত সমস্ত তত্ত্ব ও

সাধনাকে পরবর্ত্তী যুগসমূহের অনুষ্ঠানোপযোগী আকারে একত্র-সন্নিবিষ্ট করিলেন। যিনি আসন্ন কলির উচ্ছৃঙ্খলা হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের লক্ষ্যনিরূপক বেদকে প্রথম করপুটে সংগ্রহ করিলেন, যিনি রজোবলের সর্ব্বগ্রাসী কুক্ষি হইতে ভারতনিয়ন্তৃত্বকে উদ্ধার করিবার জন্য দ্বিতীয় করপুটে ক্ষাত্রবলবিধ্বংসী গাণ্ডীব ধারণ করিলেন, যিনি বেদবিদ্যাকে ভবিষ্যতে আশূদ্রাভিসর্পিণী করিবার জন্য তৃতীয় করপুটে গীতা প্রকাশ করিলেন, এবং মানব-হৃদয়ের শান্তসখ্যাদি রসধারা মন্থন করিয়া পরমপ্রেমরূপ ব্রহ্মামৃত আচণ্ডালে বিতরণ করিবার জন্য যিনি চতুর্থ করাঙ্গুলিতে বেণু ধারণ করিলেন, হে সনাতনধর্ম্মাশ্রিত ভারতবাসি! তিনিই ভগবান্ নারায়ণ, তিনিই তোমার জন্য বারম্বার দেহধারণে কৃতসংকল্প ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; অতএব তুমি আশ্বস্ত হও, পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি ধাবিত হইয়া তাঁহাকে ভুলিওনা, কারণ তিনি স্বয়ং তোমার পথপ্রদর্শক।

ভারতীয়-নেশন জগদ্রঙ্গমঞ্চে সুদীর্ঘ প্রথম অঙ্ক অভিনয় করিলে যখন কুরুক্ষেত্রে যবনিকাপতন হইল, তখন দেখিতে পাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও ব্যাসদেব সংযোগসেতুরূপে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রস্তাবনা করিয়া গেলেন। ভারতের পক্ষে সেই প্রাচীন যুগ বা প্রথম অঙ্কটী যেন লক্ষ্যস্থাপনার যুগরূপে অবধারিত। সেইজন্য যথা-যোগ্য লক্ষ্যস্থাপনা হইয়াছে বুঝিয়াই মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বিভাগ ও মন্ত্রাদি চরমভাবে নিরূপণ করিয়া বেদকে যেন গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া গেলেন; পরে সহস্র বিশৃঙ্খলার মধ্যেও সেই গ্রন্থি কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। এইরূপে বেদ ও মন্ত্রপ্রকাশের একটা সীমা-

নির্দ্দেশ হওয়ায়, মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব ছাড়া আর একটা লক্ষণ ঋষিত্বে আরোপিত হইয়া গিয়াছে, এবং বৈদিক ঋষি ও পরবর্ত্তী যুগের ঋষির মধ্যে একটা গৌণ পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। এই পার্থক্যের ফলে পরবর্ত্তী ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টৃত্ব লাভ করিলেও, তৎপ্রাপ্ত মন্ত্র বেদের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এমন কি, ব্যাসপ্রশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বারা প্রাপ্ত শুক্লযজুর্ব্বেদকে বেদে স্থান দিবার জন্য অতিপ্রাকৃতিক হেতুর আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

প্রাচীন যুগে বেদনিরূপণ-দ্বারা লক্ষ্যস্থাপনা হইবার পর, ভারতের সমস্ত শক্তি ঐ নেশন-লক্ষ্যকে রক্ষা করিবার জন্য বেদগুপ্তিরূপ মহদনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইল। মধ্যযুগের প্রথম পর্ব্ব বা ভাগে সেইজন্য আমরা দেখিতে পাই যে, একদিকে যেমন ক্ষাত্রশক্তি বিলুপ্ত হওয়ায় আর্য্যেতর জাতি অবিরল-স্রোতে ভারতখণ্ডে প্রবেশলাভ করিতেছে, অপরদিকে তেমনি ব্রাহ্মণগণ বেদকে যেন বুকে আঁকড়াইয়া রক্ষা করিতেছেন। বেদগুপ্তির সৌকর্য্যার্থে যাস্কের নিরুক্ত প্রভৃতি বেদাঙ্গ এই সময় সঙ্কলিত হইল এবং ব্রাহ্মণগণও বেদ-সংহিতার এক একটী শাখাকে বংশপরম্পরায় রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই তুমুল জাতিবিপ্লবের মধ্যে বেদনিহিত নেশন-লক্ষ্য ও তৎসাধনতত্ত্ব কি অপূর্ব্ব কৌশলে রক্ষা পাইল, ইহা ভাবিলে হৃদয় বিস্ময়ে পরিপ্লুত হয়। বেদমন্ত্রকে অবিকার্য্য রাখিবার জন্য যে সাবধানতা, যে চেষ্টা লক্ষিত হয়, তাহা জগতে এক অতুলনীয় ব্যাপার। স্মৃতি-পুরাণাদির রক্ষাকল্পে এতটা চেষ্টা প্রযুক্ত হয় নাই। সেই জন্য উঁহাদিগকে আমরা অবিকৃত অবস্থায় পাই না। বিভিন্নবংশীয় ব্রাহ্মণগণ নানা পুরাণকথা পুরুষানুক্রমে বলিয়া আসিয়া-

ছেন, তাই উহা রক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু স্বাভাবিকরূপে সমসাময়িক ঘটনা বা ভাব ঐ কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইত এবং ইতিহাস বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন স্থলে কথিত হইত। এইরূপ বৈষম্য ও প্রক্ষেপের নিদর্শন পুরাণে সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

পরে বৌদ্ধাধিকার হইতে কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবের মধ্যবর্ত্তী কালে বৈদিক শাস্ত্র রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রাহ্মণের বংশলোপ না করিলে শাস্ত্রলোপ করা যায় না দেখিয়া অধঃপতনোন্মুখ বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং বেদ বিলুপ্ত হইলে ভারতীয় নেশনও নির্ম্মূল হয় দেখিয়া, আত-তায়ীর বিরুদ্ধে সনাতনধর্ম্ম ক্ষাত্রশক্তিকে উদ্বোধিত ও নিয়োজিত করিয়াছিল। কুমারিল ভট্টের তুষানল ভারতের জাতীয় জীবনের পক্ষে একটা চিরস্মরণীয় ঘটনা। আবার সেই সময় শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া বেদের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন এবং বৈদিক সকল শাস্ত্রেরই পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার করিয়া গেলেন। এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হইতে আমরা কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারি যে, ভারতীয় নেশন কি গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে বেদকে রক্ষা করিয়াছেন, যেহেতু একমাত্র বেদই আমাদের জাতীয় জীবনের লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠা, উৎপত্তি ও গঠনপ্রণালীর চিরন্তন সাক্ষী।

কিন্তু কেবলমাত্র বেদশাস্ত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেই ভারতের জাতীয় জীবন রক্ষা পাইবে না। প্রাচীন যুগের পরে যখন শাস্ত্ররক্ষায় ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত রহিয়াছেন এবং সমস্ত দেশব্যাপী জাতিসংমিশ্রণের ফলে একটা নূতন ভারত মাথা তুলিতেছে, (যে ভারতের আভাস মগধের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই), তখন

ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ।

স্বাভাবিক ভোগ-পরতন্ত্রতা হইতে সেই নূতন ভারতকে ফিরাইবার পক্ষে শাস্ত্র সামর্থ্যহীন, কারণ বেদকে সে ভারত মানিতে প্রস্তুত ছিল না। তারও পূর্ব্বে দেশে নূতন জমি গড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই বেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রবল ভাবে দেখা দিয়াছিল, প্রাচীন সমাজবন্ধনও শিথিল হইয়াছিল। যদি বুদ্ধের আবির্ভাব না ঘটিত, তবে ভোগোৎকর্ষই সেই নূতন সমাজের লক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে বেদগুপ্তির জন্য সমস্ত চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যাইত, কারণ, ভোগৈকনিষ্ঠ ভারতের জমিতে বেদ বেশী দিন টিকিতে পারে না, সেরূপ জমিতে বেদসংরক্ষক জন্মায় না।

সুতরাং ভারতীয় নেশনরূপ প্রবাহকে বাচাইয়া রাখিতে হইলে কেবল উহার উদ্ভবস্থানের সন্ধান জানা থাকিলেই চলিবে না, ঐ উদ্ভবস্থান হইতে প্রবাহের প্রাণকে পরিপুষ্ট ও খাতটাকে সুনির্দ্দিষ্ট রাখিবার জন্য নব নব জলোচ্ছ্বাস নামিয়া আসা দরকার। সেইজন্য প্রাগুদ্ধৃত বক্তৃতাংশে আচার্য্য বিবেকানন্দ বলিতেছেন যে, শুধু বেদসম্পৎ আমাদের অধিকারভূত থাকিলেই চলিবে না, যুগে যুগে অবস্থানুসারে ব্যবস্থা দিবার জন্য ভারতনিয়ন্তা লোকোত্তর মহাপুরুষদের আবির্ভাব হওয়া আবশ্যক। ভারতীয় অবতারবাদে এইরূপ আবির্ভাবই প্রতিপাদ্য তত্ত্ব।

এখন প্রশ্ন এই যে, অবতারের আবির্ভাবে বিধিবত্তা আছে, না উহা অতিপ্রাকৃতিক? অতিপ্রাকৃতিক বা supernatural অর্থে যাহা বোধগম্য নহে, তাহাকেই বুঝায়; কারণ যাহা বুঝা যায়, তাহারই বিধিবত্তা রহিয়াছে, অর্থাৎ তাহা কেমন করিয়া হয় তাহাও বুঝা যায়। যদি বল, অতিপ্রাকৃতিক মানে প্রাকৃতিক

বিধির অতীত, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতি শব্দকে তুমি একটা স্বকল্পিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেছ। প্রকৃতি ও বিধি—এই দুইটী শব্দকে যথাসম্ভব ব্যাপকতা দেওয়া উচিত, কারণ বুদ্ধি অপেক্ষা অনুভূতি বা চিৎশক্তির দৌড় অনেক বেশী, সেইজন্য যেখানে বুদ্ধি পৌছায় না সেখানেও প্রকৃতির কার্য্য হয় এবং তাহা আমাদের বোধগম্য হয়। তত্ত্ববিদ্যা বা দর্শনের কাছে অতিপ্রাকৃতিক কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে আমরা অবতারতত্ত্বের দার্শনিক বিচার করিব না। আধুনিক বিজ্ঞানকে অতিক্রম না করিয়া যতদূর বুঝা যায়, আমরা ততদূরই যাইতে রাজি আছি। আজকাল সভ্যজগতে প্রাণি-বিজ্ঞানের তুলনায় সমাজ-বিজ্ঞান বুঝিবার চেষ্টা চলিতেছে, কতকাংশে এ চেষ্টা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে করি। জীবের organism, বা অঙ্গসংহতি বা শরীর হইতে, সমাজ-শরীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য তুলনায় প্রতিপন্ন করা হইতেছে। প্রাণিবিজ্ঞানের অভিব্যক্তিবাদ হইতে সমাজবিজ্ঞানেও একটা অভিব্যক্তিবাদ দাঁড় করান হইয়াছে এবং জীবদেহের অভিব্যক্তির নিয়মগুলি সামাজিক অভিব্যক্তিতেও অনেকস্থলে খাটিয়া যাইতেছে।

প্রাণিজগতে দেখা যায় যে অনেক কাল ধরিয়া চেষ্টা করার ফলে কোন জাতীয় জীবের স্বভাবে যখন একবার একটা উন্নত লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন সেই জাতির মধ্যে ক্রমশঃ উহা সংক্রামিত হইয়া যায় এবং কোনও জীবদেহে একবার একটা অঙ্গ অভিব্যক্ত হইলে, যতকাল উহার প্রয়োজন থাকে ততকাল আর উহা বিলোপ পায় না। প্রকৃতির যে নিয়মে

ভারতীয় দর্শনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ।

প্রাণিদেহের অভিব্যক্তিতে বহুচেষ্টাসিদ্ধ সুফলবিশেষের এইরূপ কালানুবর্ত্তন ঘটে, ঠিক সেই নিয়মেই সমাজশরীরে ঐরূপ সুফলবিশেষের স্থায়িত্ব বা অনুবর্ত্তন ঘটা স্বাভাবিক। সমাজ একবার যে সিদ্ধিলাভ করে, তাহা সমাজদেহেই নিহিত থাকে, নষ্ট হয় না। সর্প আততায়ীকে আঘাত করিবার জন্য যে বিষ পাইয়াছে, তাহা সব অবস্থাতেই ক্ষরিত হয় না; সেইরূপ সমাজলব্ধ সিদ্ধিরও হয়ত সব অবস্থায় প্রয়োগ হয় না; প্রয়োজন উপস্থিত হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত শক্তির বহিঃপ্রয়োগ হয়।

প্রাচীনতম যুগ হইতে ভারতে যে ব্রহ্মসাধনা চলিয়াছে, ইহার ফলে এইরূপ প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক যে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি"রূপ বাক্য ষোল-আনা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে। ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ, ঐ ব্রহ্মসাধনারই পরিপক্ক ফলস্বরূপ; সমাজ হাজার হাজার বৎসর ঐকান্তিকভাবে যে ব্রহ্মভাবের সাধন করিল, তাহাই যখন সমাজ কর্ত্তৃক স্বায়ত্তীকৃত, তখন বহিঃপ্রয়োজনকে উপলক্ষ্য পাইয়া সেই ব্রহ্মভাবই শ্রীরামচন্দ্রে বা শ্রীকৃষ্ণে মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইল। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কিছুই নাই। সমাজদেহে 'ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতীতি' সত্যের বিকাশশক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে, এবং যখনই কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন উপস্থিত, তখনই সমাজদেহ হইতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হওয়ায় ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের আবির্ভাব হইতেছে।

ঐশ্বর্য্যের মোহই প্রধানতঃ অবতারবাদকে দুর্ব্বোধ্য করিয়া রাখিয়াছে,—অবতারত্বে সন্দেহের প্রধান কারণ ঐশ্বর্য্যের ধন্ধ। মানুষের স্বাভাবিক দৈন্যবোধেই এই ধন্ধের উৎপত্তি। যে দীন,

সে ঐশ্বর্য্যকে একটা অসম্ভব রকমের উচ্চ, অগম্য, আলাদা থাকে সরাইয়া রাখে। কিন্তু ভক্তি অহেতুকী হইলে এই দুরধিগম্যতাকে রদ করিয়া দেয়, ঐশ্বর্য্যবোধজনিত দূরত্ব তখন অলীক হইয়া যায়। বাহিরের বিভূতির মূলে তখন উহারই উৎসরূপে অপরিমেয় প্রেম-সম্পদ ও আনন্দসম্পদই সাধকের দৃষ্টিগোচর হয়। ঈশ্বর কিরূপে স্থূলদেহ অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মভূত ব্রহ্মবিদের দেহিত্বে লেশমাত্র অবিদ্যাদোষ নাই। উহাতে কেবল প্রেমানন্দময় পরমশুদ্ধ ব্যক্তিত্বমাত্র বাকি থাকে, সেটুকুও তোমার আমার জন্য, সাধনব্যপদেশে নহে।

আমাদের সনাতনধর্ম্ম এইরূপে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ নেতৃপুরুষের মধ্যে বারম্বার আপনাকে প্রকাশ করিয়া আপনার ঘর গুছাইয়া লইয়াছেন। আমাদের সমগ্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সনাতন ধর্ম্মের এই জীবন্ত ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রকৃত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাই যে, যুগে যুগে এই ঘর-গুছান কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাই ঘোর দুর্দ্দিনের সূচনায় আপন সন্তানদিগকে সনাতন ধর্ম্ম করুণ স্নেহাবেশে অথচ অটল দৃঢ়তার সহিত আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, "ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

বর্ত্তমান যুগে সনাতন ধর্ম্মের এই প্রতিজ্ঞা যদি পূরণ না হইত, তবে বুঝিতাম সনাতন ধর্ম্ম মরিয়াছেন, আমরা মা-হারা হইয়াছি, এখন যেমন করিয়া পারি একজন ধাত্রীর সন্ধান করিয়া আপনা-দিগকে বাঁচাইতে হইবে; অনেকে দেখি ব্যগ্রতাতিশয্যে তাহাই করিতে গিয়াছেন। অনেকে শাস্ত্র পুঁথি ঘাটিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া

আওড়াইয়া মাতৃ-কায়ার অভাবে তাঁর ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সত্যই কি সনাতনধর্ম্মের আজ কোনও সাড়া নাই ? অনেকে বলিবেন, সাধুমহাত্মাদের মধ্যে আজও যেটুকু সাড়া পাওয়া যাইতেছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমরা অগ্রসর হইব। কিন্তু সে কি কথা হইল ? আমাদের মা,—সনাতনধর্ম্মস্বরূপিণী মা আমাদের যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে" ! আংশিক সাড়াশব্দ নয়, পূর্ণ আত্মপ্রকটন ! বেদবেদান্ত পুরাণতন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্র যে জননীর অঙ্গে অঙ্গীভূত সেই সনাতন ধর্ম্ম আপনি আসিয়া বলিবেন, "আমি আসিয়াছি, আমিই সেই রাম, আমিই সেই কৃষ্ণ, আমিই আবার আসিয়াছি !" হে ভারতবাসি ! এরূপ আত্মপরিচয় কি আজও শোন নাই ?—ঐ শোন শ্রীবিবেকানন্দ কি ঘোষণা করিতেছেন :—

"* সততবিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধাবিভক্ত, সর্ব্বথা বিপরীত আচার-সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকাল-যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-খণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে, এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

* * *

"এই নবযুগধর্ম্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান ; এবং এই নবযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ পূর্ব্বগ

ভারতের সাধনা।

শ্রীযুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর!

"হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গত রাত্রি পুনর্ব্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্ব্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্ত্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্তাবস্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্ম্মিত বিশাল ও সন্নিকটপথে আহ্বান করিতেছি;—বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও!"

ভারতের সনাতনধর্ম্ম অন্তর্হিত হন নাই, কারণ, আজও তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন,—সহস্র সন্দেহ, ঘোর অবিশ্বাসের মধ্যেও আপনাকে ধরা দিয়াছেন; ভারতের ঋষিগঠিত সনাতন সমাজ মরে নাই, কারণ আজও দেহিত্বে-ব্রহ্মত্বের সংযোজনরূপ পূর্ব্বার্জ্জিত মহাশক্তি সেই সমাজশরীরে অক্ষুণ্ণভাবে কাজ করিয়াছে; ভারতের প্রাচীন নেশন মরে নাই, কারণ আজও তাহার লক্ষ্যনিরূপক বেদ বিদ্যমান ও সেই বেদকে স্বীয় জীবনের অস্থিমজ্জায় পরিণত করিয়া আজও ভারতীয় নেশনের নিয়ন্তৃপদ অধিকার করিতে ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ এখন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে;—আগামী সংখ্যায় সেই কথাই আমাদের আলোচ্য।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

(উদ্বোধন—বৈশাখ, ১৩১৯)

"গড়িবার বিষয়ে প্রস্তাব করিবার জন্য আমি আজ এখানে দণ্ডায়মান, ভাঙ্গিবার বিষয়ে নহে। সমালোচনার দিন গিয়াছে, এখন আমরা পুনর্গঠনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। সংসারে সময় সময় সমালোচনা, তীব্র সমালোচনার—প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু সে কেবল সাময়িক প্রয়োজন; উন্নতি ও গড়িবার কাজই নিত্যকালের কাজ, প্রতিবাদ ও ভাঙ্গিবার কাজ নহে। প্রায় বিগত একশত বৎসর ধরিয়া সমালোচনার প্লাবনে আমাদের দেশ যেন ভাসিয়া গিয়াছে এবং তমসাচ্ছন্ন স্থানগুলির উপরে—যেখানে যাহা দৃষ্টির আড়ালে, সংকীর্ণ কোণে রন্ধ্র মধ্যে পতিত ছিল, তাহাদের উপরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রখর রশ্মি-রেখার সম্পাতে অন্য স্থান অপেক্ষা ঐ সকল স্থানই চক্ষুসমক্ষে তীব্রভাবে প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার স্বাভাবিক ফলে দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র এমন মনীষিগণ আবির্ভূত হইলেন, যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, দেশবাৎসল্য, ধর্ম্মোৎসাহ ও ঈশ্বরপ্রীতি প্রবল এবং যাঁহারা ভালবাসেন বলিয়াই প্রাণে এমন আঘাত পাইলেন যে যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধেই ঘোর প্রতিবাদ উত্থাপন করিলেন। অতীতের এই সমস্ত মহাত্মাদের জয় হউক, তাহারা অনেক মঙ্গলসাধন করিয়াছেন; কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ঘোষণা-বাণী আসিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন, "যথেষ্ট হইয়াছে"—প্রতিবাদ যথেষ্ট হইয়াছে দোষোদ্ঘাটন যথেষ্ট হইয়াছে, এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পুনর্গঠনের সময় আসিয়াছে। সময় আসিয়াছে, যখন আমাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিসমূহ একত্রিত করিতে হইবে, একটী মাত্র কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, এবং তারপর কেন্দ্রীভূত শক্তিতে নেশনকে সম্মুখের পথে পরিচালিত করিতে হইবে,—কেন না বহুশতাব্দী হইল উহার গতি একেবারে থামিয়া গিয়াছে। গৃহ মার্জ্জনা ও

পরিষ্কার করা হইয়াছে, এস—আবার আমরা গৃহে বসবাস করি। পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে,—আর্য্যসন্তানগণ! এস—অগ্রসর হও।"*

উদ্ধৃত বক্তৃতাংশে স্বামীজী নির্দ্দেশ করিতেছেন—সম্প্রতি আমাদের কাজের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত। নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা,—পুনর্গঠনই এখন সমস্ত কাজে আমাদের লক্ষ্য হওয়া দরকার, নতুবা বৃথা শক্তিক্ষয় হইবে, বৃথা কালক্ষেপ ঘটিবে। লাহোরে প্রদত্ত এই দ্বিতীয় বক্তৃতায় স্বামীজী সেই পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন, কিন্তু উদ্ধৃতাংশে তিনি এককেন্দ্রে শক্তিসন্নিবেশের কথা বলিতেছেন। এখানে কিরূপ কেন্দ্রীকরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরে প্রকাশ আছে, যথাঃ—National union in India, must be a gathering up of the scattered spiritual forces in India. A nation in India must be a union of those whose hearts beat with the same spiritual tune.—"ভারতবর্ষে নেশনরূপ সমষ্টিবদ্ধতার অর্থে বুঝিতে হইবে বিক্ষিপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের একত্র সমাবেশ। ইহা সুনিশ্চিত যে ভারতের পক্ষে নেশন বলিতে এমন বহু মানুষের সমবায় বুঝাইবে যাহাদের হৃদয়তন্ত্রী একই পারমার্থিক সুরে একযোগে ঝঙ্কৃত হয়।"

বক্তৃতার শেষভাগে স্বামীজী দেখাইতেছেন যে, শত শত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেও ভারতে কিরূপে ধর্ম্মসাধনার একটা

* "হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ ভিত্তি" নামক লাহোরে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

বিশাল সমন্বয় সম্ভাবিত হয়। সমন্বয় যে হইতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। তিনি একাধারে অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতের প্রমাণস্থল,—তিনি একাধারে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য, মুসলমান ও খ্রীষ্টান। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভারতীয় বক্তৃতামালায় বারম্বার এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা ঘোষণা করিতেছেন। বেদ এই মহাসমন্বয়ের ব্যাখ্যা ঘোষণা করিতেছেন; বেদ এই মহাসমন্বয়ের পুঁথিগত ভিত্তি এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব উহারই সাধনাগত ভিত্তি। ধর্ম্মসমন্বয়ের উপর ভারতে যে নেশন গড়িতে পারা যায়, তাহা প্রত্যক্ষ আমরা দেখিয়াছি, কারণ ভারতীয় ধর্ম্মসমন্বয় ব্যষ্টিতে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে আমাদিগকে ধরা দিয়াছেন।

গত মাঘমাসে প্রথম প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য পরমার্থের সাধন ও প্রচার। যিনি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হউন না কেন, প্রথমেই তাঁহাকে এই সাধারণ লক্ষ্যটী স্বীকার করিতে হইবে,—পরমার্থ বলিতে তিনি যাহাই বুঝন, কিছু আসে যায় না, অদ্বৈতভাবেই বুঝুন, বিশিষ্টাদ্বৈত ভাবেই বুঝুন, অথবা দ্বৈতভাবেই বুঝুন, পরমার্থের সাধন ও প্রচারই যে ভারতীয় নেশনে সার্ব্বজনীন লক্ষ্য এইটুকু প্রথমতঃ অবশ্য স্বীকার্য্য। দ্বিতীয়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ লক্ষ্যসাধনার জন্য সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে আমাদিগকে একযোগ হইতে হইবে; কারণ একযোগ হওয়াই নেশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

এই দুইটী ভাব যাহার বা যে সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যমান, নেশনের অঙ্গীভূত হইবার পক্ষে তাহার কোন বিঘ্ন নাই। কিন্তু

কি কি বিঘ্নের দ্বারা এই দুইটী ভাব সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রতিহত হইয়া রহিয়াছে? প্রত্যেক ভাবের বিরুদ্ধে এক একটী বিষম বিঘ্ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। সমাগত নব্যদের মধ্যে বিশেষ একটা ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব যেন ঘৃণার সহিত বলিতেন, "আধুনিক"। কোন্ ভাবটীর উপর তিনি এই আধুনিকতারূপ দোষের আরোপ করিতেন? কোন্ ভাবটী তাঁহার সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সনাতন বলিয়া ঠেকিত না? দৃষ্টান্তগুলি বিচার করিয়া দেখ, বেশ বুঝিবে যে, নব্যদিগের যে সমস্ত ভাবের মধ্যে সনাতন পারমার্থিক ভিত্তি তাঁহার অলৌকিক দৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইত, সেগুলিকে "আধুনিক" বলিয়া তিনি হেয় জ্ঞান করিতেন। সংবাদপত্রের প্রসঙ্গে পারমার্থিক ভিত্তি নাই, সেই জন্য সংবাদপত্র তিনি ছুঁইতেন না; হাঁসপাতাল প্রভৃতি গড়িয়া দিয়া জগতের উপকার করিবার ভাবে যখন সূক্ষ্ম পরোপকারের অভিমান তিনি দেখিতেন, তখন ধিক্কার দিতেন, কারণ পরোপকার করিবার অভিমানে আধুনিকভাবে কাজ করার মধ্যে পারমার্থিক ভিত্তি নাই। আবার দেখিতেছি, অর্থ ও সামর্থ্য সদনুষ্ঠানে নিবেদন করিয়া দিবার ভাবে তাঁহার অসম্মতি নাই।* অতএব বুঝা যায় যে, যাহা পরমার্থসাধনরূপ সনাতনভাবের অঙ্গীভূত নহে, তাহাকেই পরমহংসদেব "আধুনিক" বলিয়া বাদ দিতেন। এই আধুনিকতাই আমাদের দেশের সনাতন সার্ব্বজনীন লক্ষ্যকে আবৃত করিয়াছে, সেইজন্য এতকাল আমরা পাশ্চাত্য রাজনৈতিক

* শুনিয়াছি বরিশালবাসী ব্রজমোহনবাবুকে কলেজ স্থাপনায় পরমহংসদেব সম্মতি জানাইয়াছিলেন, অথচ কর্ম্মবীর কৃষ্ণদাস পালের কথাও সকলেই জানেন।

লক্ষ্য প্রভৃতির অনুকরণে নেশন গড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলাম।

অতএব ভারতীয় নেশনের লক্ষ্য স্বীকার করিবার পক্ষে বিঘ্ন এই 'আধুনিকতা'। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত এই আধুনিকতা দোষ ভারতের সকল সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে, অতএব ভারতের সনাতন লক্ষ্যটী সর্ব্বত্র প্রচার করিতে হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মোহ কাটিলেই যেদিন তাঁহারা একযোগে আমাদের সনাতন নেশন-লক্ষ্য স্বীকার করিবেন, সেদিন নেশন-প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বিঘ্ন অপসারিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আর একটী বিঘ্ন একযোগ হইবার পথ বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, অথচ দেশের লোককে যথাসম্ভব একযোগ করাই নেশনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা। পরমহংসদেব এই দ্বিতীয় বিঘ্নটীর নাম দিয়াছেন—"মতুয়ার বুদ্ধি।" মতুয়ার বুদ্ধি কাহাকে বলে? না,—"আমার ধর্ম্মমতটী কেবল ভাল, অপরের ধর্ম্মমত মন্দ, আমার ধর্ম্মমতের দ্বারাই জগতের ইষ্ট, অপর ধর্ম্মমতে জগতের অনিষ্ট, আমার ধর্ম্মমতটীকে দাঁড় করাইতে হইবে, অপরের ধর্ম্মমত চুলোয় যাক্"—এইরূপ ভাবকে "মতুয়ার বুদ্ধি" বলে। এইরূপ বুদ্ধি থাকিতে, কোনও সম্প্রদায় অপরের সহিত ভারতীয় নেশন গড়িবার জন্য একযোগ হইতে যাইবে না। এই বুদ্ধি নাশ করিবার প্রকৃষ্ট উপায়ও—শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়া গিয়াছেন,—"মত, পথ" এই মন্ত্রটী যেন সকলকেই তিনি সর্ব্বদা অনুধাবন করিতে বলিতেছেন। কেননা তিনি সকলকে হাতে ধরিয়া, কাজে দেখাইয়া প্রাণপাত করিয়া বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, সকলেরই গন্তব্য লক্ষ্য এক, ভিন্ন

ভিন্ন মত কেবল ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র। কোনও পথই অপর পথকে রদ করিয়া দিতেছে না, কোনও পথকেই অবজ্ঞা করা যায় না। গন্তব্য লক্ষ্যও সম্পূর্ণ এক, ভিন্ন ভিন্ন পথে যাইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখায় মাত্র। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—একই চরম বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বলা হইয়াছে। "মত, পথ" রূপ এই মহাসত্যের দ্বারা "মতুয়ার" বুদ্ধিকে নাশ করিতে হইবে, তবেই দ্বিতীয় বিঘ্ন বিনষ্ট হইবে।

কিন্তু এখানে একটা আপত্তি উঠিতে পারে এই যে, উল্লিখিত বিঘ্ন দুইটা নাশ করিয়া দেশের লোককে এক যোগ করা বহুকাল-সাপেক্ষ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে দেশে নেশনপ্রতিষ্ঠার সূত্র-পাত এখনও বহুকাল না হইবারই কথা। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। জ্যোতির্বিজ্ঞানে যেমন দেখা যায় যে, মহাকাশে জ্যোতিষ্ক-প্রভৃতির গঠনারম্ভে, বিক্ষিপ্ত, অসংযত বাষ্পাণুগুলি প্রথমতঃ একটী সামান্য কেন্দ্রে একত্রিত হইতে থাকে, এবং কালে ক্রমশঃ উহাদেরই উপচয় ও ঘনসন্নিবেশে গ্রহ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, নেশনগঠনেও ঐরূপ একটা কেন্দ্র বা nucleus প্রথমতঃ দাঁড় করাইতে হয়। আমাদের দেশের সনাতন নেশন-লক্ষ্য, উহার সর্ব্বাঙ্গীন সাধন ও প্রচার, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের ভাব, এবং সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি শিরোধার্য্য করিয়া দেশে একস্থানে বা একটী কেন্দ্রে জমাট বাধা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, সম্যগ্‌দর্শী আচার্য্য বিবেকানন্দের চেষ্টায় প্রকৃতপক্ষে নেশনগঠনের কেন্দ্র বা nucleus ইতিমধ্যেই গড়িয়া উঠিতেছে; অতএব নেশনপ্রতিষ্ঠা সুদূরপরাহত নহে, সম্প্রতি উহাই আমাদের একমাত্র অনুষ্ঠেয়।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

তবে নেশন-প্রতিষ্ঠায় আমাদের দেশে একটা বিষয়ের অপেক্ষা আছে। কৃষিকার্য্য যেমন বর্ষার অপেক্ষা রাখে, ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠাও সেইরূপ ধর্ম্মভাবের একটা প্লাবনের উপর নির্ভর করে। যেমন জমি তৈয়ারী না থাকিলে, বীজ ভাল করিয়া বসে না বা গজায় না, তেমনি দেশের সর্ব্বত্র ধর্ম্মভাব যদি না জাগিয়া উঠে তবে নেশন-প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও প্রণালী জানা থাকিলেও, নেশন-প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইবে। সেইজন্য নেশন-প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে প্রথমেই ধর্ম্মজীবনের কথা তুলিতে হইয়াছে।

"The national ideals of India are *Renunciation and Service.* Intensify her in those two channels and the rest will take care of Itself." স্বামীজী বলিতেছেন, "ভারতীয় নেশনে সার্ব্বজনীন জীবনাদর্শ কি ?—ত্যাগ ও সেবা। এই দুইটী দিক দিয়া ভারতীয় জীবন-প্রবাহকে পরিপুষ্ট করিয়া তোল, দেখিবে আর সব দিকেই আপনা আপনি উন্নতি হইবে।" ভারতীয় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর দিয়াই ত্যাগ ও সেবার ভাবটী পরিপুষ্ট করা সম্ভব। অতএব ধর্ম্ম-জীবনের ত্যাগ ও সেবারূপ অঙ্গ নির্দ্দেশ করায়, নেশন-গঠনের জন্য সমগ্র ভারতে ধর্ম্মভাব কোন্ পথে পরিচালিত, উদ্বোধিত, করিতে হইবে তাহার একটা অসাম্প্রদায়িক ইঙ্গিত আমরা স্বামীজীর নিকট পাইতেছি।

'ত্যাগ' এই শব্দটী বড় সামান্য নহে ; ঐ একটী কথায় ধর্ম্মসাধনার প্রকৃত গতি নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন যে, গীতার শিক্ষা যদি হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও তবে

ভারতের সাধনা।

গীতা শব্দটী পাল্টাইয়া দশবার উচ্চারণ কর,—দেখিবে ত্যাগী হইতে বলাই গীতার সার উপদেশ। সমগ্র সৃষ্টিচক্রটী স্থূলতঃ ভোগের দিকে অবিরত ঘূর্ণায়মান; মানুষের স্বভাব সেই চাকার পাকে ভোগের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই অবিরাম আবর্ত্তন সামলাইবার পরম উপায়ের নামই ধর্ম্ম। সুতরাং ধর্ম্মসাধনার স্বাভাবিক গতি ভোগের বিপরীত দিকে, অর্থাৎ ত্যাগ বা অনাসক্তির দিকে। যে কোনও ধর্ম্মেরই হউক, ঠিক ঠিক সাধন হইতেছে কিনা তাহা জানিবার নির্ভুল উপায় সাধনার গতির দিকে লক্ষ্য করা,—অর্থাৎ সাধকের অনাসক্তির ভাব বাড়িতেছে কিনা তাহা লক্ষ্য করা। সাধনায় নানা সিদ্ধাই বা শক্তি লাভ করা উন্নতির অভ্রান্ত পরিচয় নহে, অথবা বিচিত্র দর্শনাদি হওয়াও উন্নতির অভ্রান্ত পরিচয় নহে, অথবা অতি সহজে বারম্বার "ভাব লাগা"ও উন্নতির অভ্রান্ত পরিচয় নহে। সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিতে চাও ত ত্যাগের প্রতি, অনাসক্তির প্রতি লক্ষ্য কর। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগলালসা যে পরিমাণে স্বভাব থেকে দাগটী পর্য্যন্ত না রাখিয়া খসিয়া পড়িতেছে, সেই পরিমাণে ধর্ম্মপথে উন্নতি লাভ হইতেছে, সেই পরিমাণে নিত্যসত্য পরমবস্তুর প্রতি প্রকৃতভাবে অগ্রসর হওয়া ঘটিতেছে। পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "সাধু কিরূপে চিনিব?" তিনি বলিয়াছিলেন—যিনি সাধু তিনি কামকাঞ্চন-ত্যাগী। কেন, বলিতে পারিতেন ত—যিনি নাচিয়া কাঁদিয়া ভাসান, অথবা যিনি অলৌকিক দর্শনাদি করেন, অথবা যিনি পরলোকের সপ্তমস্বর্গ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহে বেড়াইয়া আসিতে পারেন ইত্যাদি, ইত্যাদি?

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

বৌদ্ধ তান্ত্রিক-যুগে দেশটার হাড়ে হাড়ে ভেল্কি এমনই ঢুকিয়া গিয়াছে যে, এখনও লোকে সিদ্ধাই ছাড়া সাধুই মানে না! সাধন পথে অগ্রসর হইতেই প্রায় আপনার ভিতর সিদ্ধাই বা শক্তির বোধ হইবে; তখন সেই সব শক্তির ভোগ হইতে মনকে টানিয়া আসল কাজে লাগাইয়া রাখিতে হইবে, নচেৎ আবার বাঁধন পড়িবে, আবার পতন হইবে।

ত্যাগের আরম্ভ ইন্দ্রিয় মনের সংযমে ও পরাকাষ্ঠা পরমার্থ-লাভে। যিনি যে পথেরই পথিক হউন, অর্থাৎ যে সম্প্রদায়ভুক্তই হউন, 'ত্যাগ'—এই মন্ত্রটী তাঁহার সাধনার গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আজকাল যাঁহারা পাশ্চাত্য 'হিগেল'-দর্শনের ক্রমোন্নতিবাদ স্বীকার করিয়া বলেন যে, বিষয়ভোগের ভিতরেই আমরা পরম বস্তুর সম্ভোগ করিব, তাঁহাদিগকেও মানিতে হইবে যে, মন যদি অল্পমাত্রও আসক্তিতে বাঁধা থাকে, তবে বিষয়ের মধ্যে পরম-বস্তুর সম্ভোগ, মুখের ফাঁকা কথাই থাকিয়া যাইবে। ত্যাগ বা অনাসক্তিই ধর্ম্মজীবনের মেরুদণ্ড। সুস্থ, সবল ধর্ম্মজীবন এই মেরুদণ্ডের উপর নির্ভর করে। যদি নিজের দ্বারা নিজে ঠকিতে না চাও, যদি পরের দ্বারা নিজে ঠকিতে না চাও, যদি দেশে সুস্থ সবল ধর্ম্মজীবন গড়িয়া তুলিতে চাও, তবে—হে ভারতবাসি! যে সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হও, ত্যাগ বা অনাসক্তিকেই সাধনতরীর কম্পাসরূপে গ্রহণ কর।

ভারতীয় নেশনে জীবনাদর্শের দ্বিতীয় অঙ্গ, সেবা। স্বামীজী যে সেবাতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহা আজকাল সকলেরই পরিষ্কার ভাবে বুঝা আবশ্যক। কারণ, আধুনিক যুগে পরোপকার করা

দেশের কাজ করা, দশের ও দেশের উপকারে আসা, প্রভৃতি একটা নূতন রকমের ধূয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই ভাবটী পাশ্চাত্য ঐহিকতার নকল,—উহার সহিত প্রকৃত ধর্ম্ম জীবনের সংযোগ নাই, অর্থাৎ ধর্ম্মসাধনায় যতই উন্নতি হইবে, ঐ সব হাঙ্গামা ততই কমিয়া যাইবে। আবার ঠিক বিপরীত আর একদল লোক আছেন যাহারা বলেন যে, এতকাল কেবল "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" ও "পরকাল পরকাল" করিয়া দেশটা গোল্লায় গিয়াছে, এখন ওসব রাখিয়া দশের জন্য, দেশের জন্য খাটিতে হইবে; এখন চাই দেশের দুঃখ ঘুচাইবার চেষ্টা।

এই দুই শ্রেণীর লোকই ধর্ম্মের পূর্ণস্বরূপ বুঝিয়া দেখেন নাই। প্রথম দলের লোক যাহা বলেন, তাহা কতকটা সত্য, কারণ পাশ্চাত্য লোকহিতসাধন ধর্ম্মজীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত নহে; পরের জন্য খাটা, পরোপকার করার মধ্যে কর্ত্তৃত্বাভিমান বা লোকমান্যের স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মভিত্তিহীন কর্ম্মপ্রবণতায় চিত্ত কেবল অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া পড়ে। এ অবস্থায় ধর্ম্মলিপ্সু সাধক ঐরূপ কর্ম্মজালের প্রতি পরাঙ্মুখ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! আবার ইহাও সত্য যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া আমাদের দেশে অনেক লোক কর্ম্মবিমুখ হইয়া পড়িয়াছেন এবং তমোগুণের জালে আবদ্ধ হইয়াছেন। ধর্ম্মান্বেষণে তমোগুণী সহজেই ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পথ হারাইয়া বসিয়া থাকেন। স্বামীজী একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ইহসর্ব্বস্ব-ভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই ধর্ম্মাবরণের ভিতর দিয়া

তমোভাবকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরুদ্ধে জলদমন্দ্রে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন।

বাস্তবিক, পরমার্থসাধন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মজীবনের একটা বিশেষ বিভাগ নহে। মানুষ নিজের দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিবার জন্য ধর্ম্ম-সাধনের একটা আলাদা বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখে। যাহা বহির্ম্মুখ মানুষকে অন্তর্ম্মুখ করে, তাহার নামই ধর্ম্ম; মনুষ্যোচিত সকল কাজেই যেমন বহির্ম্মুখতার অবকাশ রহিয়াছে, তেমনই অন্তর্ম্মুখতারও অবকাশ রহিয়াছে। অতএব মানুষের সমগ্র জীবনটাই ধর্ম্মের পক্ষে উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র। মনুষ্যোচিত যেরূপ কর্ম্মক্ষেত্রেই মানুষ দাঁড়াইয়া থাকুক না কেন, সেইখান থেকেই সে ধর্ম্মের সাড়া পাইতে পারে, সেইখান থেকেই তাহার জন্য সাধনসোপান বিলম্বিত রহিয়াছে। মানুষের অন্তরেই পরমবস্তু রহিয়াছে,—"যা চাবি তা ব'সে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।" অতএব মানুষ দৈনন্দিন জীবনের যেরূপ কর্ম্মকক্ষেই অবস্থিত থাকুক, পরমার্থসাধনের এলাকার বাহিরে যাইবার তাহার উপায় নাই। সমস্ত লোকব্যবহারে অন্তর্ম্মুখতা যাঁহার যত দৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ধর্ম্মের আস্বাদ তত গভীর ভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ।

অতএব যাহাকে আমরা পরের উপকার করা, পরের জন্য খাটা বলি, তাহারই অনুষ্ঠানকে প্রকৃত পরমার্থসাধনে পরিণত করা যাইতে পারে। স্বামীজীর সেবাতত্ত্বে এই উদ্দেশ্যটাই সাধিত হইয়াছে।

সমাধিবিলীনসর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন প্রথম 'ভাবমুখে'

থাকিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেখা গিয়াছে, লৌকিক বাহ্যজ্ঞানের ভূমিতে থাকা তাঁহার অল্পই ঘটিয়া উঠিত; নিয়তই তাঁহার মনবুদ্ধি মহাকারণে লীন হইয়া যাইত। জলে বরফখণ্ডের মত এই অবস্থা যখন কমিয়া আসিতে লাগিল,—যখন ঠাকুর আকৃষ্টচিত্ত যুবকদের সহিত বেশ মেলামেশা করিতেছেন,—তখন হাজরা মহাশয় একবার, "ছেলেদের সঙ্গে তোমার অত মেলামেশার দরকার কি"—এইরূপ ভর্ৎসনাবাক্যে তাঁহাকে ঐ কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে গিয়াছিলেন। বাস্তবিকই যিনি শ্রেষ্ঠ উপাসক, তিনি কি প্রয়োজনে উপাসনা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বিরত হইবেন? যিনি জীবনের প্রতিমুহূর্ত্ত উপাস্যের সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকিতে চান, তিনি কেন লোকের সহিত মেলামেশা করিবেন, তিনি কেন কর্ম্মে লিপ্ত হইবেন? এই সমস্ত প্রশ্ন যাঁহাদের মনে উঠে যেন তাঁহাদেরই প্রতিনিধি হইয়া হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে বলিলেন,—"তোমার আবার ওসব কেন?"

প্রশ্নটী পরমহংসদেব স্বীকার করিয়া লইলেন এবং মীমাংসার জন্য উচ্চ ভাবভূমিতে লইয়া গেলেন। তারপর মা'র মুখে তিনি যে মীমাংসা পাইলেন, তাহা হাজরা মহাশয়কে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎ শুনিয়া রাখিয়াছে। পরম সিদ্ধাবস্থাতেও নারায়ণ-জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা চলিতে পারে,—এই সাক্ষ্য ও আশ্বাস আমাদের দেশের পক্ষে আবশ্যক ছিল। কর্ম্ম মানে জীবজগতের সঙ্গে ব্যবহার। এই ব্যবহার পরমসিদ্ধের পক্ষেও সম্ভব, এ কথা ঠাকুরের মুখে প্রকাশ না হইলে, আমাদের দেশে কর্ম্মযোগ বা সেবাতত্ত্বের প্রচার এক প্রকার ভিত্তিহীন হইয়া থাকিত।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

আপ্তপুরুষে প্রকটিত ভাবসমূহই মানবসাধারণের সাধনচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ঠাকুরের কথায়, তাঁহারা যাহার "ষোল টাং" করেন, তাহারই "এক টাং" অন্ততঃ করিবার চেষ্টাই সাধারণের পক্ষে সাধনা। পরম সিদ্ধাবস্থায় সর্ব্বব্যবহারে জীব ও জগৎ সম্বন্ধে যে নারায়ণ-জ্ঞান বা ইষ্ট-জ্ঞান জাজ্বল্যমান থাকে, তাহার ষোল ভাগের এক ভাগ করিবার চেষ্টাই কর্ম্মযোগের সাধনা।

সেবাতত্ত্ব কর্ম্মযোগের প্রধান অঙ্গ। নেশনপ্রতিষ্ঠার সূচনায় দেশে যে ধর্ম্ম-জীবনের উৎকর্ষ হওয়া দরকার, তাহার পক্ষে একদিকে ত্যাগের ভাব যেমন একটী প্রধান অবলম্বন, অপর দিকে সেবার ভাবও আর একটী প্রধান অবলম্বন। নেশন-প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সেবার সাধনাও হওয়া আবশ্যক। পরের জন্য খাটা, পরের উপকার করা,—এ সমস্ত বাস্তবিকই পাশ্চাত্যভাব; "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" উপকার বা মঙ্গল সাধনের একমাত্র উৎস স্বয়ং পরমপুরুষ, তোমার আমার পক্ষে একমাত্র কাজ তাঁহারই সেবা করা,—অন্য কাজ কিছু নাই। যে সময় আমরা জ্ঞানাগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেছি না, অথবা ভক্তির তন্ময়তায় ইষ্টপূজা করিতেছি না, তখন সাধারণ ব্যবহারক্ষেত্রে থাকিয়াও পরমার্থসাধন করিবার একমাত্র উপায় ভগবৎজ্ঞানে জীব বা জগতের সেবা করা। সমস্ত সাধকেরই জীবনে এই সেবার জন্য অবসর রহিয়াছে; তবে কোনও সাধকের পক্ষে ঐরূপ সেবাই মুখ্য সাধনা, কাহারও পক্ষে বা উহা অপর সাধনার আনুষঙ্গিক। সেবার সাধনা কাহার পক্ষে প্রধান বা কাহার পক্ষে আনুষঙ্গিক, তাহা তাহার প্রকৃতি অনুসারে নির্দ্দেশ্য।

আবার একই সাধকজীবনে কখনও বা কর্ম্মত্যাগের ভাব, কখনও বা সেবারূপ সাধনার ভাব প্রবল হওয়া সম্ভব।

জীবরূপে ভগবান্ যখন আমাদের সেবা গ্রহণ করেন, তখন সেই সেবার উপকরণ তিন রকম হইতে দেখা যায়। সেবাগ্রাহী নারায়ণের মায়ারূপগুলি প্রধানতঃ তিন প্রকারের,—রুগ্ন, দরিদ্র প্রভৃতি দৈহিক-অভাবগ্রস্ত নারায়ণ ; অজ্ঞান, মূর্খ প্রভৃতি মানসিক-অভাবগ্রস্ত নারায়ণ এবং আধ্যাত্মিক অবিদ্যা-মোহগ্রস্ত নারায়ণ। এই ত্রিবিধমায়ারূপধারী নারায়ণের সেবাও ত্রিবিধ। কোথাও অর্থ-ঔষধ-পথ্য-শুশ্রূষাই নারায়ণসেবার উপকরণ, কোথাও বিদ্যাদি-দানই নারায়ণসেবার উপকরণ, এবং কোথাও বা পারমার্থিক জ্ঞানদানই নারায়ণসেবার উপকরণ। যে ক্ষেত্রে নারায়ণের যেরূপ মায়ারূপ দেখিব, সে ক্ষেত্রে সেবার উপকরণও তদনুরূপ হইবে। মায়ারূপী নারায়ণ যখন যে সেবা চাহিবেন, আমাদিগকে তখন সেই সেবাই দিতে হইবে। ভগবদ্‌জ্ঞানে লোকসেবার আদর্শ এই ভাবে হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইতে হইবে। হে মানব, সাধনার আসনে বসিলেই যে শুধু ভগবান্ তোমার নিকট আসেন তাহা নহে, যখন আসন ছাড়িয়া লোকসমাজে মিশিতেছ, তখনও তিনি নানাভাবে তোমার পূজা লইতে তোমার দ্বারস্থ ; তুমি আসনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে ছাড়িতে চাহিলেও, তিনি যে ছাড়েন না ! তোমার মন সরিয়া আসিতে চাহিলেও, তিনি সর্ব্বদা হাজির !

এই সেবার ভাব ও ত্যাগের ভাব যেন দুইটী ডানা ; এই দুই পক্ষের উপর ভর দিয়া আমাদের দেশে সাধক-পক্ষীকে পরমার্থসাধনরূপ আকাশে উড়িয়া যাইতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—ধর্ম্মজীবন।

এইজন্য ঘোষণা করিয়াছেন :—The National Ideals of India are *Renunciation and Service.*

ত্যাগ ও সেবা—উভয়ই ভারতীয় সার্ব্বজনীন ধর্ম্মজীবনের পক্ষে অসাম্প্রদায়িক অবলম্বন। তুমি যে সম্প্রদায়েরই সাধক হও, ত্যাগ ও সেবার ভাবে নিজ ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট করিয়া, ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে পার, এবং হৃদয় হইতে সংক্রামক "আধুনিকতা" দোষ দূর করিয়া ও "মতুয়ার বুদ্ধি" নাশ করিয়া নেশনের পুনর্গঠন কার্য্যে যোগদান করিতে পার। তোমার সাধনপথ যেরূপই হউক,—হে ভারতবাসি! সনাতনধর্ম্ম ভারতীয় নেশনপ্রতিষ্ঠা-যজ্ঞে তোমাকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। এস, নিজ সাধনপথে দাঁড়াইয়া ত্যাগ ও সেবার দ্বারা পরমার্থলাভ করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ কর, কারণ আমাদের নেশনে পরমার্থলাভই সার্ব্বজনীন লক্ষ্য। ভারতীয় নেশনকে আবার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, আবহমান কাল যে নিয়ন্তৃশক্তি ভারতেই অন্তর্নিহিত ছিল, সেই নিয়ন্তৃশক্তি পুনরায় সর্ব্বসমক্ষে আবির্ভূত হইয়াছে,—বেদোক্ত অসাম্প্রদায়িক পরমার্থভাবে তদাকারকারিত হইয়া নেশন-নেতা প্রকটিত হইয়াছেন,—নেশন-প্রতিষ্ঠার পথ আবার উন্মুক্ত হইয়াছে,—হে ভারতবাসি! অগ্রসর হও।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উপযুক্ত কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া নেশন গড়িবার জন্য প্রথমেই দেশে ধর্ম্মভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আগামীবারে নেশন-প্রতিষ্ঠার কেন্দ্র কিরূপ তাহা বিশদভাবে বুঝিতে হইবে। তারপর সমাজ, শিক্ষা, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কিরূপে নেশন-গঠন কার্য্য সুরু করিতে হইবে, তাহা আমরা বিচার করিব।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সন্ন্যাসাশ্রম।

(উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯)

"কেবল ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে, [ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যায়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ] ত্যাগই মহাশক্তি। যাহার ভিতর এই মহাশক্তির আবির্ভাব হয়, সে সমগ্র জগৎকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্যের ভিতরে আনে না। তখন তাহার নিকট সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ তুল্য হইয়া যায়—'ব্রহ্মাণ্ডং গোষ্পদায়তে।' ত্যাগই ভারতের সনাতন পতাকা। ঐ পতাকা সমগ্র জগতে উড়াইয়া, যে সকল জাতি মরিতে বসিয়াছে, ভারত তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছে,—সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার, সর্ব্বপ্রকার অসাধুতার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে; তাহাদিগকে যেন বলিতেছে, সাবধান! ত্যাগের পথ, শান্তির পথ, অবলম্বন কর, নতুবা মরিবে। হিন্দুগণ! ঐ ত্যাগের পতাকাকে পরিত্যাগ করিও না, উহা সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধর। * * *

"সংগ্রামে যে লক্ষ লক্ষ লোকের পতন হয়, তাহারা ধন্য। কারণ, তাহাদের শোণিতমূল্যেই সংগ্রামবিজয় ক্রীত হয়। * * * এই ত্যাগের আদর্শ রক্ষা করিতে গিয়া যদি গোঁড়ামি—অতি বীভৎস গোঁড়ামি—আশ্রয় করিতে হয়, ভস্মমাখা ঊর্দ্ধবাহু জটাজূটধারীদিগকে প্রশ্রয় দিতে হয়, সেও ভাল। কারণ, যদিও ঐগুলি অস্বাভাবিক, তথাপি যে মনুষ্যত্বহারিণী বিলাসিতা ভারতে প্রবেশ করিয়া আমাদের মজ্জা-মাংস পর্য্যন্ত শুষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই বিলাসিতার স্থানে ত্যাগের আদর্শ ধরিয়া সমগ্র জাতিকে সাবধান করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন। আমাদিগকে ত্যাগ অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। প্রাচীন কালে এই ত্যাগ সমগ্র ভারতকে জয় করিয়াছিল,—এখনও আবার এই ত্যাগই ভারত জয় করিবে।"*

---

* "সর্ব্বাবয়ব বেদান্ত" নামক কলিকাতা ষ্টার থিয়েটারে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সন্ন্যাসাশ্রম।

গতবারে আমরা নেশন-প্রতিষ্ঠার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভারতের চিরন্তন লক্ষ্যটী আশ্রয় করিয়া একযোগ হওয়াই ভারতীয় নেশনের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। লৌহকে তাতাইয়া না লইলে যেমন কর্ম্মকারের গড়াপিটার কাজ সুরু করা যায় না, সেইরূপ আমাদের দেশকে ধর্ম্মভাবে উদ্দীপিত না করিয়া লইলে নেশন-গড়ার কাজ আরম্ভই করা যায় না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ত্যাগ ও সেবার আদর্শেই দেশে ধর্ম্মজীবন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেশে এমন শক্তিকেন্দ্র থাকা চাই, যেখান থেকে নেশন গড়িয়া উঠিবে—যাহার সহিত চারিদিক্ হইতে সংলগ্ন হইয়া দেশের লোক জমাট বাঁধিবে ও নেশনাকারে পরিণত হইবে। ইহাও আমরা ইঙ্গিত করিয়াছি যে ঐরূপ শক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করাই 'রামকৃষ্ণ-মিশনের' জীবনব্রত।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে ভারতের পুনর্জ্জাগরণে সন্ন্যাসীর আবার কি কাজ? ভারতের উত্থান-পতনের সঙ্গে সন্ন্যাসাশ্রমের সম্বন্ধ কি? দেশের কাছে এক এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেই ত সন্ন্যাসীর চুকিয়া গেল, দেশের সঙ্গে তার আর কি সম্বন্ধ? এমন কি, এমন শিক্ষিত লোক আজ কাল অনেক আছেন, যাঁহারা বলেন যে, দেশে সন্ন্যাসাশ্রমকে প্রশ্রয় দেওয়ার মানে দেশের গলগ্রহ অকর্ম্মণ্য ভিক্ষুকদলের অযথা পরিপুষ্টি করা,—তা' ছাড়া আর কিছু নহে।

বিশদভাবে এই প্রশ্নটীর বিচার করা আবশ্যক, কারণ ভারতীয় নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠারূপ মহাযজ্ঞে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর।

আমাদের পুরাণ বলেন যে, জগৎ সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে পিতামহ

ব্রহ্মা দেখিলেন, প্রথম সৃষ্ট মানুষ প্রবৃত্তির পথ না লইয়া নিবৃত্তির পথে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী হইয়া যাইতে লাগিল,—এইরূপে সংসারসৃজনের পূর্ব্বেই সনক, সনন্দন প্রভৃতি, সন্ন্যাসাশ্রমের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দক্ষ, মনু প্রভৃতি সংসারী গড়িবার পূর্ব্বেই ভগবান্ ব্রহ্মাকে সন্ন্যাসী সৃজন করিতে হইয়াছিল। তারপর দেখি, যখন, সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া ভোগ-ধন্ধের মধ্যে মানুষ পথহারা হইয়া যাইতেছে, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা অথবা তাঁহার সন্ন্যাসী-পুত্রগণ সেই মানুষকে পরম সুখ ও শান্তির পথ দেখাইয়া দিতেছেন। এই পৌরাণিক কথার মধ্যে মানবসৃষ্টির একটা বিশেষ বিধি নিহিত রহিয়াছে। উহা বুঝা আবশ্যক।

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ দ্বন্দ্ব মানবসৃষ্টির মূলে বিদ্যমান। মানুষকে প্রবৃত্তির পথে লইবার সকল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তির পথে লইয়া যাইবার বন্দোবস্তও মানবসৃষ্টির অঙ্গীভূত। এইজন্য ভারতের সনাতন ধর্ম্ম, সংসার ও সন্ন্যাস—এই উভয় আশ্রমের কোনটীকেই বাদ দিতে পারেন নাই। সংসারের মূল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; সেই প্রবৃত্তি যতদিন থাকিবে, সংসার ততদিন থাকিবেই। আবার প্রবৃত্তির লীলা যতদিন থাকিবে, উহার উপরতি বা নিবৃত্তির আদর্শও ততদিন থাকিবে। এই আদর্শ রক্ষার ভার সন্ন্যাসাশ্রমের উপর সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই অর্পিত।

নিবৃত্তির আদর্শ পাশ্চাত্য সমাজেও অভিব্যক্ত হইয়াছে,—প্রাচ্যের প্রভাববশতঃই হউক, বা না হউক। কিন্তু সেই আদর্শকে অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্যসমাজ গড়িয়া উঠে নাই; সে আদর্শ পাশ্চাত্যে সমাজস্রোতের গতি নির্ণয় করে না। পাশ্চাত্যে নিবৃত্তি

সাক্ষাৎভাবে প্রতিপদে প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করে না, প্রবৃত্তি স্বীয় তৃপ্তির সন্ধানে কার্য্যগতিকে নিবৃত্তির হাতে ধরা পড়িয়া যায়। নিবৃত্তির রসান না দিলে প্রবৃত্তি সমাজে উৎকট উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলে,—কাজে কাজেই সমাজে নিবৃত্তির একটা আসন নির্দ্দিষ্ট রাখা আবশ্যক।

ভারতীয় সমাজ গোড়া থেকেই অকুণ্ঠিতভাবে নিবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ভারতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কোন্ পথে চলিবে, তাহা আদিযুগ হইতেই নিবৃত্তি স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। যেখানে সমাজকে প্রতিপদে নিবৃত্তির এইরূপ নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হয়, সেখানে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

যদি আপত্তি হয় যে, নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার গড়িলে, সাংসারিক উন্নতির কোনও নিশ্চয়তা নাই, তবে প্রশ্ন এই যে, সংসারের উন্নতি কাহাকে বলিব,—ভোগোৎকর্ষকে, না কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতাকে? যদি বল ভোগের যখন চরম উৎকর্ষ, তখনই সংসারের উন্নতি, তাহা হইলে ইতিহাস তোমার বিরোধী! শাস্ত্রমতে ভোগে রোগ নিহিত; ইতিহাস যেন সেই মতেরই পোষকতায় ও ব্যাখ্যানে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভোগে সর্ব্ববিধ রোগের উৎপত্তি,—শুধু শারীরিক ব্যাধি নহে, মানসিক ও আধ্যাত্মিক রোগেরও উৎপত্তি। রোমক প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা যখন নিজ নিজ ভোগলক্ষ্যে অনেক চেষ্টার ফলে উপনীত হইয়াছেন, তখন সেই ভোগ বা বিলাসিতা নিশ্চিতরূপেই তাহাদের স্বভাব বিগড়াইয়া

দিয়াছে এবং তাহাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া মৃত্যুকবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। আধুনিক যুগেও ভোগোৎকর্ষ যে একটা নেশনকে স্থূলচিত্ত ও বিলাসী করিয়া উচ্চাঙ্গের সাধনাসমূহে অক্ষম ও পরাঙ্মুখ করে, তাহা ইতিমধ্যেই ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, —বিশেষজ্ঞমাত্রেই এ কথা জানেন।

ভোগোৎকর্ষে সাংসারিক উন্নতির বীজ নিহিত নহে, উহার পতনবীজই নিহিত। সম্যগ্‌দৃষ্টিতে দেখিলে সংসারকে ভোগভূমি বলা যায় না, কর্ম্মভূমি বলিতে হয়,—ভোগোৎকর্ষ কর্ম্মের একটা অবান্তর ফলবিশেষ। কর্ম্মের এই ভোগরূপ অবান্তর ফলে লুব্ধ হইয়া ভারতের অনেক প্রাচীন দেশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য বিষ্ণুপুরাণ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, একমাত্র ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অপরাপর দেশ ভোগভূমি মাত্র। সাংসারিক উন্নতির প্রকৃত মাপকাটী কর্ম্ম, ভোগ নহে। সর্ব্ববিধ্বংসী কাল হইতে কর্ম্ম সংসারকে রক্ষা করিতেছে; কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দিয়া সংসারকে বজায় রাখিতেছে। কাল যখন কর্ম্মকে অতিক্রম করে, অর্থাৎ কর্ম্ম যখন সব দিক্ দিয়া সম্পূর্ণরূপে কালকে অনুসরণ করিতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়ে, তখন সংসারে অবনতি ঘটে। সব রকম অবস্থানুসারে ব্যবস্থা দেওয়াই কর্ম্মের সর্ব্বাঙ্গীনতা, এই সর্ব্বাঙ্গীনতাই সাংসারিক উন্নতির প্রকৃত পরিচয়। এখন কথা এই যে, নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার গড়িলে, কর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীনতা না আসিবে কেন,—নিবৃত্তি বলিতে কি কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি বুঝায়? তাহা ত নহে। ভোগাসক্তি ত্যাগ মানে কি কর্ম্মত্যাগ? ভোগরূপ ফলের প্রতি লোলুপতা

না রাখিয়া কি কর্ম্মী হওয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়; সেই কৌশলের নামই কর্ম্মযোগ,—'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং'। নিবৃত্তির নির্দ্দেশে সংসার পাতিয়া ভারত সেই কৌশলটী আয়ত্ত করিয়াছে। অতএব, নিবৃত্তির নির্দ্দেশ ও নিয়ন্তৃত্ব মানিলে সাংসারিক উন্নতির ভরসা নাই, এই আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

ভারতীয় নেশন কখনও এ আশঙ্কা করে নাই। আশঙ্কার অবসরই বা সে পাইবে কেমন করিয়া? তাহার সূতিকাগৃহে নিবৃত্তিই যে ধাত্রীস্বরূপিণী। যাহার ক্রোড়ে ভারতীয় নেশনের জন্ম, যাহার অঙ্গুলীনির্দ্দেশে সেই নেশন শৈশবে বর্দ্ধিত,—যৌবনে কর্ম্মসংগ্রামে জয়াভিলাষী,—তাহার নিয়ন্তৃত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ কাল যে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক নিবৃত্তির প্রতি আস্থাহীন ও সন্দিহান, তাহার কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব ও ভারতীয় নেশন-গৌরবের অভাব। সেই গৌরব যদি আবার ফিরিয়া পাইতে হয়, তবে নিবৃত্তির হাতে জাতীয় কর্ম্মতরীর হাল সংন্যস্ত করিতে হইবে।

আর এক আপত্তি উঠিতে পারে। কেহ কেহ বলেন, সংসারীই নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করিবেন, সন্ন্যাসীর প্রয়োজন নাই। আমরা কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করিবার ভার সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে সন্ন্যাসাশ্রমের উপরই সমর্পিত। এখন প্রশ্ন এই যে, সংসারী কেন সে ভার গ্রহণ করে নাই?

এ প্রশ্নের উত্তর পরমহংসদেব দিয়াছেন,—যে ভাঁড়ে দই পাতা হয়, সে ভাঁড়ে দুধ রাখিতে নাই, দুধ শীঘ্রই নষ্ট হয়। সাংসারিকতারূপ দধি সংসারীর হাড়ে ঢুকিয়াছে, ত্যাগাদর্শরূপ

দুগ্ধ সে পাত্রে রক্ষা করা বুদ্ধির কার্য্য নহে। কালের আবর্ত্তনে কখনও সংসারের উত্থান, কখনও বা পতন ; এই উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে সংসারীর অবস্থাবিপর্য্যয়ও অবশ্যম্ভাবী, তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা নিম্নবর্ণই হউন। সংসারচক্রে যে সংলগ্ন, তাহাকে কালের পাকে উঠিতে নামিতে হইবেই হইবে। এই জন্য যিনি সংসারের হিতার্থে উচ্চ আদর্শ রক্ষা করিবেন, তাহাকে সংসারচক্রের যথাসম্ভব অতীতে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। সন্ন্যাসীকে এইজন্য ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ রক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সনকসনন্দননারদাদি ঐরূপ ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তার পর প্রাচীন ভারতে যখন সমাজ গড়িতে আরম্ভ হইল, তখন প্রজাবৃদ্ধি করা একটা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল। সেইজন্য প্রাচীন যুগে আদর্শ রক্ষার ভার গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়বিধ ঋষির উপরই সংন্যস্ত ছিল, কিন্তু সুর ঠিক ছিল—"ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া।" যখন সমাজগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় নেশনের আদর্শসমূহ ব্যক্ত করা হইল, যখন লক্ষ্যস্থাপনার কার্য্য শেষ হইল, তখন হইতেই সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি দেশের ঝোঁক বাড়িতে লাগিল। যথার্থ গৃহস্থঋষি পরবর্ত্তী যুগে ক্রমশঃই কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বেদরক্ষক বেদাধ্যাপক যজ্ঞকৃৎ ব্রাহ্মণের যেমন অভাব হয় নাই, উপনিষদ্‌কার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরও তেমনি অভাব হয় নাই। বেদের কর্ম্মকাণ্ড যেমন ব্রাহ্মণ রক্ষা করিয়াছেন, বেদের জ্ঞানকাণ্ড তেমনি সন্ন্যাসী রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মহর্ষি বেদব্যাসের বেদবিভাগের পরবর্ত্তীকালে এবং বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে বেদের জ্ঞানকাণ্ড যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

কিন্তু নিবৃত্তির আদর্শ রক্ষা করা যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের জন্যই কেবল নহে, সমগ্র দেশের জন্য,—এই সত্য যখন সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিরোহিত হইতে ছিল, যখন তাহাদের সহিত যোগাযোগ না থাকায় জ্ঞানকাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশের ব্রাহ্মণগণ চারিদিকে নব নব জাতির অভ্যুদয়ের অন্তরালে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে প্রকৃত জ্ঞানহবির অভাবে যজ্ঞকাষ্ঠ ঠেলিয়া ঠেলিয়া ধূমায়িত যজ্ঞক্ষেত্রে রক্ষা করিতেছিল, সেই সময় ভগবান্ বুদ্ধ অবতীর্ণ হইয়া জাতিসংমিশ্রণে মথিত, নবোত্থিত ভারতীয় সমাজকে নিবৃত্তির আদর্শ শিখাইবার জন্য নিজে সন্ন্যাসী হইলেন, এবং সহচরদিগকে অভিসম্পদা বা সন্ন্যাস দান করিলেন। সন্ন্যাসী গভীর নিবৃত্তির নামে ডাক দিয়াছেন, ভারত শুনিতে বাধ্য; তাই পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ভারত শ্রমণের পদানত।

ভারতীয় নেশনের একটী মহাসমস্যা ভঞ্জন করিবার জন্য ভারতেতিহাসে বৌদ্ধযুগের উদয় হইয়াছিল। আর্য্যেতর নূতন জাতিদিগের সংমিশ্রণে ভারতে এমন একটা নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল যাহাদের সহিত প্রাচীন আর্য্যদিগের একীকরণার্থে একটা সেতুর প্রয়োজন হইয়াছিল। যদি একটা সেতুর সাহায্যে প্রাচীন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে অঙ্গীভূত করিয়া না লইত, তবে আজ আমরা আর্য্যসভ্যতার কোন নিদর্শন খুঁজিয়া পাইতাম না। আর্য্যের জীবনাদর্শ ত্যাগমূলক, আগন্তুক অনার্য্যের জীবনে সহজ স্বাভাবিক ভোগবাসনাই বলবতী। জীবনাদর্শের এই ঘোর সংঘর্ষে কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী আর্য্যসমাজ কোনমতেই জয়লাভ করিতে পারিত না,—এমন কি, রণে ভঙ্গ দিয়া মৃত্যুযবনিকার পারে সরিয়া যাইতে

হইত। আর্য্য ও অনার্য্যের এই ঘোর সংঘর্ষে সনাতন ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত মহাশক্তির আবার প্রকাশ হইল,—যুগাবতার ভগবান্ বুদ্ধ স্বয়ং মহাসেতুরূপে আবির্ভূত হইলেন। আর্য্যসমাজের গণ্ডীর বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রবল নিবৃত্তির আদর্শের দ্বারা অনার্য্যের স্বভাবকে বুদ্ধদেব এমন পরিবর্ত্তিত করিয়া দিলেন যে, দশ শতাব্দীর পর আর্য্য ও অনার্য্যের পূর্ব্ব ব্যবধান লুপ্ত হইয়া গেল, এবং যখন আচার্য্য শঙ্করের সময় হইতে আর্য্যসমাজের প্রাচীন ভিত্তির উপর দাঁড়াইবার জন্য শুভ আহ্বান দেশমধ্যে ঘোষণা করা হইল, তখন বৌদ্ধযুগের নবগঠিত ভারতবর্ষ একযোগে সে আহ্বান শুনিল। আর্য্যেতর মানবকে আপনাতে অঙ্গীভূত করিবার জন্য বুদ্ধে আর্য্যসমাজের স্বগৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ ও আচার্য্য শঙ্করে আবার স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন। এই নিষ্ক্রমণ ও প্রত্যাবর্ত্তনরূপ দুইটী বিরাট্ ঘটনা ভারতীয় নেশনের ইতিহাসে যে শক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্ররূপে সন্ন্যাসী বিরাজমান। বুদ্ধ এবং শঙ্কর উভয়েই সন্ন্যাসাশ্রমের দ্বারা আপনাদিগের ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় নেশনের উদ্ভব ও অভিব্যক্তিতে সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য।

কিন্তু ভগবান্ শঙ্করের যুগ হইতে ভারতীয় নেশন প্রাচীন বৈদিক ভিত্তির উপর আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেও, সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া ভারতে নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়া উঠে নাই। বৌদ্ধ ভিক্ষু তাৎকালীন নব্য ভারতকে নিবৃত্তিমূলক সাধনায় এক করিয়াছিলেন, কিন্তু বৈদিক যুগের সহিত পারম্পর্য্য রক্ষা করিতে পারেন নাই; পরবর্ত্তী যুগের সন্ন্যাসী সেই পারম্পর্য্য ও সংযোগ স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু সাধনার মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতকে

সংহত ও একযোগ করিতে পারেন নাই। বিশাল ভারতকে প্রকৃতভাবে সংহত ও একযোগ করা দু' এক শতাব্দীর কাজও নহে। কিন্তু ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে পরবর্ত্তী কালে ভারত করায়ত্ত-যন্ত্রের মত সন্ন্যাসীর হাতে পরিচালিত হইয়াছে।

বেদগুপ্তির সুব্যবস্থা হইলে আর্য্যেতর জাতিপ্রবাহকে ভারতীয় নেশনে অঙ্গীভূত করিবার জন্য ভারত যখন বেদসীমা অতিক্রম করিয়াও প্রাচীন ত্যাগাদর্শই ঘোষণা করিল, তখন ভারতের নেতা সন্ন্যাসী; যখন সেই আদর্শের প্রভাবে ভারতের আগন্তুক সমাজ রূপান্তরিত হইয়া প্রাচীন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য হইল, তখন নব বেশে সন্ন্যাসী আবির্ভূত হইয়া সেই প্রাচীন আদর্শের আকরস্বরূপ বেদভূমির উপর ভারতকে আকর্ষণ করিলেন। তারপর ভারতবর্ষ সেই বেদভূমির উপর অবস্থিত হইলে, সেই ভূমি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রবাহ প্রকটিত হইতে লাগিল; এই সকল প্রাক্‌পরিপোষিত সাধনপ্রবাহ যেন এক এক জন সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সন্ন্যাসীর দ্বারা উৎখাত হইয়া অন্তঃসলিলতা পরিহার করিল। এইরূপে জ্ঞানভক্তিযোগমার্গে সাধনার অনেক পন্থা বা সম্প্রদায় উদ্ভূত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্যে যেমন একটী প্রকাণ্ড কারখানা গড়িবার সময় শতশত বিঘা জমির নানাদিকে নানা রকম কাজ সুরু হইয়া যায়, নানাস্থানে নানারকম যন্ত্র বসে, ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রশিল্প, ভিন্ন ভিন্ন পূর্ত্তকার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সরবরাহ—শত শত প্রকারের অনুষ্ঠান—যাহা আপাতদৃষ্টিতে সংযোগহীন ও এমন কি স্থানে স্থানে পরস্পরবিরোধী,—তেমনি বৌদ্ধযুগের অবসানে

ভারতের সাধনা।

বেদভিত্তির পুনরধিকার হইতে প্রায় সহস্র বৎসর ভারতবর্ষে পরমার্থসাধনার যেন একটা বিশাল কারখানা গড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কারখানার সর্ব্বত্রই শিল্পী একমাত্র সন্ন্যাসী,—উপকরণ, সাধারণ ভারতবাসীর জীবন। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া কারখানার শত শত বিভিন্ন অঙ্গ গড়িয়া উঠিয়াছে, অবশেষে এমন একজন সুনিপুণ যন্ত্রশিল্পী ইঞ্জিনিয়ার আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি সকল বিভাগেই পারদর্শী এবং যিনি এই বিশাল কারখানার সমস্ত ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলি এক মূল অভিপ্রায়ের দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও সংযুক্ত করিয়া দিয়া ভারতব্যাপী বিরাট্ যন্ত্রটী এক লক্ষ্যপথে চালাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন,—ইনিই শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণ।

ভারতের ইতিহাস পরমার্থসাধনার ইতিহাস, রাজনীতি বা সমাজনীতির ইতিহাস নহে। তাই ভারতেতিবৃত্তের রচয়িতা সন্ন্যাসী, রাজরাজড়া বা ন্যাপোলিয়ঁ, বিসমার্ক নহে। ভারতের ইতিহাস খুঁজিয়া বাহির করিতে চাও ত, গৈরিকদীপ্তির অনুসরণ করিয়া কালের অন্ধকারে পথ চলিতে শিক্ষা কর। ভারতে গৈরিক-প্রভায় ইতিহাসের পথ আলোকিত, তরবারির ঝন্ঝনা বা রাজ-মুকুটদীপ্তি সে পথে আলেয়ামাত্র—কুহকসৃষ্টি করে, পথ ভুলায়, পথের প্রকৃত পরিচয় দেয় না।

যিনি ভারতের ইতিহাসরচয়িতা, অতীতের সংযোগসূত্র, ভবিষ্যতের কর্ম্মবীজ যাহার হস্তে সুরক্ষিত,—হে ভারতবাসি! আজ তুমি সেই সন্ন্যাসী বা তাহার আশ্রমকে দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া অবহেলা করিতে পার না। নিবৃত্তিরূপ নেশন-রথরশ্মি সন্ন্যাসী ব্যতীত আজ ভারতে কে চালাইতে সমর্থ? আধুনিক কর্ম্মজগতের

মহাকুরুক্ষেত্রে তোমাকে যদি বিজয়ী অর্জ্জুন হইয়া দাঁড়াইতে হয়, তবে সারথি নির্ব্বাচনে ভুল করিয়া বসিও না। কে বুঝাইয়া দিবে ভারতের নেশনত্ব কোথায়? কে বুঝাইয়া দিবে তোমার চিরন্তন নেশন-লক্ষ্য কি? কে সেই লক্ষ্যসাধনের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে? যিনি চরম লক্ষ্য লাভ করিয়াছেন, যিনি পরমার্থবিৎ, তাঁহার নিয়ন্তৃত্ব ব্যতীত ভারতে নেশন গড়িতে পারে না,—ইহা এত দিনে ঠেকিয়াও বুঝা উচিত।

বৌদ্ধযুগের জন্য বুদ্ধদেব শ্রমণসম্প্রদায় গড়িয়াছিলেন। তারপর বেদপুনঃস্থাপনার যুগে বৈদিক সাধনবৈচিত্র্যের সম্যক্ প্রকটনোদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সন্ন্যাসিসম্প্রদায় ভারতবর্ষে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক সময় দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সাধন-প্রবাহ এক উদার হৃদয়সঙ্গমক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছিল; সেই শুভক্ষণে, লোকচক্ষুর অন্তরালে এক অভিনব যুগপ্রবর্ত্তক সন্ন্যাসাশ্রম ভারতের জন্য বীজাকারে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সেই সন্ন্যাস প্রকাশ পায়, তিনি ব্যতীত আর কেহ সে ঘটনা জানিত না; তাই একদিন তদাশ্রিত কোনও সাধক, সন্ন্যাসীর জন্য ভিক্ষায়োজন করিয়া বাহিরে সাধুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আপন ঘরে বর্ত্তমান যুগের ভাবী সন্ন্যাসীদের দেখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, "এদের খাওয়ালে যথার্থ সাধুভোজন করান হয়।" পরমহংসদেবের এ বাণী একটা রূপক নহে,—একটা রূপকের দোহাইয়ে সদাচারমর্য্যাদা ভাঙ্গিবার মানুষ তিনি ছিলেন না। বাস্তবিকই দিনের পর দিন ভারতীয় নানা সন্ন্যাসিসম্প্রদায় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে আপন আপন জীবনীশক্তির সূক্ষ্ম-

সূত্রগুলি গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া যাইত; বাস্তবিকই সেই সূত্রগুলি আপনার সর্ব্বসমন্বয়কারী সাধনতাঁতে ফেলিয়া পরমহংসদেব এক নূতন সন্ন্যাস রচনা করিয়া তদর্থসর্ব্বত্যাগী ভক্তদের প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন ব্যাকুলভাবে কাটাইয়াছেন। তাই যে দিন তাঁহার সন্ন্যাসপ্রবর্ত্তক শঙ্করমূর্ত্তির প্রথম দর্শন পাইলেন, সেদিন আনন্দে তিনি আত্মহারা। সন্ন্যাসস্বরূপ যেন মূর্ত্তির অভাবে অপ্রকাশ ছিল,—যেন মূর্ত্তি সমীপাগত হইবামাত্র সেই স্বরূপ তাহার অন্তর-বাহির অধিকার করিল। ভারতে আধুনিক যুগের সন্ন্যাস শ্রীরামকৃষ্ণে স্বরূপ লাভ করিল, এবং স্বপ্রবর্ত্তক শ্রীবিবেকানন্দে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল।

গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়েই ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছে, তাঁহার প্রেম ও করুণা উভয়ত্রই সমভাবে বর্ষিত,—কেহ কম পাইবার বা কেহ বেশী পাইবার দাবী রাখে না। কিন্তু তিনি যাহাকে সংসার ছাড়াইয়া, গৃহসমাজ ছাড়াইয়া, সন্ন্যাসী করেন, তাঁহার বিশেষ একটা ভার, একটা দায় আছে,—সে দায় দেশের জন্য, জগতের জন্য, স্বপ্রদর্শিত আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচার। এই দায়পূরণের যোগ্যতা যতদিন থাকিবে, ততদিন তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের বিলোপ নাই, বিনাশ নাই। আবার যতদিন এই দায়পূরণে তাঁহার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত সন্ন্যাসিজীবনে প্রকটিত হইবে, ততদিন যোগ্যতারও অভাব হইবে না।

এই দায় বা ট্রাষ্ট একটা শাশ্বত, নিত্য ব্যাপার। সন্ন্যাস বলিতে মূলে একটা দায় বা ট্রাষ্ট বুঝায়। কথাটা শুনিলেই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, সন্ন্যাসে কোন রকম দায়দায়িত্ব নাই,—যে সমস্ত

সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, তার আবার দায় কি? দায় বলিতে যদি দায়ী ছাড়া আর কাহারও নিয়োগ বুঝায়, তবে বলিতে হইবে জীবন্মুক্তের কোন দায় নাই; যে প্রকৃতি ভগবল্লাভের পথ রোধ করিয়া আছে, তাহার নিয়োগ যদি দায় হয়, তবে সন্ন্যাসীর সেরূপ দায়ও থাকে না। কিন্তু যে প্রকৃতি চরমসিদ্ধি দান করিয়াছে, বা করিতেছে, সেই প্রকৃতির যে নিয়োগ বা প্রেরণায় সন্ন্যাসী জগদ্ধিতায় প্রবৃত্ত হন, তাহাকেই আমরা দায় বলিয়াছি। পুরাণোক্ত নিবৃত্তিমার্গপ্রবর্ত্তক সনকসনন্দনাদি সর্ব্বমায়াবন্ধনের অতীত হওয়ায় যদিও পিতামহ ব্রহ্মার সংসারসৃজনরূপ কার্য্যে সহায়রূপে গণ্য হইলেন না, তথাপি যে আদ্যাশক্তিতে তাঁহারা সৃজিত, সেই শক্তির যে নিয়োগ বা প্রেরণায় সংসারে নিবৃত্তির পথ দেখাইতে তাঁহারা ব্রতী হইলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। আজন্ম-সর্ব্ববন্ধনহীন শুকদেব উন্মত্তবৎ জগতে বিচরণ করিলেও, যে নিয়োগ বা প্রেরণা উপেক্ষা না করিয়া সভাস্থলে ভাগবতকথা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। বোধি-বৃক্ষমূলে চরমজ্ঞান লাভ করিয়া যখন শাক্যসিংহের সমস্ত বন্ধন তিরোহিত হইল, তখন আপনার নির্ব্বাণপ্রদায়িনী প্রকৃতির মধ্যেই যে নিয়োগ অনুভব করিয়া তিনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, তাহাকেই আমরা সন্ন্যাসের দায় বলিয়াছি। সর্ব্বকর্ম্মাতীত ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইয়াও যে দায় পূরণে জ্ঞানগুরু শঙ্কর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রচাররূপ কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিলেন, তাহাকেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। প্রেমাবতার অভিন্নযুগলমূর্ত্তি গৌরাঙ্গদেব যে দায় মাথায় লইবার জন্য সন্ন্যাস লইলেন, অতএব গৃহবাসী বৈষ্ণব

হইয়া থাকিলে যে দায় প্রকৃতভাবে স্বীকার করা হইত না বলিয়া তিনিই বুঝাইতেছেন, সেই দায়কেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। যে দায় স্কন্ধে চাপাইবার জন্য পরমহংসদেব স্বনির্দ্দেশে সাধননিরত যুবকপ্রবরকে বুঝাইতেছেন যে, চব্বিশ ঘণ্টা সমাধিবিলীন অবস্থায় কাটানর ইচ্ছা তাঁহার পক্ষে হীনবুদ্ধি, সেই দায়কেই সন্ন্যাসের দায় বলিতে হয়। আচার্য্য বিবেকানন্দ এই দায় সর্ব্বদা স্মরণ করাইবার জন্য তৎপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যব্যাখ্যায় বলিতেছেন, "আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"।

প্রত্যেক সন্ন্যাসীর জীবনে এই দায় সম্যক্ লক্ষিত না হইলেও সন্ন্যাসের মূলে উহা বিদ্যমান। এই অন্তর্নিহিত ভাবটীকে সুপ্রণালীর ভিতর দিয়া সন্ন্যাসে অভিব্যক্ত করিবার জন্য স্বামীজী ত্যাগসাধনার সঙ্গে সেবাতত্ত্বকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের সন্ন্যাসী সংসারে শুধু ত্যাগের পথ দেখাইবে না, প্রকৃত সেবার পথও দেখাইবে। যে ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ভারতে নেশনকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে ও ভবিষ্যতে উহাকে জগতের কল্যাণে নিয়ন্ত্রিত ও নিযুক্ত রাখিবে, সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা আধুনিক সন্ন্যাসের দায়ভুক্ত। এই ভগবৎপ্রদত্ত দায় শিরে বহন করিয়া নবোদিত সন্ন্যাসাশ্রম আজ ভারতীয় নেশন গড়িবার সনাতন পন্থা ঘোষণা করিতেছেন। যে সময় আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে জাতীয় জীবন গড়িবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার পরও নানা জন নানা মতে সেই চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়া বিফলতার সহিত সংগ্রাম করিতেছেন। হে পাঠকবৃন্দ, আপনারা সকলেই সে সমস্ত দেখিতেছেন; এখন জিজ্ঞাস্য এই

যে, আর কত কাল আমরা পাশ্চাত্যানুচিকীর্ষার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত, ভ্রান্তির দ্বারা পদে পদে বিড়ম্বিত, এবং উদ্যমের উপযুক্ত ক্ষেত্র-অভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিব ?

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী গোড়া-থেকেই সন্ন্যাসের বড় পক্ষপাতী নহেন। এ কথা আমরা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে জষ্টিস্ র‍্যাণাডের মত বিচক্ষণ লোকও সমাজ-সংস্করণ-সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সন্ন্যাসের বিপক্ষে প্রতিবাদ করায় স্বামীজী "প্রবুদ্ধ-ভারতে" লিখিয়াছেন,—"*Vive* Ranade and the Social Reformers!—but, oh India! Anglicised India! Do not forget, child, that there are in this society, problems that neither you nor your Western *Guru* can yet grasp the meaning of,—much less solve!"—"চিরজীবী হও, হে র‍্যাণ্যাডে ও সমাজ-সংস্কারক-দল!—কিন্তু হায় ভারত, পাশ্চাত্যভাবভাবিত ভারত! একথা, বৎস, ভুলোনা যে আমাদের সমাজে এমন সব সমস্যা আছে, যাহার মীমাংসা ত দূরের কথা, যাহার অর্থ পর্য্যন্ত তোমার পাশ্চাত্য গুরুদের এখনও বোধগম্য নহে!"

পাশ্চাত্যশিক্ষার পরিপক্ব ফলস্বরূপ একটা নূতন মত আজকাল শুনা যায়, যাহার ভিত্তি পাশ্চাত্য মনীষী হিগেলের Concrete Universal, অর্থাৎ অভিব্যক্ত সমষ্টিতত্ত্ব। ইংরাজী সাহিত্যে abstract শব্দের মধ্যে একটা শ্লেষ নিহিত আছে; যাহা ধরা-ছোঁয়া যায়, তাহা concrete, এবং যাহা চিন্তা বা কল্পনাদণ্ডে মথিত করিয়া, concrete ছাঁকিয়া, উদ্ধৃত করিয়া বুদ্ধিতে ধারণ

করিতে হয়, তাহা abstract! সূক্ষ্ম শব্দে কতকটা সে ভাব বুঝায়। হিগেল-দর্শনে যে পরমসূক্ষ্মতত্ত্বকে সর্ব্বদ্বন্দ্বাতীত শুদ্ধ সৎ বলা হয়, তাহার নাম Abstract Universal; সেই অব্যক্ত অবস্থায় অবস্থিত শুদ্ধ সৎস্বরূপ সমষ্টিতত্ত্ব স্বনিহিত অলঙ্ঘ্য প্রকাশ-শক্তিতে ব্যক্ত অবস্থায় বিলসিত হইয়া জগদাকার ধারণ করে। এই অভিব্যক্ত সমষ্টি অব্যক্ত সমষ্টির সত্য পরিণাম, অতএব আমাদের পক্ষে ব্যক্ত পরিণামকে ত্যাগ করিয়া অব্যক্ত পরিণামীকে লাভ করার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র,—পরিণামকে পূর্ণভাবে স্বীকার করিয়াই তন্মধ্যে পরিণামীর তুরীয় রস উপলব্ধি করিতে হইবে। এই "তন্মধ্যে"-টুকুর জের টানিয়া, কেবলই যে সংসারবিহিত সকল কর্ম্মকে বজায় করা হইল তাহা নহে, "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" —ইহাও নিষ্পত্তি করা হইল। এই মতে সংসারত্যাগ একটা বিষম ত্রুটি, কেন না সংসার না করিলে, ব্যক্তকে অবলম্বন করা রূপ অব্যক্তানুভূতির যে একমাত্র সাধন তাহাতে গলদ রহিয়া গেল। পাশ্চাত্যের বিশিষ্টাদ্বৈত কোন কোন স্থলে সন্ন্যাসের এইরূপে প্রতিবাদ করিতেছে। এই প্রতিবাদের প্রতিধ্বনিতে অনেক স্থলে শুনা যাইতেছে যে, মানুষের যতগুলি বৃত্তি তাহার সহজাত, তন্মধ্যে কোনটার যদি অনুশীলনে অবহেলা হয়, তবে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয় না,—সন্ন্যাস এই কারণে একটা নিখুঁত বা উৎকৃষ্ট আদর্শ নহে।

আমাদের দেশেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচলিত আছে, এবং জগৎ-পরিণাম আমাদের দেশেও কোন কোন সম্প্রদায় সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু তাহারা কই সংসারকে অনতিক্রমণীয় হইয়া

ত বুকে আঁকড়াইয়া ধরেন না? তাহারা সংসারের অনিত্যতা, মায়াময়ত্ব পুরাপুরি স্বীকার করেন। সন্ন্যাসের সহিত ভারতে প্রচলিত কোনও মতবাদেরই বিরোধ নাই। পাশ্চাত্য পরিণামবাদী ও ভারতীয় পরিণামবাদীর মধ্যে এই বৈষম্য কেন রহিয়াছে?

এই রহস্যের সদুত্তর আছে। "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—যাহা আছে, তাহার "নাই" হয় না, যাহা নাই তাহার আর "আছে" হয় না—এই মহাসত্যটী পাশ্চাত্য পরিণামবাদে যথোপযুক্ত স্থান পায় নাই! কিন্তু ভারতের চিন্তা ও সাধনায় এই সত্যটী বরাবরই ষোল আনা মর্য্যাদা পাইয়াছে। পাশ্চাত্যে evolved বা অভিব্যক্ত শব্দটী ব্যবহার করিলেই, একটা অভাব থেকে ভাবে পৌছান বুঝায়,—ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আসা বুঝায়, কিন্তু ভারতে অভিব্যক্তি শব্দের অর্থ—যাহা ছিল, তাহারই উপস্থিত ক্ষেত্রে আবর্ত্তন বা প্রবেশ—'জাত্যন্তরপরিণামঃ প্রকৃত্যাপূরাৎ'। এই প্রকৃতির আপূরণ,—যেমন বাঁধের এক ধারে জল ছিল, আবরণভেদে আর একদিক্ পূরণ করিতেছে,—এ ভাবটী পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ধাতে নাই। তারা evolution (অভিব্যক্তি) বুঝে, involution (অন্তর্নিহিতত্ব) তেমন বুঝে না। ধরা-ছোঁয়ায় পাওয়া যায় না বলিয়া যাহা স্থূলাতীত বা abstract, তাহার সহিত স্থূল বা concreteকে পাশ্চাত্য বুদ্ধি তুল্যমূল্য বলিয়া স্বীকার করে না। মতবাদের ভূমিকায় সাজগোছ করিবার সময় পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্ণত্বের যেইরূপই ব্যাখ্যা দিন, আখেরে প্রতিপন্ন হইয়া যায় যে, concrete বা স্থূলেই পূর্ণত্ব খুঁজিতে হইবে, স্থূলাতীত সত্তায় পূর্ণত্ব নাই। পাশ্চাত্য ক্রমোন্নতিবাদ স্থূলে পূর্ণত্ব পাইবারই আশা ও আশ্বাসবাণী!

Abstract বলিতে ভূত দেখা যেন পাশ্চাত্যের স্বভাব; দার্শনিকরা ওদেশে কেবল চেষ্টা করিয়াছে যে, ঐ জায়গাটায় ভূত না দেখিয়া, একটা ভালমন্দ ঘরোয়ানা রকমের কিছু দেখা,—কেহ কেহ বা ওহাঙ্গামাই একেবারে তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দিয়াছে,—যথা জড়বাদী। মনস্বী হিগেলের বাহাদুরি এই যে, তিনি স্থূল সৃষ্টির মূলে পরিণামক্রমে একটা ন্যায় সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন; এই ন্যায়সাহায্যে abstract বা স্থূলাতীত সত্তা ও তাহার পরিণামেও একটা সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়,—ভূত দেখিতে হয় না। কিন্তু এই সঙ্গতি মস্তিষ্কমন্থনে উদ্ভূত, গভীর অধ্যাত্মসাধনায় প্রত্যক্ষীকৃত নহে, সেই জন্য ভারতের কাছে সে মতবাদের কোনও prestige বা মর্য্যাদাই নাই।

কিন্তু "প্রকৃতির আপূরণ" বুঝিতে না পারায় হিগলের ন্যায় পাশ্চাত্য পরিণামবাদী কেবল সংসারেই যে পূর্ণত্ব পাইবার আশা রাখেন, ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতের সাধক সংসার হইতে হটিয়া আসিয়াও, স্থূল হইতে নিবৃত্ত হইয়াও, সেই পূর্ণত্বের ভরসা বজায় রাখিতে পারেন। ভারতের সত্যান্বেষী সাধক পরিণামের আদিতেও পূর্ণত্ব দেখে, মধ্যেও দেখে, অন্তেও দেখে; তাহার শ্রুতি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছে—"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে, পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—স্থূলের অতীতে পূর্ণত্ব, স্থূলে ব্যাপ্ত হইয়াও পূর্ণ রহিয়াছে; পূর্ণ হইতে পূর্ণ অভিব্যক্ত হইয়াছে; পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলেও পূর্ণই বাকি থাকিতেছে।

অতএব Concrete Universal, বা বৃত্তির অনুশীলন প্রভৃতি বড় বড় কথায় এ দেশও ভুলিবে না, সন্ন্যাসও উঠিয়া যাইবে না। এ

দেশে concrete যেমন প্রত্যক্ষ, abstractও তেমনি প্রত্যক্ষ; উপরন্তু concrete বা স্থূলে জড়ত্ব, বন্ধন, দুঃখ এবং পূর্ণত্বের ব্যঞ্জনা (suggestion) আছে,—পূর্ণত্ব নাই; abstract বা স্থূলাতীতে পূর্ণত্ব, চিন্ময়ত্ব, মুক্তভাব ও আনন্দ। এইজন্য ভারতে কেহ স্থূল সংসারভোগ ছাড়িয়া নিবৃত্তির পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, লোকে ভাবে না, সে বিগ্‌ড়াইল,—ভাবে, সে সার গ্রহণ করিল। পাশ্চাত্য পরিণামবাদী ভ্রান্ত,—তাই সে স্থলে তাহার মনে হইবে যে, লোকটা সংসার ছাড়িয়া অসম্পূর্ণতার কূপে পড়িল;—কারণ যাহা কিছু সম্পূর্ণতা তাহা সংসারে,—সংসার ছাড়িয়া পূর্ণতার সহিত সংযোগ কোথায় পাইব? শুনিয়াছি, পথ চলিতে চলিতে এক উট কাঁটা-শাক চিবাইতেছে,—রক্তও ঝরিতেছে, সুখও পাইতেছে,—এবং চোখ বুঁজিয়া বলিতেছে, "ভোজন ত একেই বলে! অ্যায়সা শাক কোথায় মেলে বাবা!" দূরে একটা বলীবর্দ্দও আহারে নিযুক্ত, সে কোমল তৃণ চিবাইতে চিবাইতে উটের কথায় বলিল, "শালা কাটমূখ্যু, আবার বেয়াদব?"

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে, নতুবা পাশ্চাত্য পরিণামবাদের কুফল আরও বিশদভাবে বিচার করা যাইত। পাশ্চাত্য আধুনিকযুগে ঐহিকতাকে যত মাথায় তুলিয়াছে, ততই সন্ন্যাসকে গালি দিয়াছে। তুমি যেখানে রস পাইবে, সেইটিকেই সত্য বলিয়া জাহির করিবে,—প্রকৃতির নিয়মই এই। সংসারচক্রে বসিয়া পাশ্চাত্য বেশ মধু চুষিতেছে, এ অবস্থায় সে চাকাটী সে ছাড়িবে কেন? সে বলিবে ঐ সংসার-চাকায় পাক খাইতে খাইতে আকাশ-পাতাল যাহা ভাবিতে হয় ভাব, ধর্ম্ম-কর্ম্ম যাহা করিতে হয় কর,—কারণ ঐ

চাকা ঠিক তোমায় উন্নতির ধ্রুব লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে। প্রাচ্য ঋষিদের মত তাঁহাদের এ হুঁস নাই যে, সংসার-চাকা ঘুরে ও চলে বটে, কিন্তু গ্রহ তারা সূর্য্যাদির মত, বিশ্বাকাশের সমস্ত আবর্ত্তনের মত, ফিরে ফিরে চিরকালই এক জায়গায় আসে,—এ স্থূল সংসারে সোজাসুজি সিদা চলিয়া যাওয়া ব'লে কোনও গতিই নাই। সংসারের প্রবৃত্তিচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মানবজীবনের লক্ষ্যে পৌঁছিবার ভরসা বকাণ্ডপ্রত্যাশা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভারতবর্ষে সেইজন্য আদিযুগ হইতে নিবৃত্তির বাণী ঘোষিত হইয়াছে, ভারতের যাঁরা নেতা ও নিয়ন্তা সেই সন্ন্যাসিগণ মানুষকে শিখাইয়াছেন যে, তাহারা প্রবৃত্তি লইয়াই জন্মিয়াছে বটে,—"নিবৃত্তিস্তু মহাফলা,"—কিন্তু নিবৃত্তিরই অনুসরণ করিতে হইবে ; সংসারচক্রের পাকে জগতে আসিয়াছ, কিন্তু অনাসক্তির দ্বারা সেই চাকার সহিত সংযোগ ছাড়াইয়া রাখ, যাহাতে আর না পাক খাইতে হয়। ঐ সংসারচক্রকে বিফল করিবার জন্য সৃষ্টিতে সাগরাম্বু হইতে ভারতবর্ষ সমুত্থিত হইয়াছে ; ঐ চক্রকে বৃথা করিয়া দিবার জন্য ভারতের আদিযুগ হইতে ব্রহ্মাস্ত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, ঐ চক্রকে বিফল করিবার মহাবিদ্যা ও কৌশল জগতের কল্যাণে বাঁচাইয়া রাখিতে ভারতে নেশন-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং সেই মহাবিদ্যা যাঁহাদের আয়ত্ত সেই সন্ন্যাসিগণও নেশনের শীর্ষস্থানে আসন পাইয়াছিলেন। সংসারচক্রকে বিফল করিতে না জানিলে কি ভারত আজও বাঁচিয়া থাকিত ? হে পাশ্চাত্যশিক্ষাগর্ব্বিত অবিশ্বাসি ! তোমার কোন্ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে ভারতের এই অদ্ভুত সঞ্জীবনী শক্তির ব্যাখ্যা হয়, তাহা জানিতে চাই।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সন্ন্যাসাশ্রম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দেখিলাম যে, ভারতীয় নেশনের স্থাপনা ও লক্ষ্যসাধনে সন্ন্যাসাশ্রম ও সন্ন্যাসীর নেতৃত্ব অপরিহার্য্য। সন্ন্যাস হইতেই কেন্দ্রশক্তি বিস্ফুরিত হইয়া দেশের লোককে প্রকৃতভাবে পথ দেখাইয়া দিবে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই নূতন সন্ন্যাস আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; এখন কোথায়—দেশের ত্যাগী, পরমার্থনিষ্ঠ যুবকবৃন্দ! তোমরা আজও কি স্বামীজীর সেই গগন-ভেদী প্রাণস্পর্শী গম্ভীর আহ্বান শ্রবণ কর নাই?

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজ।

(উদ্বোধন—আষাঢ়, ১৩১৯)

"আমি যে প্রণালীতে কায করিতে চাই তাহা এই,—আমি হিন্দুদিগকে বুঝাইতে চাই যে, যাহা বরাবরই তাহাদের আছে তাহার কিছুই তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে না ; কেবল ব্রহ্মজ্ঞ আচার্য্যগণ যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, সেই পথেই তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে ; বহুশতাব্দীর দাসত্বজনিত জড়তা তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। মুসলমানবিজয়ের সময় অবশ্যই আমাদিগকে যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল,—কারণ, অগ্রসর হওয়ার কথা দূরে থাক, তখন জীবনমরণসমস্যা উপস্থিত। সে সমস্ত নিষ্পেষণ এখন আর নাই, অতএব এখন আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, কিন্তু সে অগ্রসর হওয়া সমাজত্যাগীদের অথবা পাদ্‌রিদের নির্দ্দেশমত ধ্বংসপথে অগ্রসর হওয়া নহে, আমাদেরই নিতানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হওয়া। গৃহনির্ম্মাণ এখনও শেষ হয় নাই, তাই প্রত্যেক স্থানই কদর্য্য দেখাইতেছে। বহুশতাব্দীর নির্য্যাতনের মধ্যে আমাদিগকে গঠন কায বন্ধ করিতে হইয়াছিল। এখন এস, আবার গৃহনির্ম্মাণ কাজ সমাপ্ত কর,—দেখিবে প্রত্যেক স্থান কদর্য্য না থাকিয়া সুসঙ্গতি-লাভে সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত হইবে। ইহাই আমার অভিপ্রেত কার্য্যপ্রণালী।"*

বেদাদি শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের দৃষ্টি অতীতে যতদূর অগ্রসর হইতে পারে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচ্য ভূখণ্ডের কোনও স্থানে মানুষের আদিম অবস্থা হইতেই বিশ্বরহস্যের প্রতি গভীর জিজ্ঞাসার ভাব মানবহৃদয়ে উদ্রিক্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বস্মৃতি বা

---

* ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো হইতে লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একখানি ইংরাজী পত্র হইতে উদ্ধৃত ও ভাষান্তরিত।

সংস্কার বলিতে যাহা বুঝায়, যাহা অন্তর্নিহিত তাহারই প্রকটন বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই আদিম মানুষের জীবনবিকাশে দেখা যাইতেছে; হাজার ঘষামাজায় পশুত্ব, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অভাব, মনুষ্যত্বে পরিণত হয় না। যাহা পূর্ব্বে একসময় (বা এক কল্পে) ছিল, যাহা আমাদের দৃষ্টিতে বীজাকারে পরিণত হইয়াছিল বলা যায়, তাহাই আবার বিকাশ পায়। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"Every evolution is the outcome of a preceding involution,"—প্রত্যেক অভিব্যক্তি বা বিকাশ পূর্ব্ববিহিত সঙ্কোচনের ফল বা কার্য্যস্বরূপ।

সে যাহা হউক, সেই আদিযুগে মানুষ আপনার সংসারসুলভ অভাবাদি মোচন করিতে করিতে বিশ্বরহস্যকে ভুলিতে পারে নাই,—নানামতে উহাকে উদ্ঘাটিত করিবার জন্য যত্ন করিয়াছে। সেই চেষ্টা, সেই যত্ন, আজও বেদমন্ত্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আবার এই চেষ্টার একটীমাত্র ধারা যে খুব সামান্য একটী রেখাপাত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ,—পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি-বাদের হিসাব-নিকাশ দিতে দিতে,—একটী বৃহৎ প্রবাহে পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। সরল কৃষকের আবেগবিজৃম্ভিত গাথা যে যজ্ঞকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে, আবার যজ্ঞকর্ম্ম যে জ্ঞান ও ভক্তির সাধনায় পরিণত হইয়াছে, তাহা নহে। বিশ্বরহস্যের সম্মুখীন হইয়া মানুষ প্রথম হইতেই নানাভাবে উহার মীমাংসা খুঁজিতে ধাবমান হইয়াছে। প্রথম হইতেই রহস্যভেদের চেষ্টা নানাবিধ ধারায় আদিম মানবসমাজে উৎসারিত হইয়াছে। এমন কি সেই ধারাগুলি সমস্তই যে বেদসঙ্গমে পৌছিয়াছে, তাহা নহে; তবে

বেদের মধ্যে যে উহাদেরই একটী বৃহৎ সম্মিলিত ধারা নিজ প্রবাহ রক্ষা করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই প্রথমনিঃসৃত ধারাসমূহের মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই সম্প্রদায়বিশেষের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্ববিকাশের সেই আদিকেন্দ্র হইতে নানা দেশখণ্ডে সমানীত হইয়াছিল। যেমন অনুমান করা যায় যে, ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া মানুষের প্রথম উন্মেষেই ভাববৈচিত্র্য নিহিত ছিল, তেমনি ইহাও বুঝা যায় যে, ভাবের বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে বাসেরও বৈষম্য ঘটিয়াছিল। উহাকে উপনিবেশ বলিতে হয় বল, কিন্তু ইহা একপ্রকার সুনিশ্চিত যে, পৃথিবীর ইতিহাসে একটী কেন্দ্রে প্রথমতঃ মনুষ্যত্বের উন্মেষ হইয়া ক্রমশঃ নানা দেশখণ্ডে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল।

আধুনিক Geology বা ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের সাহায্যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধরাপৃষ্ঠে মনুষ্যবাসযোগ্য ভূমির সম্ভাবনা দেখা যায়; আবার পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ জীবতত্ত্বের বিচারে পশুজীবনের একটা সীমান্ত রেখা খুঁজিয়া পাইয়াছে। অতএব আধুনিক বিজ্ঞান একটা যুগের সংবাদ দিতেছে, যখন পৃথিবীর নানা স্থান এমন একটা জীবের দ্বারা অধিকৃত ছিল যাহারা না মানুষ, না জানোয়ার। কিন্তু পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঠিক এইখানে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং স্বীকার করিতেছে যে, মনুষ্যত্বে পৌঁছিবার আর একটীমাত্র সোপানের সন্ধান আর কোনমতে পাওয়া যাইতেছে না। জড়বাদ সে সন্ধান কি করিয়া পাইবে বল,—কারণ জড়বাদ যে হলপ করিয়া বসিয়াছে সে স্থূল হইতেই সূক্ষ্মের বিকাশ বা উৎপত্তি প্রমাণ করিবে।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজ।

যথাসম্ভব পরিণতমস্তিষ্ক, নরাকারপ্রায় পশুকে মানুষ বলা যায় না, একটা অভাবের জন্য। মানুষের এমন একটা বোধশক্তি খুলিয়া গিয়াছে, যাহা সেই নরতুল্য পশুতে বিকাশ পায় নাই। বিশ্বরহস্যের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও পশুর সেই রহস্যের হুঁস থাকে না, মানুষের থাকে,—ইহাই পশুত্ব ও মনুষ্যত্বের প্রভেদ বা ব্যবধান। সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে দিন নরাকারপ্রাপ্ত জীবের প্রাণে সেই হুঁস উদ্রিক্ত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে সে মনুষ্যপদ লাভ করিয়াছে। পরমহংসদেব মানুষ বলিতে কি বুঝায় তাহা এই হুঁস শব্দে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জীবতত্ত্বের বিচারে যত উন্নতি হইবে, ততই তাঁহার সেই তত্ত্বকথা প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই।

স্থূল বিশ্বের পশ্চাতে যে সদ্বস্তু আছে এবং তাহা মানবের উপাস্য ও জিজ্ঞাস্য—এই ভাবটা নানা আকার ধারণ করিয়া মনুষ্যত্ববিকাশের একটা কেন্দ্র হইতে পৃথিবীর তদানীন্তন পশুপ্রকৃতি নানা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল।* হয়ত তাহারও পূর্ব্বে মৃত-পিতৃপিতামহাদির পূজা বা জড়ে চৈতন্যকল্পনা প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা নানা স্থানে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতেছিল,

---

* আরও পরিস্ফুটভাবে বলিতে হইলে, বলা যায় যে, মানুষী প্রকৃতি ও ভাবের অতিরিক্ত হীন-স্বভাববিশিষ্ট জীব সকলের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য স্থান এক সময় অধিকৃত ছিল। নরাকার জীব যখন পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হইল, তখন উহাদের স্বভাব যে বিচিত্র ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। সৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রতিপদক্ষেপে বৈচিত্র্য রহিয়াছে। অতএব শাস্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্বে যক্ষ, রাক্ষস, অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি নানা জীবের সৃষ্টি যে নানা ভাবের স্থূল বিকাশ বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা খুবই যুক্তিযুক্ত; যথা—শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্দ, ২০ অধ্যায়।

কিন্তু একটী বিশেষ যুগ হইতে সমগ্র বিশ্বরহস্যের মূলে স্থূলাতীত সত্তার উপলব্ধি মানুষ যে করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই উপলব্ধি ধর্ম্মমতের আকার ধারণ করিয়া একটী কেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইয়া পশুকে মানুষে পরিণত করিয়াছে। যে ভূকেন্দ্র হইতে এইরূপ মনুষ্যত্বপরিণামের হেতুভূত ধর্ম্মভাবের তরঙ্গ (humanising waves of spirituality) জগতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার কথা বেদই স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয়।

জগৎ-রহস্যভেদের সেই আদিম উদ্যম হইতে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের উৎপত্তি। বৈদিক যুগের মধ্যেই ঐ উদ্যমকেন্দ্র যে ভারতের বিশেষ বিশেষ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহাও বেদ হইতেই বুঝা যায়। স্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কিছু না পাইলেও, এইটুকু সুনিশ্চিত পাওয়া যায় যে, বেদ যে সাধনার ফল, তাহার মূল ধারাটী ভারতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই ধারার অনুসরণ করিয়াই আমরা ভারতীয় সমাজের উদ্ভব ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করি।

ঋষিসঙ্ঘই ভারতীয় বেদবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক। জগতে

পৃথিবী এরূপ নানাভাবের বিকাশক্ষেত্র। আদিযুগে এইরূপ বিকাশগত প্রভেদ খুবই সুপরিস্ফুট ছিল, ক্রমশঃ সংমিশ্রণ ও আদানপ্রদানাদির দ্বারা ভেদরেখা ম্লান হইয়া মানুষের প্রকৃতিতে জটিলতা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আদিযুগে নানা ভাববিশিষ্ট জীবের মধ্যে বিশেষ একটী স্থানে যে প্রকৃত মানুষভাবাশ্রিত অথবা দৈবীপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্রহ্মসাধকদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা উচ্চাবচ ভাববৈচিত্র্যের নিত্যত্ব হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইতি লেখকস্য।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজ।

মনুষ্যত্বসূচক প্রথম উদ্যমের পৌর্ব্বাপর্য্য ঋষিরাই রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই প্রথম উদ্যমের যুগকে সত্যযুগ বলিয়াছেন। সেই সত্যযুগে দেখিতেছি জগতে মনুষ্যত্বের ভিত্তি যেন প্রোথিত হইতেছে। জড়ত্ব ও পশুত্বের পরাজয়ে মনুষ্যত্বরূপ বিজয়নিশান ভূপৃষ্ঠে প্রোথিত হইতেছে। জড় ও পশু যে জগৎ-রহস্যের নিকট অন্ধদাসত্বে আবদ্ধ ছিল, জগৎ-রহস্যের উদ্ঘাটনে সেই দাসত্ব তিরোহিত হইতেছে। মনুষ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে জীব কামনাপূরণে কেবলই মৃত্যু ও ভয়ের দ্বারা অনিবার্য্যরূপে বিড়ম্বিত হইয়া আসিয়াছে, মানুষ জন্মিয়াই অমৃতত্ব ঘোষণা করিল,—বলিল, "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরোঽবিমৃত্যু-র্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্য স বিজিজ্ঞাসিতব্য স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্ যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতীতি হ প্রজাপতিরুবাচ।"—প্রজাপতি বলিয়াছেন, সেই আত্মাকে অন্বেষণ কর, জানিবার চেষ্টা কর, যিনি অপাপ, অজর, অমর, অশোক, ক্ষুধাপিপাসাহীন, সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প। তাঁহাকে বিচার দ্বারা জানিলে সমস্ত লোক ও সমস্ত কামনা লাভ করা যায়।

মনুষ্যেতর জীবসুলভ এই পাপ, জরা, মৃত্যু, শোক, ক্ষুধাপিপাসা, বিফলতা, নৈরাশ্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিজয়ঘোষণা করিয়া আত্মবাদরূপ ভিত্তির উপর ভারতীয় সমাজ বৈদিকযুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই আত্মবাদের ভিত্তি, এই মনুষ্যত্বের ভিত্তি, পৃথিবীতে প্রোথিত করিবার জন্য সত্যযুগ অবতীর্ণ হইয়াছিল। সেই যুগোচিত উদ্যমে উদ্যোক্তার নাম ঋষি বা ব্রাহ্মণ; সে যুগে অন্যপ্রকার উদ্যমের অবকাশ নাই, সেই জন্য চাতুর্ব্বর্ণ্যও নাই। তপোপ্রভাবে ধরার

বহুকালপুষ্ট পশুত্বকে নিরাকৃত করিয়া পূর্ব্বকল্পলব্ধ সিদ্ধির পুনঃপ্রকাশই সত্যযুগোচিত উদ্যমের বিশেষ লক্ষ্য।

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ"—যদি ইহসংসারেই ব্রহ্মকে জানা হয়, তবেই সত্যতা বা নিত্যতা থাকে, নতুবা ইহসংসারে তাহাকে না জানিলে সর্ব্বনাশ। সত্যযুগের এই অমৃতত্বপ্রয়াসী ঋষিসমাজ ব্রহ্মসাধনার দ্বারা বাস্তবিকই আপনাকে জগতে অমর করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর আর কোনও সমাজই অমৃতত্বপ্রয়াসী হইয়া ব্রহ্মসাধনাব্যপদেশে আপনাকে গড়িয়া রাখিয়া যান নাই। সেইজন্য ইতিহাস কেবল সেই ঋষিপ্রতিষ্ঠিত সমাজের অমরত্ব ঘোষণা করিতেছে। সেই সমাজের ব্রহ্মলাভই একমাত্র লক্ষ্য ছিল,—'তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ',—আর সমস্ত প্রসঙ্গ পরিহার করিয়া একমাত্র ব্রহ্মেরই সাধনা কর, কেন না তিনিই যে অমৃতের সেতুস্বরূপ। এই মৃত্যুসঙ্কুল সংসাররহস্য ভেদ করিয়া ব্রহ্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যই ভারতে সেই সত্যযুগে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ব্রহ্মই সে সমাজের লক্ষ্য ছিল, আবার ব্রহ্মই সে সমাজের প্রতিষ্ঠা ছিল,—'অথ য আত্মা স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়।'

আর একটী ভাবিবার কথা এই যে, সেই আদিযুগের সমাজ আপনার বিশেষত্ব আপনি বুঝিত। ইংরাজীতে যাহাকে বলে self-consciousness বা অস্মিতা, তাহা ঐ সমাজের মধ্যে দেখা যাইতেছে। এই আত্মবোধ বা অস্মিতার নিদর্শন দেব ও অসুরের ভেদস্বীকার। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইন্দ্র-বিরোচনের যে

আত্মবিদ্যাশিক্ষার উপাখ্যান আছে, তাহাও এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। আপনাদিগকে দেবজাত ভাবিয়া একটা বিশেষত্ব স্বীকার করা সেই আদিযুগে সমাজগঠনের মূলে বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর যে সমস্ত জাতি প্রথম মনুষ্যত্ববিকাশে এক কেন্দ্র হইতে ধর্ম্মলাভ করিয়াও প্রবৃত্তিপরায়ণতার জন্য ব্রহ্মৈকলক্ষ্য হইতে পারে নাই, অতএব অমৃতত্বও লাভ করে নাই, তাহাদিগকে অসুর বলা হইত। অসুররা উপাসক ছিল, নিবৃত্তির সাধনাও কতক পরিমাণে করিত, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিত না,—সুতরাং প্রবৃত্তি বা ভোগভাবের বশ্যতাই শেষে স্বীকার করিত। এই সমস্ত অসুর-নামধেয় মনুষ্যশ্রেণীর সহিত ঋষিদের পূর্ব্বপুরুষ দেবতাগণ যে প্রায়ই বিবাদবিরোধে জড়িত হইতেন, তাহা বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। তবে বৈদিকযুগ হইতেই পুরাণের সেই সমস্ত উপাখ্যান ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথকদের ধারণানুরূপ বর্ণনাযোগে অল্পে অল্পে রূপান্তরিত হইয়া যাওয়ায়, এখন উহা হইতে পুরাতত্ত্বের উদ্ধার করা খুবই কঠিন।

যাহা হউক একটা সমাজের উদ্ভব সেই আদিযুগ হইতেই স্পষ্টভাবে অনুমিত হইতেছে। যে মূল প্রয়োজনের প্রেরণায় এই সমাজ গঠিত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রয়োজনের প্রেরণাশক্তির উপরই সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতি নির্ভর করে। অতএব সেই ভারতীয় সমাজের পরিণতি বুঝিতে হইলে, কাল-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নব নব প্রয়োজনের বিকাশেও সেই সমাজ আপনার মূল প্রয়োজনসিদ্ধির উপর কিরূপে পদে পদে স্থিতিলাভ করিয়া আসিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতের সাধনা।

জগৎ-রহস্যভেদরূপ যে যজ্ঞে জগতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইল, সেই যজ্ঞাগ্নিকে একমাত্র ভারতীয় সমাজ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন,—উহাকে যুগে যুগে নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। ব্রহ্মসাধনারূপ এই যজ্ঞাগ্নির রক্ষাব্যপদেশে ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি হইল। অতএব এই মূল প্রয়োজনের সাধনায়ই ঐ সমাজের উদ্ভব ও স্থিতি। কিন্তু কালে নানা গৌণ প্রয়োজন একে একে দেখা দিতে লাগিল, এবং উহাদের সাধনব্যপদেশে সমাজের স্থিতিমূলক পরিণাম ঘটিতে লাগিল। চতুর্ব্বর্ণভেদ এইরূপ একটী পরিণাম। যে ব্রহ্মসাধনারূপ যজ্ঞাগ্নির কথা বলিয়াছি, কেবল মাত্র ইন্ধনসংযোগ করিয়া গেলেই ত উহাকে রক্ষা করা হইবে না। বহিঃশত্রু বা আততায়ী যথেষ্ট আছে। তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে, বাহুবল এবং বিক্রম প্রকাশ করিবার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত রাখা চাই। এই প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ক্ষত্রিয়শক্তিকে ক্রমশঃ ঋষি-প্রতিষ্ঠিত সমাজের অঙ্গীভূত করা হইল। এই ক্ষত্রিয়গণ সম্পূর্ণরূপে ঋষিদিগের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত। সমাজ ইহাদের সাহায্যে বহিঃশত্রু হইতে আপনাকে ও আপনার সাধনাকে রক্ষা করিত এবং আপনার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা যেখানে বলপ্রয়োগে রক্ষা করিতে হয়, সেখানে সেইরূপে উহা রক্ষা করিত। বৈশ্যবর্ণের উদ্ভব ও পরিণাম সমাজে গ্রাসাচ্ছাদনমূলক কৃষিশিল্পাদি অনুশীলন ও উৎকর্ষের অনুরোধে। সমাজের পক্ষে উহাও একটী অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজন। চতুর্থতঃ, ক্ষত্রিয়বৈশ্যাদি গৃহস্থদিগের জন্য নীচজাতি হইতে সমাজ দাস সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত করিয়াছিল।

গীতা বলিয়াছেন যে, গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চাতুর্ব্বর্ণ্য

সৃষ্ট হইয়াছে। গুণ বলিতে সত্ত্বরজতমাদি গুণান্বিত মানুষের স্বভাব বুঝায়। কর্ম্ম বলিতে সামাজিক প্রয়োজনাদির পূরণ বুঝায়। অতএব দুইটী লক্ষণের দ্বারা মানুষের বর্ণ স্থিরীকৃত হইয়াছিল। প্রাচীন সমাজ চারিটী প্রয়োজন বা function স্বীকার করিত; একটী—মূলরক্ষা অর্থাৎ মূল প্রয়োজনসিদ্ধির ব্যবস্থা; দ্বিতীয়—আবশ্যকমত বলবিক্রমপ্রকাশের ব্যবস্থা; তৃতীয়—দেহধারণপোষণের উপকরণাদির ব্যবস্থা; চতুর্থ—অবান্তর সেবাদি কার্য্যের ব্যবস্থা। এই চতুর্বিধ প্রয়োজনসাধনের উপযোগী চতুর্বিধ মনুষ্যস্বভাব আছে। অতএব প্রাচীন সমাজ উপযুক্ত প্রয়োজনের পূরণার্থ উপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিল। ঋষিগণ বহুযুগ ধরিয়া সমাজের মূল প্রয়োজনটী সাধন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের স্বভাব ঐ সাধনার জন্য বংশপরম্পরায় গঠিত হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, বৃত্তিকে বংশগত করায় প্রাচীন সমাজে সুবিধাই হইয়াছিল। মানুষের মধ্যে গুণগত ভেদ নির্ণয় করিবার পক্ষে জন্মই প্রধান মীমাংসক। মানুষ যে আপনার সংস্কারানুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করে, এই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রাচীন সমাজের যথেষ্ট আস্থা ছিল। অতএব সেই প্রাচীন যুগে সমাজ যখন নূতন গড়িয়া উঠিতেছে এবং মানুষের স্বভাবপরিণামে যখন জটিলতা আসে নাই, তখন জন্মকেই যোগ্যতার নির্ণায়ক স্থির করা অপেক্ষা ভাল উপায় আর কিছু ছিল না। এইজন্ত দেখিতেছি জন্মগত বা বংশগত বর্ণভেদই তখন সমাজের নিয়ম ছিল,—অন্য প্রকারে একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উন্নয়ন বা অবনয়ন ঐ নিয়মেরই ব্যতিক্রম।

কিন্তু এইখানে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বলিতে মূলে এক একটী সামাজিক function বা প্রয়োজনসিদ্ধি বুঝায়,—সমাজদেহের এক একটী চিরনির্দ্দিষ্ট পৃথগ্‌ভাগ বুঝায় না। প্রাচীনযুগে এই সমস্ত প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য সমাজকে চারিটী পৃথক্ পৃথক্ স্তরে ভাগ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল বলিয়াই যে ঐ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়ন্তর নাই, তাহা নহে। আবার এককালে প্রত্যেক বর্ণের বৃত্তিকে বংশানুক্রমে প্রচলিত করায় উৎকৃষ্ট ফল পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া, সর্ব্বকালেই যে ঐ একটীমাত্র নিয়ম রক্ষা করিয়া যাইলেই সর্ব্বাপেক্ষা সুফল পাওয়া যাইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। মূল প্রয়োজনের অনুকূলে ও পোষকতায় সমাজের অন্যান্য প্রয়োজন যে কালে যে ভাবে সুসিদ্ধ করা যায়, সেইরূপ ব্যবস্থা দেওয়াই সমাজের অক্ষুণ্ণ জীবনীশক্তির লক্ষণ।

ভারতীয় সমাজের ইতিহাসে ত্রেতাযুগেই এক গভীর সমস্যার উদয় হইয়াছিল। যথাক্ষেত্রে বল ও বিক্রম প্রকাশ, এবং সমাজের সকল অঙ্গের স্বধর্ম্মপালনে সুবিধাবিধান ও বিঘ্নাপসারণ প্রভৃতি মহৎ কর্ত্তব্যই ক্ষত্রিয়ের ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্ম ছিল। এইরূপ স্বধর্ম্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্য ও প্রভুত্ব সংযুক্ত থাকা স্বাভাবিক; অথচ সমাজের লক্ষ্য ও প্রকৃতি অনুসারে উহার নিয়ন্তৃত্ব ত্যাগী ব্রহ্মসাধকের হস্তেই রক্ষিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ঐশ্বর্য্য-ভোগ ও প্রভুত্বের মধ্যে একটা উন্মাদনা নিহিত আছে, যাহা দ্বারা অভিমান ও দর্পের উদ্ভব হইয়া মানুষের বুদ্ধিকে বিকৃত করিয়া দেয়। সেইজন্য ত্রেতাযুগেই দেখা যাইতেছে, ক্ষত্রিয়রাজার

ঐরূপ বুদ্ধিবিভ্রম ঘটিয়া প্রাচীন সমাজের ভিত্তিকে বিপন্ন করিয়াছে। সেই পুরাকালে ক্ষত্রিয়গণ সমৃদ্ধি লাভ করিয়া নিজ প্রভুত্বের সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল, এবং সমাজের নিয়ন্তৃপদভাগী ঋষিদিগকে অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চন্দ্রবংশীয় কার্ত্তবীর্য্য ও পুরুবংশীয় বিশ্বামিত্র ঐরূপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তস্থল। প্রধান প্রধান রাজবংশে যখন ঐরূপ ভাব, তখন বেশ অনুমান হয়, অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণও বিকৃতবুদ্ধি হইয়াছিল। বাস্তবিকই বশিষ্ঠ বা ভৃগুর মত মহর্ষি-গণের আশ্রমও যখন ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবলে বিপন্ন হইতে পারে, তখন সমাজের কি গভীর সঙ্কটাবস্থা তাহা অনুমান করা যায়। যে বাহুবলের দর্পে ক্ষত্রিয়গণ সেইকালে সমাজে ব্রহ্মজ্ঞের সনাতন নিয়ন্তৃত্ব বিলোপ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সেই বাহুবল আশ্রয় করিয়া ভগবান্ পরশুরাম অবতীর্ণ হইলেন এবং উদ্ধত ক্ষাত্র-বলকে বিনষ্ট করিয়া সমাজকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। তারপর ঋষিনির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মকক্ষে আবার ক্ষত্রিয়শক্তির পুনরুদ্ভব হইল। ত্রেতার শেষভাগে সেই ক্ষত্রিয়শক্তিকে শ্রীরামচন্দ্রে যথাযুক্তভাবে উৎকর্ষ ও পরিণতি লাভ করিতে দেখা যায়।

কিন্তু দ্বাপরযুগের শেষভাগে ঐ ক্ষত্রিয়সমস্যাকে পুনর্ব্বার ভীষণ আকার ধারণ করিতে দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রে যে ঐ সমস্যার ভঞ্জন হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এখন বিচার করিতে হইবে যে, আমাদের সমাজে বারম্বার ঐরূপ সমস্যা যে দেখা দেয় তাহার কোনও আমূল প্রতীকার আছে কি না।

আমরা দেখিয়াছি, ভারতীয় প্রাচীন সমাজের বিশেষ একটী প্রয়োজন পূরণের জন্য ক্ষত্রিয়শক্তি আবশ্যক হইয়াছিল। সে

প্রয়োজন তিন ভাগে বিভক্ত ;—প্রথম, বহিঃশত্রু হইতে সমাজকে রক্ষা করা ; দ্বিতীয়, সমাজের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা ; তৃতীয়, সমাজে সকলের স্বধর্ম্মপালনে অভিভাবকতার কার্য্য করা। যে প্রয়োজনসিদ্ধি ব্রাহ্মণের উপর নির্ভর করিয়াছে, তাহা মুখ্য হইলেও, এই তিনটী প্রয়োজনের পূরণ অবশ্যকর্ত্তব্য। মনু সেইজন্য বলিয়াছেন :—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃধ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্ম ক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥"

—অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের শ্রীবৃদ্ধি নাই, আবার ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই ; অতএব উভয়ে একত্র মিলিত হইলেই ইহপরলোকে উভয়েরই শ্রীবৃদ্ধি। এইরূপে ক্ষত্রিয়শক্তি সমাজের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য্য হইলেও, রাজসম্পদের মূলে একটী বিপদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। আমাদের সমাজ যদি পরমার্থ-সাধনারূপ মূলপ্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া গঠিত না হইত, তাহা হইলে ক্ষাত্রৈশ্বর্য্যসম্ভূত বিপদের অস্তিত্ব থাকিত না। পৃথিবীর অপর কোনও সমাজে এরূপ বিপদের কথা শুনা যায় না। কিন্তু কথা এই যে, এই চিরন্তন বিপদাশঙ্কার কি কোনও প্রতীকার নাই ?

প্রতীকার খুঁজিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, যে প্রয়োজনের পূরণে ক্ষত্রিয় রাজার আবশ্যকতা, সে প্রয়োজনের পূরণার্থ অন্য কোনও ব্যবস্থা হয় কি না। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রয়োজন ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ কাজের আবার দুইটী দিক্ আছে,—যথা, নিয়োগ ও সম্পাদন—(deliberative and executive)। আধুনিক জগতের ইতিবৃত্তে আমরা দেখিতে পাই যে, রাজশক্তিকে সমাজের সকল অঙ্গ বা ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া সম্ভবপর

হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থার নাম সাধারণতন্ত্রতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ভাবটী যদি প্রাচীন ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্যমদজনিত সামাজিক সঙ্কটের একটা প্রতীকার পাওয়া যাইত। সে সময় সমাজভুক্ত জনসাধারণ যদি যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিত, তবে যে প্রয়োজন-পূরণে ক্ষত্রিয়কে প্রভুত্ব অর্পিত হইত, সেই প্রয়োজনপূরণে নিয়োগের ভারটী সেই সুযোগ্য জনসাধারণ অধিকার করিতে পারিত, এবং কেবল সম্পাদনের ভাগই ক্ষত্রিয়ের হস্তে সংন্যস্ত থাকিত। সমাজের শীর্ষস্থানীয় নিয়ন্তা ঋষি যদি এইরূপে একটা সুযোগ্য দায়িত্বাভিজ্ঞ জনসাধারণকে ক্ষত্রিয়ের সহিত ভাগাভাগি করিয়া সমাজের কাজে লাগাইতে পারিতেন, তবে সম্পদগর্ব্বে গর্ব্বিত ক্ষত্রিয় কোনক্রমেই হাত-ছাড়া হইয়া যাইতে পারিত না। কিন্তু সেই প্রাচীন সমাজে এরূপ ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। তখন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট ছিল। সেই ব্যবধান সত্বে 'পব্লিক' (public) বলিলে যে সার্ব্বজনীন ভাব বুঝায়, তাহার সঞ্চার বা বিকাশ সম্ভব নহে; আবার গায়ের জোরে সেই ব্যবধান ঘুচাইয়া দিলে, সমাজের আদর্শরক্ষক উচ্চ-শ্রেণীকেই হীনদশায় পরিণত করা হয়, নিম্নশ্রেণীকে অভিপ্রায়ানুরূপ মহত্বে মণ্ডিত করা হয় না।

কাজেকাজেই পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ সামাজিক প্রয়োজনের স্থানভাগী ক্ষত্রিয়বলকে মাঝে মাঝে যথাসময়ে খর্ব্বিত করা ভিন্ন প্রাচীন সমাজের পক্ষে উপায়ান্তর ছিল না। ঐরূপ ক্ষত্রিয়শক্তির দমনের শেষ অভিনয় আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দেখিতে পাই।

ভারতের সাধনা।

কুরুক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের যেন একটা প্রকাণ্ড অধ্যায় সমাপ্ত হইল। তার পর আমাদের প্রাচীন সমাজের পরিণাম অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে ইতিহাসের দৃষ্টিগোচর। এই সময় স্পষ্ট অনুমান হয় যে, আর্য্য শব্দটা ঋষিপ্রবর্ত্তিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। সত্যযুগে দেব ও অসুর বলিলে যে রকম প্রভেদ বুঝাইত, কলিযুগের কিছু পূর্ব্বে ও পরে আর্য্য ও অনার্য্য বা ম্লেচ্ছ শব্দের দ্বারা সেইরূপ একটা প্রভেদ বুঝাইত। গীতায় "অনার্য্যজুষ্টং" শব্দের মত আর্য্য শব্দের ঐরূপ অর্থগত ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের পর আর্য্যসমাজের অবস্থা কি ?—অবস্থা তীব্র-উৎপাতহীনও বটে, আবার ঘোর সমস্যাসঙ্কুলও বটে। কুরু-ক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে যে বিরাট্ ক্ষাত্রবল বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সেই যুগে বসুন্ধরা ক্ষাত্রপ্রতাপবিহীনা। সেই জন্য যুদ্ধঘটিত প্রবল উৎপাত হইতে আর্য্যসমাজ অনেক কাল নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়হীন হওয়া আর্য্যসমাজের পক্ষে সহজ দুর্ভাগ্য নহে, আমরা উদ্ধৃত মনুবাক্য হইতে তাহা দেখিয়াছি। বাস্তবিকই ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অভাবে আর্য্যসমাজের ক্রমেই রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু রূপান্তর ঘটিলেও কোন ক্ষতি নাই, যদি সমাজের মূল উদ্দেশ্য বজায় থাকে,—যদি সমাজের প্রাণ বা সূক্ষ্মসত্তাটী আপনার মহত্ব ও বিশেষত্ব রক্ষা করে।

কুরুক্ষেত্রের পরও আর্য্য সমাজের জীবনধারা অনবচ্ছিন্নভাবে যে বহিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বেদগুপ্তি। আর্য্যসমাজ কি ভাবে, কি আদর্শে, কি প্রণালীতে, কোন্ পথে চলিবে, তাহা

বেদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। বেদোক্ত সাধনা আর্য্যসমাজ বিস্মৃত হইল না বটে, কিন্তু সে সাধনযোগ্য সাধক কোথায়? মনু বলিয়াছেন ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সমাজে অথচ প্রকৃত ক্ষত্রিয় ত নাই-ই, তা ছাড়া অনার্য্যজাতি চারিদিক্ হইতে সমাজের দ্বারে করাঘাত করিতেছে। পূর্ব্বে প্রতাপান্বিত ক্ষত্রিয়ের সাহায্যে অনার্য্যকে যথাসম্ভব ধীরভাবে ও প্রতিহতগতিতে সমাজের একপাশে স্থান দেওয়া হইত; তখন অনার্য্যকে আর্য্যীকৃত করিবার যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তাহাও সমাজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। কিন্তু সমাজে যখন ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপ্ত, তখন অনার্য্যের অভিসর্পণ প্রতিহত করিবার শক্তি সমাজের নাই। অরণ্যাশ্রমবাসী ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত ঘনিষ্টভাবে অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রবিধানের দ্বারা ব্যবধান রক্ষা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও, সমাজপ্রাঙ্গণে অনার্য্য আপনার স্থান যোগাড় করিয়া লইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রবৃত্তিমূলক হীনাদর্শ সমাজকে রূপান্তরিত করিতে লাগিল। সমাজের আবহাওয়া বদলাইয়া গেল এবং যজমানের প্রভাব যাজককেও সংক্রামিত করিল। সমাজ কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডের আশ্রয়ে আপনার বেদমূলকতা রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মবিদ্যা সমাজের সহিত সংযোগ হারাইয়া অরণ্যে সন্ন্যাসের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড ঋষির জীবনে সমন্বিত হইয়াছিল, কিন্তু সূত্রস্মৃতিরযুগে ক্রমশঃ আর্যজীবনের আদর্শ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। 'সারন্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ';—সংসারী ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডের যাজনা করিতে লাগিল, সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞের

আদর্শ রক্ষা করিতে লাগিল। গৃহস্থকে সংসার আপনার চক্রে জড়াইয়া লইবেই। অতএব এই যুগে সন্ন্যাসের অভ্যুদয়ে আর্য্য-সমাজ একটী বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইল। কিন্তু এ যুগের সন্ন্যাস সমাজ হইতে অধিকাংশ স্থলেই বিচ্ছিন্ন,—কেবল বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে পঞ্চোপাসনা-প্রচারক সন্ন্যাসীকে নবোদ্ভূত অবৈদিক সমাজসমূহে নূতন বৈদিকতার সঞ্চার করিতে দেখিতে পাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধযুগে সমাজের সহিত সন্ন্যাসের ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপন করেন।

প্রাচীন ক্ষত্রিয়বীর্য্যের অভাবে অনার্য্যসমস্যার উদ্ভব। আর্য্য ও অনার্য্যের সংঘর্ষে সমাজে বৈদিক আদর্শ ম্লান হইয়া যাইতেছে। বেদ সত্যই স্মৃতিতে পরিণত, কারণ বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মজ্ঞ নাই। এমন কি উত্তর-ভারতে সমাজের বাহিরেও যে সেই বেদমূর্ত্তি ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, এমন কথা বুদ্ধাবির্ভাবের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাই না। বৌদ্ধযুগের পরে দাক্ষিণাত্য ও নর্ম্মদার দিক্ হইতে ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসীর প্রকাশ দেখা দিয়াছিল। যাহা হউক বুদ্ধদেব অনার্য্যসমস্যার পূরণ করিলেন। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অনার্য্যের ভিতরে প্রবল ত্যাগের আদর্শ সংক্রামিত করিয়া দিয়া তাহার প্রকৃতিকে আর্য্যসমাজরূপ উচ্চস্তরে উত্থাপিত করিবার জন্য ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব। তারপর আর্য্য ও বৌদ্ধের সংমিশ্রণে একটা নূতন ভারত অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবান্ শঙ্কর বৈদিক ব্রহ্মজ্ঞান আবার সমাজে প্রচার করিলেন। তখন ভারতীয় জনসমষ্টির মধ্যে আবার অন্তর্হিতপ্রায় আর্য্যসমাজ আত্মপ্রকাশ করিল।

মনে সহজেই প্রশ্ন উঠে যে, কুরুক্ষেত্রের পর প্রায় ত্রিশ শতাব্দী

ধরিয়া ভালমন্দ নানারকম পরিণামের মধ্য দিয়া আর্য্যসমাজ যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, তাহার দ্বারা সুফল কি হইল? একটী পুষ্করিণীকে বিশেষ কোন গুণযুক্ত করিবার জন্য যদি তদ্‌গুণসম্পন্ন একখণ্ড দ্রবণযোগ্য পদার্থকে উহার জলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে জলের আধিক্য এবং ঐ পদার্থগত পরমাণুর সূক্ষ্মতা হিসাবে অভিষ্ট ফললাভে বিলম্ব হয়। মনুষ্য জীবনের যে উচ্চ আদর্শ লইয়া বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রথম ঋষিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল, তাহার সহিত ঐরূপ একটী সূক্ষ্মপরমাণু-বিশিষ্ট স্বগুণসংক্রামক পদার্থের তুলনা করা যাইতে পারে। বিশাল, বৈচিত্র্যময়, ভারত-বর্ষের জীবনক্ষেত্রে বৈদিক ঋষিসঙ্ঘ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা কি কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী যুগে, প্রাচীন ব্রাহ্মণপ্রধান আর্য্যসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃই প্রসারতা লাভ করিতেছে না? অবশ্য যদি সেই আদর্শ পরমার্থমূলক না হইয়া ঐহিকতামূলক হইত, তবে আপনাকে সর্ব্বতঃসঞ্চারী করিতে এত বিলম্ব হইত না। তবে এতদিনে কোন্ যুগে ভারতেও নেশন গড়িয়া উঠিত। কিন্তু বিধাতার আশীর্ব্বাদ ভারতের উপর অন্যভাবে বর্ষিত হইয়াছে,—ভারত জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শপ্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাই প্রথম হইতেই ঘোষণা করিয়াছে, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ঋষিপ্রচারিত পরম আদর্শের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ—এই উভয়বিধ কার্য্যের ভারই আর্য্যসমাজের উপর সংন্যস্ত। স্মার্ত্তযুগে সংরক্ষণের কাজেই সমাজ অভিনিবিষ্ট ছিল, কারণ আর্য্য ও অনার্য্যের ব্যবধান তাহার পক্ষে দুরতিক্রম্য ছিল। ভগবান্ বুদ্ধ

ঐশীশক্তির দ্বারা সেই ব্যবধান লোপ করিয়া দেওয়ায় মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে সমাজে সম্প্রসারণের কার্য্য দ্রুত-গতিতে চলিয়াছিল। এইখানে আবার জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ সম্প্রসারণের সাহায্যে কেন ভারতব্যাপী দৃঢ়সম্বদ্ধ নেশন গড়িয়া উঠিল না।

আমরা দেখিয়াছি, সমাজ প্রথম গড়িয়াছিল একটা মূল প্রয়োজনের সাধনায়; সে প্রয়োজন মানবের জন্য ব্রহ্মসাধনারূপ হোমাগ্নি বাঁচাইয়া রাখা। তারপর সংগঠিত সমাজকে রক্ষা করিতে করিতে সেই রক্ষাকার্য্যের জন্যই এমন সমস্ত প্রয়োজন উদ্ভূত হইতে লাগিল, যাহাতে পূর্ব্বকথিত আদর্শের সম্প্রসারণ বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সমাজে আঁটাআঁটি না থাকিলে, নানা অবস্থার মধ্যে আদর্শকে রক্ষা করা যায় না; আবার সমাজে আঁটাআঁটি থাকিলে, আদর্শ যথোপযুক্তভাবে প্রসার লাভ করিতে পায় না। এই উভয় সঙ্কট মিটাইবার উপায় কি? আমরা বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ঐ উপায়ের ইঙ্গিত পাইয়াছি। পাশ্চাত্যে স্থূল ব্যবহারিক প্রয়োজন ধরিয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রধান প্রধান দেশে সেই দেশ-বাসিগণ ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা 'কমিউনিটী' (community) অতিক্রম করিয়াও আর একটী মিলনক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছে। এই মিলনক্ষেত্রের নাম নেশন বা 'ন্যাশান্যালিটী (nationality)। আমরা গত মাঘ মাসে প্রথম প্রবন্ধে উহার স্বরূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, নেশন বলিতে স্বরূপতঃ যাহা বুঝায় তাহার পত্তন ভারতে প্রাচীনকাল হইতেই হইয়া আছে। অতএব যখন আমাদের ইতিহাসের প্রমাণে বেশ

বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের সনাতন সমাজের দ্বারা আদর্শের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ-রূপ উভয়বিধ লক্ষ্য সমভাবে সাধিত হইতেছে না, তখন সমাজাতিক্রমী একটা মিলনক্ষেত্রের ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া তোলা নিতান্ত আবশ্যক। এইরূপ একটা ভারতব্যাপী মিলনক্ষেত্র গড়িবার প্রয়োজন যথাযুক্ত তীব্রভাবে অনুভূত হইত না, যদি মুসলমান ও খ্রীষ্টান আসিয়া আমাদের সমাজের পার্শ্বে ঘর না বাঁধিত। আপন আপন সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভিত্তির উপর, পরমার্থৈকলক্ষ্য হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন সমাজকে অতিক্রম করিয়া, একটা ভারতব্যাপী সম্মিলনক্ষেত্র রচনা করাকেই আমরা নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নাম দিয়াছি।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের যুগে, সমাজ আদর্শের সম্প্রসারণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইলেও, ভারতব্যাপী নেশন গড়িবার সময় আসে নাই। আচার্য্য শঙ্কর সমাজের সনাতন প্রয়োজন ও লক্ষ্যের দিকে সমগ্র ভারতবর্ষকে আকর্ষণ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও সমাজ সে চেষ্টার ফলভাগীমাত্র, সে চেষ্টায় সমব্রতী নহে। সামাজিক পরিণতির পূর্ণতা সেই অবস্থায় উপলক্ষিত হয়, যখন সমষ্টির প্রয়োজন ব্যষ্টিতে নিজ প্রয়োজনরূপে অনুভূত হইতে থাকে,—যখন প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও দায় পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেন। এই অবস্থার সূত্রপাত সমাজপরিণামে একটী মহাসন্ধি-যুগের অবতারণা করে। সেরূপ যুগের অবতারণা আচার্য্য শঙ্করের সময় হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

আমরা দেখিয়াছি, সনাতন সমাজের তিনটী প্রয়োজন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া সাধন করিয়া

আসিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের পর হইতে ঋষির দায়, যাজক সামাজিক ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাজী সন্ন্যাসীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ক্ষত্রিয়ের দায়, যেমন ক্ষেত্র তেমনি ভাবে সাময়িক বন্দোবস্তের দ্বারা পূরিত হইত; ক্ষত্রিয়ের দায়-পূরণার্থ কোনও স্থায়ী পাকা বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। পূর্ব্বে যে ক্ষত্রিয়সমস্যার কথা বলিয়াছি, উহাই ইহার কারণ। ভারতকে সমাক্রান্ত করিয়া ইতিহাসে বারম্বার রাজশক্তির উদ্ভব হইয়াছে। সেই রাজশক্তির দ্বারা কখনও বা আমাদের প্রাচীন সমাজনির্দ্দিষ্ট ক্ষত্রিয়ের দায় পূরিত হইয়াছে, কখনও বা হয় নাই। জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, ব্যক্তিগতভাবে ক্ষত্রিয়শক্তির অভ্যুদয় নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর; আমাদের দেশেও বারম্বার ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের রাজধর্ম্ম যখন বিলুপ্তপ্রায় বা অপ্রতিষ্ঠ, তখন ভারতীয় প্রজা আপনার প্রজাধর্ম্মকে সম্প্রসারিত করিয়া কিরূপে বহুল পরিমাণে দেশের রাজনীতিক প্রয়োজনের পূরণ করিয়া লইত; তাহা রাজনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধে পরে আমরা আলোচনা করিব। সমাজ-নির্দ্দিষ্ট বৈশ্যের দায় অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত থাকিয়াও বাহিরের প্রয়োজন ও সুযোগ হিসাবে আপনা-আপনি বরাবর আত্মপূরণের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত অসহায় হইয়া ঐ দায়ও একপ্রকার লুপ্তপ্রায়।

কিন্তু আবার নবযুগের নূতন বায়ুহিল্লোল অনুভূত হইতেছে। সনাতন সমাজে সমষ্টির বেদনা ব্যষ্টির প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও দায়কে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দায় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যাইতেছে। সমাজের অন্তরে যেমন সমন্বয়ের ভাব

সঞ্চারিত হইয়াছে, বিভিন্ন সমাজের সহিত বিশ্বজনীন সাধনায় সম্মিলিত হইবার আগ্রহও তেমনি সমাজের অন্তরে সমুদিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আভাস পাইলাম, আমাদের সমাজগৃহ, কোন্ নক্সা, কোন্ স্থাপত্য অনুসারে আদিযুগ হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছিল। প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজীর পরামর্শ অনুসারে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য ঐ গৃহনির্ম্মাণের কার্য্য সমাপ্ত করা। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আমাদের সমাজের উৎপত্তি ও পরিণতির কতকগুলি মূলতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া লইলাম; আগামীবারে সামাজিক উন্নতির উপায় সম্বন্ধে বিচার করা যাইবে। এখন আলোচিত মূলতত্ত্বগুলির একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিবদ্ধ করিয়া আমরা আগামী প্রবন্ধের অবতারণায় সুবিধা করিয়া রাখি। যথা :—

১। মানুষের মূল লক্ষণ পরমার্থের হুঁস থাকা। জগতের জন্য সেই মনুষ্যত্বের আদর্শ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে পরমার্থের সম্যক্ সাধনব্যপদেশে মহর্ষিগণ ভারতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

২। পরমার্থের সাধনাদর্শ-রক্ষণরূপ মূল প্রয়োজনের পূরণার্থ ঋষিসমাজকে আরও তিনটী প্রয়োজন স্বীকার করিতে হইয়াছিল। সেই প্রয়োজন-পূরণের উপায়স্বরূপ, ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্রের উদ্ভব।

৩। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয়সমস্যার বারম্বার উদয় এবং স্থায়ীভাবে তৎপূরণে বিফলতা আমরা দেখিয়াছি।

৪। স্মার্ত্তযুগে ঋষিপদবী বিভক্ত হইয়া, সংসারী বেদযাজক ও সন্ন্যাসী পরমার্থসাধকে অনুবর্ত্তন করিল। পরবর্ত্তী যুগে ঘোর অনার্য্যসমস্যা হইতে সনাতন সমাজ ভগবান্ বুদ্ধের কৌশলে রক্ষা পাইল।

৫। পরমার্থের সাধনাদর্শ সম্বন্ধে সমাজের দুইটী কর্ত্তব্য—সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ। আদর্শের সম্যক্ সংরক্ষণার্থে সনাতন সমাজপ্রবাহকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিতে হইবে। অথচ জগতে ঐ আদর্শের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারতান্তর্বর্ত্তী বিভিন্ন সমাজ লইয়া ঐ পারমার্থিক আদর্শের সাধনায় নেশন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। "ভারতের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে সেই মহৎ কর্ত্তব্যেরই নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

৬। সমাজের পূর্ণ পরিণতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই পরিণতির অবস্থায় সমগ্র সমাজের প্রত্যেক প্রয়োজন ও দায় সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি-দ্বারা তাহার নিজের প্রয়োজন ও দায় বলিয়াও অনুভূত হইবে। বিশেষভাবে প্রত্যেক অঙ্গের স্বধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, সাধারণ-ভাবে সকলেরই ঐরূপ প্রয়োজন ও দায়বোধ থাকা সামাজিক পরিণতির চরম লক্ষ্য।

দর্শনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজসংস্কার।

(উদ্বোধন—ভাদ্র, ১৩১৯)

"দেহের জীবনসঞ্চারী রক্তপ্রবাহ যখন শুদ্ধ ও সবল থাকে, তখন কোনও ব্যাধির জীবাণু শরীরে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পরমার্থভাবই আমাদের দেশের পক্ষে সেই জীবনসঞ্চারী রক্তপ্রবাহ। যদি এই প্রবাহ সুস্থ, সবল, শুদ্ধ থাকিয়া অবাধগতিতে বহিতে থাকে, তবে সমস্ত মঙ্গল। যদি এই রক্তপ্রবাহ বিশুদ্ধ থাকে, তবে সামাজিক বল, রাজনৈতিক বল—ঐহিক জীবনের যাহা কিছু দোষ বা ত্রুটি আছে—এমন কি দেশের ঘোর দারিদ্র্য পর্য্যন্ত, নিবারিত হইয়া যাইবে।"*

"কি জীবনব্রত ধারণ করিয়া হিন্দুর ঘরে প্রত্যেক শিশু জন্মগ্রহণ করে? ব্রাহ্মণের জন্মসম্বন্ধে মনুসংহিতায় উক্ত সেই গৌরবের কথা আপনারা বোধ হয় পড়িয়াছেন;—

ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যামভিজায়তে
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে।

"ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে"—কি না, ধর্ম্মের রত্নভাণ্ডার রক্ষা করিবার জন্য। আমি বলি, এই পবিত্র দেশে স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে যে শিশুই জন্মগ্রহণ করুক, তাহার জীবনব্রত এই ধর্ম্মরূপ রত্নভাণ্ডারের সংরক্ষণ। এ ছাড়া জীবনের আর সমস্ত ব্যাপার ঐ প্রধান উদ্দেশ্যেরই সাধনাধীন।"†

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বৌদ্ধাধিকারের পর হইতে সমগ্র ভারতীয় সমাজ বিবর্ত্তনের প্রাচীন মূলসূত্র আবার অবলম্বন করিয়াছে,—বেদভিত্তির উপর আবার ফিরিয়া আসিতেছে। এখন যে সমাজ বেদভিত্তির উপর ফিরিয়া দাঁড়াইতেছে, সে সমাজ সেই

* "ভারতের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক স্বামী বিবেকানন্দের মান্দ্রাজে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

† রামনাদ অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজী প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

বুদ্ধপূর্ব্বযুগের সঙ্কীর্ণ সমাজ নহে। সে সঙ্কীর্ণ আর্য্যসমাজ বৌদ্ধ-বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাহাতে বন্যার জল ঢুকিয়া এক ভারত-ব্যাপী নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাতে শোক করিবার কিছু নাই, কারণ জীবনাদর্শ নষ্ট হয় নাই; যাহা প্রাচীন সমাজের কুক্ষি-গত ছিল, প্রধানতঃ বুদ্ধেরই শক্তিসঞ্চারে, তাহা সমগ্র ভারত-বাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছিয়াছে; অবশ্য উহাকে হয়ত নানা সাজ সাজিতে হইয়াছে,—হয়ত প্রাচীন যুগের সে তীব্র প্রকাশ অনেক স্থানে ম্লান হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আদর্শের প্রত্যক্ষবিকাশে যেটুকু অভাব, তাহাও সাধনলভ্য। অতএব লোকসান অপেক্ষা লাভটাই স্থায়ী; কারণ কোণ-ঠেসা হইয়া লোপ না পাইয়া, প্রাচীন আদর্শ যে বিচিত্রবেশে সমস্ত ক্ষেত্রে আপনার অধিকার বিস্তার করিল এবং নিজ অখণ্ড স্বরূপের পূর্ণবিকাশের দিকে আবার অগ্রসর হইতে পারিল, ইহা সামান্য লাভ নহে।

যাঁহারা কেবল জন্মগত শোণিতের উপরই সামাজিক শুদ্ধতার ভার অর্পণ করেন, তাঁহারা বলিবেন বৌদ্ধবিপ্লবে লোকসানের ভাগই ষোল-আনা, এবং হয়ত তাঁহারা সেই বিপ্লবযুগের সমাজে এমন নেপথ্যের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিবেন, যেখানে ব্রাহ্মণ-শোণিত অতি সংগোপনে আপনাকে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিতে-ছিল। শোণিতোদ্বর্ত্তনের পঞ্চসহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাস সংগ্রহ করিতে পার ত ভালই, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোনও ফল নাই।

শোণিতের বল বেশী, না সংস্কারের? শোণিত সংস্কারকে গড়ে, না সংস্কার শোণিতকে গড়ে? আমাদের দেশে আজকাল সমাজ-নীতির মূলে অলক্ষ্যে ঘোর জড়বাদ প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজসংস্কার।

জড়বাদের ফলে একদিকে যেমন ধর্ম্মে "ছুঁৎমার্গের" প্রচলন হইয়াছে, আর একদিকে তেমনি "আর্য্য-শোণিতের" প্রমাণচেষ্টায় সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের একটী প্রধান দার্শনিক-তত্ত্ব এই যে, সংস্কারই জগৎভ্রম সৃষ্টি করে, সে দেশের আচার ও সমাজতত্ত্ব যে জড়বাদের দ্বারা এমন দৃঢ়ভাবে শৃঙ্খলিত হইবে, তাহা অধঃপতনেরই লক্ষণ।

একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, শুদ্ধ সংস্কার পুরুষানুক্রমে অশুদ্ধ-শোণিতকেও শুদ্ধ করে এবং অশুদ্ধ-সংস্কার পুরুষানুক্রমে শুদ্ধ-শোণিতকেও অশুদ্ধ করে। ব্রাহ্মণের রক্ত অশুদ্ধ-ভাবপোষণের দ্বারা কয়েক পুরুষেই হীনবর্ণের রক্তে পরিণত হইতে পারে, আবার হীনবর্ণের রক্তও শুদ্ধ-ভাবপোষণের দ্বারা কয়েক পুরুষে ব্রাহ্মণের রক্তে পরিণত হইতে পারে। এমন কি, শুদ্ধ-সংস্কার এমন তেজীয়ান্ হইতে পারে যে, একজন হীনবর্ণজাত ব্যক্তির দেহশোণিতে একপুরুষেই ব্রাহ্মণত্বের সঞ্চার করিয়া দিতে পারে। ভাবশক্তির এই অমোঘ প্রভাব বিস্মৃত হইয়া জড়শক্তিকে মাথায় তুলিয়াই ত আমাদের সমাজ পথহারা হইয়া ঘুরিতেছে।

জন্মকালে সংস্কার উপযুক্ত শোণিত খুঁজিয়া লইলেও, জীবদ্দশায় সংস্কার শোণিতের উপর কর্ত্তৃত্ব করে ও আপনার উপযোগী করিয়া উহাকে সর্ব্বদাই গড়িয়া লয়। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, ভাব বা সংস্কারের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা অনুসারে শোণিতেরও শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সংক্রামিত হয়।

অতএব পুরুষানুক্রমে কেবল শোণিতের অবিমিশ্রতা প্রমাণ করিলেই উহার শুদ্ধতা প্রমাণিত হয় না। পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে

কাহারও পূর্ব্বপুরুষ উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ছিল বলিয়াই আজও যে তিনি সেইরূপ ব্রাহ্মণত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতে পারেন, তাহার কোনও প্রমান নাই; কারণ সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে শেষে দেহশোণিতও সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যায়। অথবা কেহ যদি প্রাচীন আর্য্যঋষি হইতে এক এক পুরুষ করিয়া দেহরক্তের হিসাব নিকাশ দিতে দিতে বর্ত্তমান কালের দেহরক্তের অবিমিশ্রতা প্রমাণ করিবার অভিপ্রায় পোষণ করিয়া, ইতিহাসের ক্ষেত্রে রামধনুকের জ্যা-বন্ধন খুঁজিয়া বাহির করিবার হাস্যোদ্দীপক উদ্যমের অবতারণা করেন, তবে পূর্ব্বেই জানা ভাল যে, তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই তাঁহার হিসাবে নিষ্ফল হইবে; কারণ, প্রাচীন রক্তে মিশ্রণ না ঘটিলেই যে উহা শুদ্ধ থাকে, তাহা নহে। ভাব বা সংস্কার বিকৃত হইলেই শোণিত বিকৃত হইয়া যায়। আবার ভাব বা সংস্কার উৎকর্ষ লাভ করিলেই শোণিত উৎকর্ষ লাভ করে।

অতএব বৌদ্ধবিপ্লবের অবসানে যে বিশাল সমাজ বেদভিত্তির উপর ফিরিয়া আসিল, সে সমাজে আর্য্যশোণিতের শুদ্ধতা কি পরিমাণে ছিল তাহা বুঝিতে হইলে, কোন্ ক্ষেত্রে প্রাচীন আর্য্য-ভাব কতদূর অবিকৃত অবস্থায় পুনরাবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিচার করিলেই চলিবে,—রক্তসংমিশ্রণের অভাব বা অস্তিত্বের প্রমাণসংগ্রহে কেবলই 'বন্যহংসীর পশ্চাদ্ধাবন' (wild-goose-chase) করিয়া কোনও ফল নাই। ঐতিহাসিক-লুপ্ত-পত্রের যতই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, ততই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতীয় সমাজে জাতিসংমিশ্রণ ও ভাবসংমিশ্রণের স্রোত নানা স্থানে বারম্বার অবাধগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে,—শাস্ত্রবিধান

উহাকে বাধা দিতে পারে নাই। আবার প্রাচীন স্মার্ত্তযুগের যে সামাজিক আভিজাত্য অধিকাংশ স্থলে ব্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, পরবর্ত্তী কালে চারিদিকেই নূতন নূতন রাজার বারম্বার উত্থানপতনের ভিতর দিয়া সেই আভিজাত্য, প্রতিনিয়তই রাজ-শক্তি ও ব্রাহ্মণের মধ্যে অল্পাধিক বণ্টনের দ্বারা, সমাজে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, কত শবর ও শক এইরূপে আভিজাত্য লাভ করিয়া সমাজের অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, তাহা এখন আর খুঁজিয়া বাহির করা যায় না। * সমাজের যে ভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রাধান্য নাই, বৌদ্ধশ্রমণ গৃহী হইয়া যখন সেই ভাগে প্রবিষ্ট হইত, তখন ব্রাহ্মণের আভিজাত্য অধিকার করিত। সামাজিক আভিজাত্যের প্রাচীন গণ্ডী এইরূপে বৌদ্ধযুগে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানে প্রাচীন ইতিহাস হইতে আভিজাত্যের নজির খুঁজিবার যে তুমুল উদ্যোগ চলিয়াছে, তাহার সুফল এই যে, লুপ্ত ইতিবৃত্তের উদ্ধার হইতে থাকিবে, কিন্তু তাহার কুফল এই যে, শুদ্ধ-ভাবপোষণ অপেক্ষা অবিমিশ্র শোণিতের উপর লোকের দৃষ্টি অধিক আবদ্ধ থাকাতে, অধঃপতনের অন্ধকারকে আরও আঁকড়াইয়া ধরা হইবে!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বৌদ্ধযুগের অবসানে ধর্ম্মে ও সমাজে আবার প্রাচীন ভাবসূত্র অবলম্বনের প্রগাঢ় চেষ্টা চলিয়াছে। বৌদ্ধযুগে যখন মানুষের স্বভাবের সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মসাধনার আপোষ ঘটিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় হইতে মানুষের অনেক স্থূল এবং

* কনিষ্ক ও চষ্টনের বংশধরগণ, অথবা উড়িষ্যার গুপ্তরাজগণ এসম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্থল।

দৈহিক সংস্কার ধর্ম্মসাধনার উপকরণের স্থানে প্রবেশলাভ করিল। এই সমস্ত স্থূল সংস্কারের উপাদান যে সবই ভারতীয় অনার্য্য বা হীন জাতিদিগের সহিত যৌতুকরূপে বৌদ্ধসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা নহে। এরূপ যৌতুক ভারতেতর দেশ হইতেও বৌদ্ধসমাজে আনীত হইয়াছিল। মনে করুন, খ্রীষ্টের পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বেও, এমন কি প্রাচীনতন্ত্রের বাইবেলে, উপাস্যের মূর্ত্তি গড়ার ঘটা যেরূপ পড়া যায়, তদানীন্তন ভারতীয় স্মৃতিতে সে ঘটা একেবারেই নাই। ভারতে স্থায়ী মন্দিরে মূর্ত্তি গড়ার ঘটাটা যে আমদানির মাল, তাহাতে সন্দেহ কি ?

কিন্তু বৌদ্ধযুগের অবসানে ঐ সমস্ত হীন সংস্কারমূলক সাধনাঙ্গকে ছাঁটিয়া বাদ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। স্বভাবের ও সংস্কারের বহুলবৈচিত্র্যে সমাজ ভরিয়া গিয়াছে, তখন কাহাকে রাখিয়া কাহাকেই বা বাদ দেওয়া যায়। বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে সমস্যা খুবই "সঙ্গীন" হইয়া উঠিয়াছিল,—এবং বাঙ্গালাদেশেই সমন্বয়-চেষ্টার পূর্ণ আবির্ভাব। বুদ্ধপূর্ব্বযুগে পঞ্চোপাসনা (সৌর, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ও গাণপত্য) অভিব্যক্ত হইয়াছিল। বুদ্ধপূর্ব্বযুগে এই পঞ্চোপাসনামূলক উপনিষদেরও প্রচার ছিল। এই হিসাবে উহাকে বৈদিক বলা যায়। নবসৃষ্ট ভারতব্যাপী সমাজকে যাহারা বেদ-ভিত্তির উপর পুনরানয়নে সহায়তা করিয়াছেন, তাহারা প্রাচীন পঞ্চোপাসনার ধারায় বৌদ্ধযুগের হীনসংস্কারমূলক সাধন-ধারাগুলি অল্পে অল্পে মিশাইয়া দিয়াছেন। আবার ইহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের মত বেদমর্ম্মজ্ঞতা যাঁহাদের ছিল, তাঁহারা পঞ্চোপসনার ধারাকে অদ্বৈত-সাগর-সঙ্গমে সমন্বিত করিতে পারিতেন ; ফলে

পঞ্চোপাসনার দ্বারা স্থূল ও হীন সাধনাঙ্গগুলি নানা সাধনপদ্ধতি ও সাধনক্রমের মধ্য দিয়া শোধিত হওয়ায় এবং পঞ্চোপাসনাকে বেদের চরম আদর্শের সহিত সমন্বিত করায়, সনাতন ধর্ম্মের একটা অখণ্ড মূর্ত্তি বৌদ্ধযুগের পর হইতেই প্রকাশোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল।

ধর্ম্মসাধনায় যেমন বেদমূলকতার ক্রমবিকাশ ঘটিতেছিল, সামাজিক আচার-রীতির মধ্যে বৈদিকতা সঞ্চার করিবার উদ্যোগও সেইরূপ দেশের সর্ব্বত্র নূতন উৎসাহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই উদ্যোগের মূলে আর একটা প্রয়োজনের প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল। সমাজে ধর্ম্মের নানা মত ও সাধনার সমাবেশ চলিতে থাকায়, এবং মতানুসারে আচারের বৈচিত্র্যও অবাধে চলিতে থাকায়, এমন একটা সাধারণ লক্ষণ বিকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িতেছিল, যাহা সমাজকে এক রকম ছাঁচে ফেলিয়া উহার বিশেষত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিবে। এ সাধারণ লক্ষণ বৈদিকতা ভিন্ন আর কি হইবে? অতএব সমাজে বৈদিকতার সঞ্চার করিবার একটা বিষম তাড়া অনুভূত হইয়াছিল।

বাঙ্গালাদেশে এই তাড়া, এই উদ্যোগের পরিপক্ক ফল—নব্য-স্মৃতি। নব্যস্মৃতির দ্বারা একসময় বঙ্গে যে কি গভীর কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না। চলিত কথায় যাহাকে আঁট বলে, সেই নিষ্ঠার ভাব বাঙ্গালীর স্বভাবে জাগ্রত করা এক সময় বড়ই দরকার হইয়াছিল। সেই প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই বঙ্গদেশ নানা ধর্ম্মবিপ্লব ও ধর্ম্ম-বৈচিত্র্যের কেন্দ্ররূপে পরিণত হওয়ায়, আচারশৈথিল্য বাঙ্গালীস্বভাবের একটা লক্ষণ হইয়া গিয়াছিল। সেই বাঙ্গালীর স্বভাবে একটা "আঁট" জাগাইয়া

রাথার পক্ষে নব্যস্মৃতি, এমন কি কৌলীন্য প্রথাও প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল। যাহার স্বভাবে "আঁট" নাই, সে কোন কর্ম্মেই অধ্যবসায় ও একনিষ্ঠতার ভাব আনিতে পারে না। তাহার ভবিষ্যৎ চিরতমসাচ্ছন্ন।

কিন্তু নব্যস্মৃতি প্রাচীন স্মৃতির ছাঁচে ঢালা; প্রাচীন স্মৃতির ছাঁচ সাময়িক ও অস্থায়ী প্রয়োজনের দ্বারা গঠিত; অতএব সমাজ নব্যস্মৃতিকে নিতান্ত অস্থায়ী ভাবেই কাযে লাগাইতে পারে। যে বেদ-আখ্যা এতদিন বঙ্গের সাধারণ লোক নব্যস্মৃতির ঘাড়ে চাপাইয়া আসিয়াছে, সেই বেদ-আখ্যার প্রকৃত প্রয়োগপাত্র এইবার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। নব্যস্মৃতি ত বেদ নহেই, উহা প্রাচীন স্মৃতির প্রতিধ্বনিমাত্র; আবার প্রাচীন স্মৃতিও বেদ নহে, উহা বেদগুপ্তির একটা সাময়িক কৌশলমাত্র। নানা জাতিসংঘর্ষের বিশৃঙ্খলার মধ্যে সমাজে বৈদিক ভাব ও আদর্শ রক্ষা করিবার চেষ্টায় প্রাচীন স্মৃত্যুক্ত আচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, আর্য্য-সমাজের মূল প্রয়োজন—বেদোক্ত পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচার। ইহার মধ্যে স্মার্ত্তযুগে সংরক্ষণকেই শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল। সে যুগে বেদ ও ব্রাহ্মণের দ্বারা এই সংরক্ষণের কার্য্যকে পূরাদমে বজায় রাখিবার জন্য আর্য্যসমাজ অদ্ভুত উত্তম প্রকাশ করিয়াছিল। ঐরূপ উত্তমের ঝোঁকে সামাজিক কঠোর শ্রেণী-ভেদ প্রভৃতি নানা অযথা বিধান যদি ঐ যুগের শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে, তবে সাময়িক প্রয়োজন স্বীকার করিয়া লইয়া আমাদিগকে সে সমস্ত ত্রুটি এখন উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু

প্রাচীন স্মৃতি যে সশঙ্কিত, তীক্ষ্ণ সংরক্ষণ-দৃষ্টিই কেবল প্রয়োগ করিয়াছিল, নব্যস্মৃতির পক্ষে কেবলমাত্র সেরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। অথচ বর্ণভেদ ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে প্রাচীন-স্মৃতির ছাঁচ গ্রহণ করিতে যাইয়া নব্যস্মৃতি নিতান্তই একটা অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বেদই সর্ব্বদা স্মৃতির মূল। এক যুগের স্মৃতির মূল আর এক যুগের স্মৃতি হইতে পারে না। এক যুগের স্মৃতির সহিত আর এক যুগের স্মৃতির যে সংযোগ—তাহা ইতিহাসমূলক হইতে পারে, কিন্তু প্রমাণমূলক হওয়া সমীচীন নহে। বেদই স্মৃতির নিত্য প্রমাণ। অতএব বর্ত্তমান যুগে কালানুগামিনী স্মৃতির উদ্ধার করিতে হইলে, বর্ত্তমান যুগে বেদের যে প্রকাশ আমাদের পক্ষে সম্ভাবিত হইয়াছে, আমাদিগকে তাহাই আশ্রয় করিতে হইবে। যে পরিমাণে সেই প্রকাশকে আমরা জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিব, সেই পরিমাণে স্মৃত্যুদ্ভাবনী দৃষ্টি আমরা লাভ করিতে পারিব। এইরূপ দৃষ্টির প্রয়োগে কালোপযোগী সামাজিক বিধান সৃষ্টি করাকেই প্রকৃত ‘সমাজ-সংস্কার’ বলে।

চৈত্র মাসের “ভারতের সাধনায়” আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের নিতান্ত ব্রহ্মজ্ঞান বা পরমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত; এই পরমজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ বেদমূর্ত্তি অবতারপুরুষের আবির্ভাব হয়। বেদোক্ত পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচার কেন্দ্রীভূত ও ঘনীভূত আকারে এই অবতারপুরুষের মধ্যে প্রতিভাত হয়। বৌদ্ধযুগের পর হইতে, বিবিধ অঙ্গের পরিপোষণ ও আংশিক সমন্বয়চেষ্টার মধ্য দিয়া বেদমূলক সনাতন ধর্ম্মের যে অখণ্ড মূর্ত্তি

বিকাশোন্মুখ হইয়া আসিতেছিল, তাহা বর্ত্তমান যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণে পূর্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। "সতত-বিবদমান, আপাত-দৃষ্টে বহুধাবিভক্ত, সর্ব্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীয় ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীয় ঘৃণাস্পদ, হিন্দুধর্ম্মনামক যুগযুগান্তর-ব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্ব্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।" দেশের পক্ষে এই নবজীবনের বারতা ঘোষণা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বর্ত্তমান যুগে সমাজগতির কেন্দ্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে শক্তিতে আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতি সম্ভাবিত, সে শক্তির কেন্দ্র বর্ত্তমান যুগে প্রকটিত হইয়াছে। এখন এই শক্তিকেন্দ্র হইতে বিস্ফুরিত প্রেরণা কিরূপে সমাজে সঞ্চারিত হইবে এবং তাহার ফলে সমাজ কিরূপে কালোচিত পরিণামের পথে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইবে, তাহাই আমাদের পক্ষে আলোচ্য।

প্রথমতঃ বর্ত্তমান যুগের একটী প্রধান লক্ষণ বা বিশেষত্ব আমা-দিগকে স্মরণে রাখিতে হইবে। আমরা এ পর্য্যন্ত ইতিহাস আলো-চনার ফলে বুঝিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে ভারতীয় সনাতন জীবনাদর্শের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী কালে অগণ্য-ঘটনা-পরম্পরার ভিতর দিয়া সেই জীবনাদর্শের ক্রম-সঙ্কোচ ঘটিয়াছে, এইবার বর্ত্তমান যুগ হইতে সেই জীবনাদর্শকে আত্ম-স্মৃতিসম্পন্ন হইয়া আধুনিক নূতন জগৎকর্ম্মক্ষেত্রে পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠার

দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ব্বকল্পসিদ্ধ ঋষির মন্ত্রদ্রষ্টৃত্বে উহার জন্মগ্রহণ, বিচিত্র প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ-ব্যষ্টির পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবে উহার স্বকক্ষাধিকার, এবং বর্ত্তমান যুগে নবোদীয়মানা সমষ্টি-শক্তির সাহায্যে উহার পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা। এতাবৎকাল বিচিত্র ব্যষ্টিশক্তিকে বারম্বার অবলম্বন করিয়া যে সনাতন জীবনাদর্শ নির্দ্দিষ্ট অভিনয়ক্ষেত্রে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া লইয়াছে, এইবার সমষ্টি-শক্তির জ্ঞাতসারে, উহাকেই অবলম্বন করিয়া, সেই জীবনাদর্শ জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবে।

অতএব বর্ত্তমান যুগে কালের যে আহ্বানভেরী ধ্বনিত হইতেছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে তাহা কখনও শ্রুত হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে সমাজের মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনাদির সাধনায় জ্ঞাতসারে ও সমবেতভাবে সকলকে ব্রতী হইতে হয় নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে ও সমাজে সমষ্টিশক্তির উদ্বোধন হইতেছে। সমগ্র দেশ ও সমাজের প্রয়োজনকে প্রত্যেকে আপনার প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে শিখিতেছে। কোন সামাজিক প্রয়োজনকেই এখন আর একটা শ্রেণীগত গণ্ডীর ভিতর নিতান্ত বিশ্লিষ্টভাবে আত্মপোষণ করিয়া যাইতে হইবে না। বিশেষতঃ আমাদের সমাজের যাহা মূল প্রয়োজন, তাহাকে প্রত্যেকেরই জীবনের মূল প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে শিখিতে হইবে। সেইজন্য আচার্য্য বিবেকানন্দ বর্ণবিশেষসম্বন্ধীয় মনুসংহিতার উক্তিকে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করিয়া তাহার প্রধান জীবনব্রতের নির্দ্দেশ করিতেছেন (প্রবন্ধশীর্ষে দ্বিতীয় উদ্ধৃতবাক্য)।

প্রকৃত সমাজসংস্কারের দ্বারা সমাজকে কালোচিত পরিণামের

পথে অগ্রসর হইতে হইলে, বেদের নবযুগপ্রবর্ত্তক প্রকাশের আশ্রয় লইতে হইবে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। বেদোক্ত পরমার্থের অথবা সনাতনধর্ম্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই যে ঐ প্রকাশের স্বরূপ, তাহাও আমরা দেখিয়াছি; আবার পূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঐ সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই ভারতীয় সমাজের মূল প্রয়োজন। অতএব সিদ্ধান্ত দাঁড়াইতেছে এই যে, সমাজসংস্কারের অথবা সমাজকে যুগোচিত পরিণামের পথে চালাইবার প্রকৃত অধিকারী হইতে হইলে, আমাদিগকে প্রথমেই সমাজের মূল প্রয়োজনের সাধনায় সমবেতভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে হইবে। যে প্রয়োজনের প্রেরণায় আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতি, আমাদিগকে সেই মূল প্রয়োজনের পূরণ হইতে উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিতে হইবে। সমাজে এই মূল প্রয়োজনের যথাযথ পূরণ না হইতে থাকিলে, সমাজে প্রাণশক্তি জাগিবে না, সম্যক্ দৃষ্টি খুলিবে না, পথনির্দ্দেশ হইবে না। ত্রৈরাশিক অঙ্কের মত কাগজে-কলমে কষিয়া সমাজসংস্কারের বিধান বাহির করিতে হয় না। কলম ঠুকিয়া এত বড় একটী প্রাচীন সমাজের উপর বিধান চালান যায় না। যে প্রয়োজন, যে শক্তির লীলায় আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতি, হে সমাজসংস্কারক, তুমি কি তাহাকে আপনার মধ্যে লাভ করিয়াছ? যে গভীর প্রেরণাশক্তিতে অসংখ্য পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সহস্র সহস্র বৎসর এই বিপুল সমাজ আপনার গতি সামলাইয়া লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই প্রেরণাশক্তি কি তুমি অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আপনাকে উহার যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়াছ? যে সনাতন প্রয়োজনের সাধনায় এই সমাজ বিবর্ত্তিত

হইয়া আসিতেছে, তোমার নিজ জীবন কি সেই প্রয়োজনের নিকট অনন্যভাবে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে? এ সমস্ত যদি না হইয়া থাকে তবে পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ট বুদ্ধি ও দৃষ্টির দোহাই দিয়া সমাজ-সংস্কারক সাজিতে যাইও না। সে দৃষ্টি ও বুদ্ধির সাহায্যে নিজের পথ নিজে করিয়া লও তত ক্ষতি নাই,—সমাজের ঘাড়ে উহাদিগকে জোর করিয়া চাপাইতে যাইও না।

অতএব প্রকৃত সমাজসংস্কারের সূত্রপাত সমাজকে উহার মূল প্রয়োজনের সাধনায় উদ্বোধিত ও প্রবৃত্ত করায়। সমাজের প্রত্যেককে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, সনাতন ধর্ম্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য সে জন্মাবধি দায়ী। সমাজে প্রত্যেকের মধ্যে এই দায়িত্ববোধ সঞ্চারিত হইলে, সমাজে নূতন যুগ প্রকটিত হইবে। এই তীব্র দায়িত্ববোধ হইতে সমাজে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, জীবনের গতি, সমস্তই নিয়মিত হইতে আরম্ভ হইবে। সমাজের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত, কক্ষচ্যুত, পরস্পর অসম্বদ্ধ, শক্তিরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া সমাজকে নবজীবনে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একই তীব্র দায়িত্ববোধের অভাবে, আমাদের জীবনীশক্তি নানা ক্ষণস্থায়িনী উত্তেজনার বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতেছে। আর কেন, হে স্বদেশবাসি, ইতিহাসের ইঙ্গিত, কালের শুভাহ্বান, একবার স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর; আর কত দিন আপনাদের সনাতন, সুমহৎ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে বিক্ষিপ্ত খণ্ডচেষ্টার বিফল অভিনয়ে, অমূল্য সময় হেলায় হারাইবে? মানুষের যাহা পরম অর্থ, তাহার সাধনদায়িত্ব আবহমানকাল হইতে তোমাদের উপর অর্পিত;

সে দায়িত্বের পূরণে সমবেত চেষ্টায় চেষ্টিত ও উদ্বোধিত না হইলে, কোনও ক্ষুদ্রতর প্রয়োজন ও স্বার্থের পূরণোপায় তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। অতএব বৃথা কালক্ষেপ ও শক্তিক্ষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, তোমার চিরন্তন দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য বিধাতার আহ্বান আজ ধ্বনিত হইতেছে, স্থিরচিত্তে অবধান কর।

সনাতন ধর্ম্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারের দায়িত্ব সমাজে প্রত্যেক জীবনের মূলে সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইলে, উপযুক্ত শিক্ষার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আগামীবারে এইরূপ শিক্ষার গতি নির্দ্দেশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এখন ঐরূপ দায়িত্ববোধের সঞ্চারে সমাজ কিরূপে উন্নতির প্রকৃত পথে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

কাহারও জন্য তীব্র দায় অনুভব করিয়া, সেই দায়পূরণে আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত না হইলে, প্রকৃত অনুরাগ জন্মে না। আমাদের সমাজে যদি একবার সনাতন ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত অনুরাগ উদ্দীপিত হয়, তবে আর কোন চিন্তা নাই, কোনও আশঙ্কা নাই,—সমাজের ভবিষ্যৎ সুমহৎ কল্যাণে, উজ্জ্বল গৌরবে পূর্ণ হইয়া যাইবে। এ পর্য্যন্ত সনাতন ধর্ম্মের জন্য সমাজে যে উৎসাহ মাঝে মাঝে দেখা যায়, উহা প্রকৃত অনুরাগ নহে; উহার পশ্চাতে অভিনিবেশ নাই, নিষ্ঠা নাই, ত্যাগ নাই। উহা দীনহীনের আত্মগৌরবস্পৃহা, অলসের কৌতুকবিজৃম্ভণ, নিদ্রিতের পার্শ্বপরিবর্ত্তন! তীব্র দায়িত্ববোধ হইতে যখন শুষ্ক সমাজপ্রান্তরে চারিদিকে সকল্লোল কর্ম্মস্রোত উৎসারিত হইবে, তখন প্রকৃত অনুরাগের উদয়ে একনিষ্ঠা ও আত্মোৎসর্গের জ্যোতিতে সমাজ আলোকিত হইয়া উঠিবে।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—সমাজসংস্কার।

সনাতন ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত অনুরাগ যদি কর্ম্মের আশ্রয় হয়, তবে পাশ্চাত্য দেশের মত কর্ম্ম আর ভোগলক্ষ্য হইতে পারিবে না। পাশ্চাত্য দেশে কর্ম্মের অর্থ স্বাধিকার ভোগ (exercise of rights), আমাদের সমাজে কর্ম্মের অর্থ স্বধর্ম্ম-পালন। কর্ম্মের এই প্রকৃতিগত বিশেষত্ব আবহমান কাল আমাদের সমাজকে একটা অনন্যসাধারণ ছাঁচে গড়িয়া দিয়াছে। কর্ম্মের এই বিশেষত্ব রক্ষিত না হইলে, উন্নতি ত দূরের কথা, সমাজের স্থিতি পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া উঠিবে। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা এই বিশেষত্বটুকু অপহরণ করিতেছে। উহাকে—অর্থাৎ পাশ্চাত্য স্বাধিকারভাবের পরিবর্ত্তে স্বধর্ম্মভাবকে—আমাদের সকল কর্ম্মের মূলে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সনাতন ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগকেই কর্ম্মস্রোতের উৎসরূপে সমাজহৃদয়ে উৎসারিত করিতে হইবে। এই উৎস হইতে কর্ম্মপ্লাবন বাহির হইলে, বর্ত্তমান সমাজের বিকৃত ভাব বা 'ভোল' ফিরিয়া যাইবে,—ভারতীয় সনাতন আদর্শের অভ্যুদয় হইয়া সমাজকে প্রকৃত উন্নতির পথে পরিচালিত করিবে।

আর এক কথা,—প্রয়োজনের প্রেরণায় সমাজের পরিণাম ঘটে; আমরা দেখিয়াছি, আমাদের সমাজের উদ্ভব, স্থিতি ও গতির মূলে একটা সনাতন প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে। সমাজজীবনে এমন একটা অখণ্ডতা আছে যে, ঐ মূল প্রয়োজনের সহিত সাক্ষাৎ অঙ্গাঙ্গী-সংযোগ রক্ষা না করিয়া আর কোনও গৌণ প্রয়োজন সমাজে উদ্ভূত হইতে পারে না; যদি কোনও অসম্বন্ধ প্রয়োজন অনুভূত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সে প্রয়োজন অনিষ্টজনক, সে প্রয়োজন কুপ্রয়োজন। সামাজিক প্রয়োজন সমূহের মধ্যে এই

অঙ্গাঙ্গী-সম্বন্ধ বা organic interrelation, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন।

তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত এই যে, নানাবিধ প্রয়োজনরূপ অঙ্গসংহতির মূলে যে প্রাণস্বরূপ একটী ব্যাপক প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে, তাহার সাধনায় সমাজ প্রকৃতভাবে উদ্বোধিত না হইলে, অন্যান্য উন্নতিবিধায়ক বিবিধ প্রয়োজনের যথার্থ অনুভূতিই সমাজে জাগিবে না। আর ঐ সমস্ত প্রয়োজনের যথার্থ অনুভূতি সমাজে না জাগিলে, আর কোনও উপায়ে সমাজকে প্রকৃত পরিণামের পথে চালিত করা যাইবে না,—কাগজে লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া সমাজে উন্নতিমূলক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা যায় না। অতএব সমাজের নানা প্রয়োজন পূরণের জন্য সনাতন আদর্শমূলক প্রকৃত সুব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে সমাজকে মূল প্রয়োজনের সাধনায় উদ্বোধিত হইতে হইবে। পুরাণো গাছের কলম লওয়ার মত প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রভৃতি সুব্যবস্থাকে পুঁথিগত বিদ্যার জোরে সমাজে প্রোথিত করিবার চেষ্টা সফল হইতে পারে না; ঐ সকল ব্যবস্থার মূলে যে প্রয়োজনের প্রেরণা ছিল, মূলপ্রয়োজনের সাধনা হইতে সেইরূপ প্রেরণা যখন সমাজে অনুভূত হইবে, তখন ঐ সকল ব্যবস্থা বা তদনুরূপ ব্যবস্থা আরও গৌরবময় আকার ধারণ করিয়া সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। আরও গৌরবময় কেন,—না অনুদিতপূর্ব্ব সমষ্টিশক্তির ভিত্তি লাভ করায় ঐ সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্য ও লক্ষ্যানুগত্যের সঞ্চার হইবে।

সমাজের মধ্যে সমষ্টিশক্তির উন্মেষে নবযুগের অবতারণা হইতেছে। সনাতন ধর্ম্মের সাধন-সংরক্ষণরূপ দায়িত্বের শিক্ষায় ও

সাধনায় এই সমষ্টিশক্তিকে উদ্বোধিত ও কেন্দ্রীভূত করাই সমাজ-সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। প্রাচীন যুগে ত্রৈবর্ণ্যের উপর সমাজ যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিল, সে দায়িত্ব সনাতনধর্ম্মের সাধন সংরক্ষণমূলক দায়িত্বেরই অন্তর্নিহিত। এই মূল দায়িত্ব হইতেই ত্রৈবর্ণ্যমূলক দায়িত্ব আবার কালোচিত আকার ধারণ করিবে। অতএব বর্ত্তমানে সমাজের প্রত্যেককে নিজ নিজ প্রকৃতি ও সামর্থ্যের অনুসারে ঐ মূল দায়িত্বের গ্রহণ ও পূরণের দ্বারা নিজ জীবনকে গঠিত করিতে হইবে। পালে বায়ু লাগিলে নৌকা যেমন গন্তব্যপথে ছুটিতে থাকে, সমাজে যদি একবার এই তীব্র দায়িত্ববোধ জাগিয়া উঠে, তবে অব্যাহতগতিতে সমাজ লক্ষ্যাভিমুখে আবার অগ্রসর হইবে।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

(উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ, ১৩১৯)

"আলোক, পূর্ণ জ্ঞানালোক, জগতে আনয়ন কর। প্রত্যেক মানুষের কাছে এই আলোক পৌঁছাইয়া দাও; যতদিন না প্রত্যেকে ভগবান্ লাভ করে, ততদিন এ কাজের সমাপ্তি নাই। দরিদ্রের নিকট এই আলোক পৌঁছাইয়া দাও, ধনীর নিকট আরো আলোক পৌঁছাইয়া দাও, কেন না তাহার পক্ষে এ আলোক আরও আবশ্যক; যে মূর্খ অজ্ঞানী তাহাকে আলোক দান কর, এবং যে বিদ্বান তাহাকেও আলোক দাও, কেন না বর্ত্তমান কালের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যর্থতা নিতান্তই সুগভীর! এই ভাবে সকলেরই নিকট জ্ঞানালোক আনয়ন কর এবং শেষ ফলাফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ কর!" *

"সত্য ও লোকাচারের মধ্যে আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুরুষতার ফল। বীর হও। যারা আমার উত্তরসাধক, সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। কোন মতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপোষের ভাব থাকিবে না। পরম শ্রেষ্ঠ সত্য সমগ্র দেশে আচণ্ডালে বিতরণ কর। সম্মানের হানি, অথবা অপ্রিয় বিরোধের ভাবনায় ভীত হইও না। শত প্রলোভনের বিপরীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যের সেবা করিতে পার তবে নিশ্চিত জানিও, তুমি এমন এক দিব্য তেজে পূর্ণ হইবে যে তাহার সম্মুখে তুমি যাহা অসত্য জান, তাহার উল্লেখ করিতে গিয়া লোকে হটিয়া আসিবে। পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত, অবিচলিত হইয়া যদি তুমি চৌদ্দবৎসর সমান ভাবে সত্যের সেবা কর, তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস করিতে লোক বাধ্য; তখন দেশের অশিক্ষিত সাধারণের উপর গভীর মঙ্গল বর্ষিত হইবে, তাহাদের সর্ব্ব-বন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটী উন্নত হইবে।"†

---

* "ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে বেদান্তের প্রয়োগ" নামক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।"

† কোনও প্রশ্নোত্তর সভায় স্বামীজীর উক্তি।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা সমাজসংস্কারের কথা আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, যাহার মাথা নাই তাহার মাথা ব্যাথার প্রসঙ্গ আসে না,—অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে প্রকৃতভাবে সমাজবদ্ধ হইতে হইবে, তারপর সমাজসংস্কারের কথা উত্থাপিত হইতে পারে। আমাদের সমাজবন্ধনের মূলসূত্র বা মূলপ্রয়োজন যে পরমার্থসাধন, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি। এই প্রয়োজনকে সমষ্টির প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া পরমার্থের অনুশীলনে আমাদিগকে একযোগ হইতে হইবে। একযোগ হইবার প্ররোচক বা impulse কোথা হইতে আসিবে? উত্তর—তীব্র দায়িত্ববোধ, সনাতনধর্ম্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচাররূপ দায় স্বীকার করা। এই দায়িত্ববোধ দেশের আপামরসাধারণে সঞ্চারিত করিবার প্রধানতম উপায়—উপযুক্ত শিক্ষাবিস্তার।

এই দায়িত্ববোধ বর্ত্তমান যুগের নূতন শিক্ষা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে এক একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ঐরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে ব্যষ্টির ভিতর দিয়া ঐ দায়ের পূরণ হইয়াছে, বর্ত্তমান যুগে সমষ্টির দ্বারাও ঐ দায় পূরণ করাইতে হইবে, সমষ্টিকেও ঐ ব্রত পালন করাইতে হইবে। সেই জন্য সমষ্টির শিক্ষার মধ্যে একটী নূতন অঙ্গ যোজনা করিতে হইবে।

যে যুগে আমাদের দেশে দু'চারজন মনীষী কল্যাণের পথ নির্ণয় করিত এবং সর্ব্বসাধারণ একরূপ অন্ধভাবেই কল্যাণের পথে চালিত হইত, সে যুগ ভারতবর্ষে চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়াছে। যে প্রাচীন ব্রহ্মণ্যশক্তি ও ক্ষত্রিয়শক্তি দেশের লোককে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহা কালচক্রের আবর্ত্তনে

অভিনয়মঞ্চের অন্তরালে অপনীত হইয়াছে। বেদে "বিশ্" শব্দে যে জনসাধারণকে ঈঙ্গিত করা হইত, তাহারা আজও মঞ্চোপরি বিরাজমান; ঋষি ও ক্ষত্রিয়ের অর্জ্জিত সম্পদে যথাসম্ভব উত্তরাধিকারী হইয়া নানা পরিণাম ও বিপর্য্যয়ের পরে আজও তাহারা টিকিয়া আছে। যে সাধনগঙ্গাকে শিবকল্প আর্য্যঋষি আর্য্যসমাজে পতিত হইবার সময় মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, যে সাধন-গঙ্গাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহাপুরুষগণ সুদৃঢ় শৈলমালার ন্যায়, বহু প্রপাত, আবর্ত্ত ও ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যময় সুদীর্ঘ উত্তরণ-পথে অবতরণ করাইয়াছেন, আজ সেই সাধন-গঙ্গা গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতের জনসাধারণরূপ বিশাল প্রান্তরের সমতল ভূমিকে প্লাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই পূর্ব্বাকৃতিতে আর দেখা দিবেন না,—কিন্তু শৈলজাত পলির দ্বারা যেমন একটা দেশভাগ গড়িয়া উঠে, যেমন নদীর খাত নির্ম্মিত ও নির্দ্দিষ্ট হয়, যেমন জমি উর্ব্বরা ও ফলশস্যশালী হয়, তেমনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি, তাহাদের আদর্শ, তাহাদের উদ্যম, তাহাদের সিদ্ধি, সনাতন সাধনপ্রবাহের সহিত প্রবাহিত হইয়া একটী অপূর্ব্ব জনসমষ্টির উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা সম্ভাবিত করিয়া দিয়াছে। এই সমষ্টিরূপ ভিত্তি গঠিত হইবার পর বর্ণাশ্রমপোষিত ধর্ম্ম আবার নূতন আকারে নূতন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই ভিত্তির উপর সমুত্থিত হইবে। অতএব সমষ্টিরূপ নূতন ভিত্তি নির্ম্মাণ করাই আমাদের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম কার্য্য এবং এই কার্য্যে সর্ব্ব প্রধান সহায়—প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার।

ভারতীয় সনাতন লক্ষ্যসাধনরূপ ব্রত ধারণ করিয়া আমাদের

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

দেশে যে সমষ্টি প্রতিষ্ঠালাভ করিবে, তাহার নির্ম্মাণকল্পে যে শিক্ষার আবশ্যক, সে শিক্ষার নিমিত্ত-কারণই বা কি এবং উপাদান-কারণই বা কি, তাহাই এখন আমরা বিচার করিব। নিমিত্ত-কারণ বলিতে এস্থলে আমরা উপযুক্ত ক্ষেত্র বা আলম্বন নির্দ্দেশ করিতেছি: নিমিত্ত-কারণরূপ আলোক না থাকিলে, যেমন আমাদের দর্শনকার্য্য চলে না, সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত না থাকিলে সমষ্টি-গঠনোপযোগিনী শিক্ষার বিস্তার হয় না। প্রথমতঃ দেখা যা'ক, ঐরূপ উপযুক্ত শিক্ষার জন্য আমাদের দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে কি না, অর্থাৎ সেই শিক্ষার নিমিত্ত-কারণ দেশে বিদ্যমান কিনা।

সমষ্টিগঠনমূলক শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্রনির্ম্মাণে পাশ্চাত্য জগৎ অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্যের নিকট ঐ নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর ছিল না। মনে হয়, ঐ শিক্ষা লাভ করিবার জন্যই বিধাতা পাশ্চাত্যের সহিত ভারতকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য সমষ্টিপ্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্ররচনাকে এককথায় Organisation of thought and activity বলে। ভাব (thought) ও শক্তির (activity) উৎস ভারতের পক্ষে সনাতন, উহাদিগকে উৎসারিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য-আদর্শের সন্ধানে ও পাশ্চাত্য-আদর্শের পশ্চাতে ছুটিবার আবশ্যক নাই, ছুটিলে পদে পদে প্রমাদ ও শক্তিক্ষয়; কিন্তু ভাব ও শক্তির প্রকাশ ও প্রয়োগের অভিনব প্রণালী পাশ্চাত্যের কাছে আমাদিগকে শিখিতে হইবে। যে সমস্ত কৌশলের দ্বারা বহুর ভাব ও কর্ম্মকে একটী কেন্দ্রে সংহত করিতে হয় এবং একযোগে

চালাইতে বা কাজে লাগাইতে হয়, সে সমস্ত কৌশল পাশ্চাত্যের নিকট আমাদিগকে শিখিতে হইতেছে। দ্রুতগামী যান, ডাক, টেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র, সাময়িক পত্র, সভাসমিতি প্রভৃতি সমষ্টির শক্তি-সঞ্চারোপযোগী নানা কৌশলের সহিত সুপ্তপ্রায় বিশাল ভারতের চকিতদৃষ্টিকে অত্যল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্বত্র একভাবে ও একযোগে সম্যক্ রূপে পরিচিত করিবার জন্য পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর দ্বারে বিধাতা পাশ্চাত্য রাজশক্তিকে আনয়ন করিয়াছিলেন। সমষ্টি-শক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও সঞ্চালনের সহায়রূপে এই সমস্ত কৌশল আজ আমাদের দেশে স্বয়ং কালই প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কেবল আমাদিগকে আজ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, রাজনীতিমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে পাশ্চাত্য এই সমস্ত কৌশলের প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিশক্তির বিকাশ, উপচয় ও উৎকর্ষসাধন করে, তৎপরিবর্ত্তে আমাদিগকে পরমার্থমূলক লক্ষ্যের আশ্রয়ে সমষ্টিশক্তির বিকাশ, উপচয় ও উৎকর্ষসাধন করিবার জন্য ঐ সমস্ত কৌশলের প্রয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে। পাশ্চাত্য ও ভারতের জীবনব্রত বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু উভয়কেই সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ব্রতপালন করিতে হইবে বলিয়া সমষ্টিবন্ধনের কৌশল এক প্রকারের। পাশ্চাত্যের ও ভারতের সমষ্টিবন্ধনের সূত্রটী সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সমষ্টিবন্ধনের কৌশল একই; এই সূত্রটী যদি একরূপ হইত, অর্থাৎ রাজনীতিমূলক হইত, তাহা হইলে প্রথম হইতেই রাজনৈতিক বিরোধ বা সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া পড়িত; সমষ্টিবন্ধনের সূত্রটী পৃথক্ বলিয়া আমাদের বর্ত্তমান সাধনার মধ্যে অন্ততঃ আমরা আজকাল যতটা আশঙ্কা করি সে পরিমাণে ঐরূপ সংঘর্ষের অবসর বা প্রসঙ্গ নিহিত নাই।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

সমষ্টিবন্ধনের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক নানা কৌশলের প্রচলন, আমাদের দেশে সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের একটী নিমিত্ত কারণ। এই সমস্ত কৌশলের প্রচলনে সমগ্র দেশের ভাব ও শক্তি সহজে উপযুক্ত কেন্দ্রের সাহায্যে সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ হইবার সুবিধা পাইবে, এবং ভাব ও শক্তির ঐরূপ সুসম্বন্ধ ও কেন্দ্রানুগত সঞ্চার, অর্থাৎ organisation, পশ্চাতে বজায় থাকিলে, শিক্ষা-বিস্তারকে সমষ্টিগঠনের উপযোগী করা সম্ভব হইবে।

সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের আর একটী নিমিত্ত-কারণ—জ্ঞানানুশীলনে কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত না থাকা। এ বিষয়েও তোমার-আমার মুখ না চাহিয়া কাল স্বয়ংই সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে। বিশেষ কোনও শিক্ষা বা সাধনায় হয়ত ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও সামর্থ্য থাকিতে পারে বা না থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ শিক্ষা ও সাধনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখা সমষ্টি গড়িবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সমষ্টিকে যদি এ মর্য্যাদা না দেওয়া হয়, তবে সমষ্টিশক্তির বিকাশ, বা প্রতিষ্ঠা হয় না।

প্রাচীনযুগে সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রসঙ্গই উঠে নাই। যে আদর্শের অবলম্বনে সমষ্টি গড়িয়া উঠিবে, যে আদর্শের সাধনা ও রক্ষার ভার সমষ্টিকে গ্রহণ করিতে হইবে, সমগ্র ভারতক্ষেত্রে প্রাচীনযুগ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া সেই আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তি করাইতেছিল। প্রাচীনযুগ আমাদের নিকট পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে ব্যক্ত করিয়াছে এবং আদর্শস্থাপনার পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে; সমষ্টি গড়িয়া দেওয়ার ভার প্রাচীনযুগ গ্রহণ

করে নাই,—সেইজন্য প্রাচীন যুগ যে ভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তার করিয়াছে, তাহার মধ্যে সমষ্টির উপযুক্ত মর্য্যাদা স্থান পায় নাই। সে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা জ্ঞানানুশীলনে নানা রকম একচেটিয়া বন্দোবস্ত দেখিতে পাই, তবে বিস্মিত বা মনঃক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। সমষ্টিশক্তির অভাবে আদর্শাভিব্যক্তি ও আদর্শরক্ষার জন্য একান্তভাবে ব্যষ্টিশক্তির উপর নির্ভর করাতে, প্রাচীনযুগ জ্ঞান ও বিদ্যাকে বহুস্থলে সম্প্রদায়গত করিয়া রাখিয়াছিল। ভাবী উত্তরাধিকারীদের জন্য স্বোপার্জ্জিত ধন পূর্ব্বপুরুষ যেমন কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখে, সেইরূপ প্রাচীন মহাপুরুষগণ আপনাদের সিদ্ধবিদ্যা অন্তরঙ্গ শিষ্য-সম্প্রদায়ের নিকট গচ্ছিত রাখিতেন; সে কালে অনুগত অন্তরঙ্গ-শিষ্যবৃন্দ ব্যতীত সে অমূল্যরত্নের উপযুক্ত যত্ন ও সদ্ব্যবহার করিবার অপর পাত্র সুনিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই। সমষ্টিরূপ যে সাধারণ সুরক্ষিত ভাণ্ডার সে-সমস্ত রত্নের স্থায়ী তত্ত্বাবধান ও রক্ষণের শ্রেষ্ঠ পাত্র, তাহা সেকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল না,—প্রতিষ্ঠিত থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল না। ফলে বিদ্যা প্রাচীন-কালে স্বভাবতঃই যেন সম্প্রদায়গত হইয়া পড়িত এবং ঐরূপ গণ্ডী দেওয়ার রীতি প্রচলিত থাকায়, জ্ঞানানুশীলনের নানা 'একচেটে' ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিত।

আরও গোড়ার তত্ত্ব ভাবিয়া দেখিলে, কথাটা পরিষ্কার বুঝা যায়। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি * যে, দ্রষ্টা ঋষির প্রত্যক্ষলব্ধ সত্যকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় সমাজ আদিযুগে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল;

* "ভারতের সাধনা"—আষাঢ়ের সংখ্যা।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

ভারতে সামাজিক বিবর্ত্তনের মূল আশ্রয় ব্যষ্টিলব্ধ পরমার্থ জ্ঞান। জগতে অন্যত্র সমাজ-বিবর্ত্তনের মূল আশ্রয়—ঐহিক বিবিধ প্রয়োজনের সাধনা; সেরূপ সাধনায় অতি সহজেই দশজনের অভিজ্ঞতা, দশ-জনের সমবেত চেষ্টা একজনের নেতৃত্বের উপর প্রাধান্য লাভ করে। পাশ্চাত্য সমাজে সেইজন্য সমষ্টিগঠনের আবশ্যকতা ও উপকারিতা অনেক পূর্ব্বযুগ হইতেই উপলব্ধ ও ব্যক্ত হইয়াছিল। অতএব সমষ্টির মর্য্যাদা বহু পূর্ব্ব হইতেই পাশ্চাত্যের সমাজে অনিবার্য্যরূপে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে সমাজবিবর্ত্তনের ধারা অন্যপ্রকার। এক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলি স্বাভাবিক প্রয়োজনের সাধনা করিতে করিতে সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। সাধারণ লোকব্যবহারের অতীত একটা অতিসূক্ষ্ম আদর্শ ভারতের বহুপ্রাচীনযুগে মানব-সাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল; তার পর যুগযুগক্রমে সেই আদর্শের ক্রমস্ফুরণ ও ক্রমসঞ্চার ঘটিয়া, ভারতীয় সমাজকে বিবর্ত্তিত করিয়া আসিয়াছে; সে ক্ষেত্রে সমাজের বহু যেন উপ-করণস্থানীয় এবং আদর্শসিদ্ধ এক এক জন বা কতিপয় মহাপুরুষ যেন নির্ম্মাতৃস্থানীয়। এরূপ সমাজের বিবর্ত্তনে আদর্শসিদ্ধ ব্যষ্টিই মুখ্য সহায়, সমষ্টির অভিজ্ঞতা সহায় নহে। যত দিন না অন্তর্নিহিত আদর্শ সুমগ্র সমাজের মূল-স্তরটী ব্যাপ্ত করিয়া উপযুক্ত প্রসারতা লাভ করিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আদর্শের বিবিধ অঙ্গকে সমাজের মধ্যে নানা উপযুক্ত স্থানে গণ্ডীবদ্ধভাবে এবং সোদ্বিগ্নভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। একদিকে এইরূপ সাগ্রহ সংরক্ষণের আবশ্যকতা ও অপরদিকে ক্রমসঞ্চরণের আব-শ্যকতা,—এই উভয় অভিপ্রায়ের সংঘর্ষ—কখনও সামান্য আকারে

এবং কখনও বা তুমুল আকারে—আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। অতএব প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দুই প্রকারের লোক-নেতা দেখিতে পাই,—এক রকমের নেতারা অধিকার ও পাত্রভেদ প্রভৃতির দোহাই দিয়া জ্ঞানচর্চ্চায় এক-চেটিয়া ব্যবস্থার প্রতি অতিমাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন এবং আর এক রকমের নেতারা সাম্যনীতির দোহাই দিয়া সমাজের প্রচলিত গণ্ডীগুলি ভাঙ্গিয়া দিতেছেন। অবশ্য এমনও মহাপুরুষ নিতান্ত বিরল নহেন, যাহাদের উপর বিশেষভাবে গণ্ডীরক্ষা বা গণ্ডীভঙ্গ কোন একটীর ভারই বিধাতার দ্বারা অর্পিত না হইয়া, উভয়বিধ সামাজিক অভিপ্রায়ের সামঞ্জস্যবিধানের ভারই অর্পিত হইয়াছে। যাহা হউক, আজ আমাদের নিকট এই সকল-প্রকারের প্রাচীন লোকনেতাই সমান মান্য ও শ্রদ্ধার অধিকারী। আজ ইতিহাস আমাদিগকে এমন একটী স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে যে, ঐ বিরুদ্ধবাদী উভয়পক্ষীয় লোকনেতাদের দ্বারা ভারতের সনাতন সমাজ কিরূপে আপনার একই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া লইয়াছে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। একদিকে আদর্শের আত্মসংরক্ষণ, আর একদিকে আদর্শের আত্ম-প্রসারণ,—একদিকে আদর্শের শুদ্ধতা বজায় রাখিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যষ্টিশক্তির স্থায়িত্ববিধান, অপরদিকে আদর্শের ক্রমসঞ্চার ঘটাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সমষ্টিশক্তির বিকাশসাধন,—একদিকে কেন্দ্রানুগা শক্তির লীলা, অপরদিকে কেন্দ্রাপগা শক্তির লীলা।

আদর্শের আত্মসংরক্ষণরূপ প্রয়োজনের অঙ্গীভূত হইয়া প্রাচীন সমাজে অধিকারিবাদের প্রচুর প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। অধিকারি-

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

বাদের অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, যাহার সাধনসামর্থ্য যতদূর, সে ঠিক ততদূর পর্য্যন্ত সাধনতত্ত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে। সাধনার দ্বারা সত্যের যতটুকুর আয়ত্ত করা যায়, ঠিক ততটুকুর শুদ্ধতা ও মর্য্যাদা সাধকের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারে। সত্য সাধনার বস্তু, বিচারাড়ম্বরের বিষয় নহে; অতএব যাহার সাধন-সামর্থ্য নাই, কেবল বিচারবুদ্ধিতে তাহার দ্বারা সত্য গৃহীত হইলে, নানা বিকৃত মতের উদ্ভব ঘটিতে পারে। অতএব আমাদের দেশে বহুপ্রাচীন কাল হইতেই দেখা যায় যে, কোনও উচ্চ তত্ত্ব বা কোনও বিদ্যা দান করিবার অগ্রে, গ্রহীতার সাধনসামর্থ্যের হিসাব করা হইত। আদর্শের অপ্রতিযোগী ও প্রত্যক্ষ প্রভাবের দ্বারা যতকাল আর্য্যসমাজ অপেক্ষাকৃত অল্লায়তন হইয়াও পূর্ণ জীবনীশক্তিতে উদ্দীপ্ত ও সুস্থ ছিল, ততকাল সাধনসামর্থ্যের হিসাব করিতে যাইয়া সে প্রায়ই জন্ম-বংশ-জাতি প্রভৃতি গ্রাহ্য করে নাই, পরে যখন আপন গৃহের চারিদিকে প্রবেশার্থী অনার্য্যের ভিড় ও কোলাহল বাড়িতে লাগিল এবং বিভিন্ন জীবনাদর্শের সংঘাত সেই গৃহের অন্তঃপুর পর্য্যন্ত মুখরিত করিয়া তুলিল, তখন সশঙ্কদৃষ্টিতে অনার্য্য ও সঙ্কর জাতিদিগকে লক্ষ্য করা সমাজের একটা অভ্যাস বা সংস্কারে পরিণত হইতে লাগিল এবং সনাতন আদর্শকে ও তৎসংরক্ষণমূলক অনেক সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করিবার জন্য যেন প্রাচীর তুলিয়া নানা দুর্গের সৃষ্টি হইতে লাগিল। তারপর দুর্গরক্ষার ধূমধাম চলিতে লাগিল এবং সাধন-তত্ত্ব ও বিদ্যা দান করিবার সময় সাধনসামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে বংশ বা জাতির হিসাব করাও প্রচলিত নিয়মের মধ্যে গণ্য হইল,—

এইরূপ স্থির হইল যে, এমন কি সাধনসামর্থ্য থাকিলেও হীন-জাতীয় বা অনার্য্যজাতীয় সাধনার্থীকে একজন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে, পরে সামর্থ্যানুযায়ী উচ্চ জন্ম লাভ করিয়া সে উচ্চাধিকার-রূপ দুর্গমধ্যে প্রবেশাধিকার পাইবে। এইরূপে অধিকারিবাদকে পল্লবিত করিয়া নূতন জঞ্জালের সৃষ্টি করা হইল,—নচেৎ দুর্গরক্ষা হয় না। বাস্তবিক সমাজের মধ্যে সনাতন আদর্শের আসন এতদূর সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছিল যে, যদি সমাজের বাহিরে উদার-চরিত সন্ন্যাসীদের দ্বারা আদর্শের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার না চলিত, তবে সংগোপন-চেষ্টার বাড়াবাড়ির ফলে কোন্ যুগে ঐ ভারতীয় সনাতন আদর্শ ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত!

যাহা হউক, অধিকারিবাদের পশ্চাতে কেবলই ব্রাহ্মণদের স্বার্থপরতা ও বিদ্বেষ না দেখিয়া, প্রকৃত ইতিহাসজ্ঞ সাময়িক সামাজিক প্রয়োজনই প্রধানতঃ দেখিতে পাইবেন। সে সমস্ত সাময়িক প্রয়োজনের অস্তিত্ব বর্ত্তমান যুগে আর নাই, কারণ, আর্য্য-অনার্য্যের সে প্রাচীন ভেদ বুদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী নানা সামাজিক পরিণামের সাহায্যে তিরোহিত হইয়াছে; বর্ত্তমান যুগের হিন্দু-সমাজ আপনার মধ্যে শ্রেণীগত ভেদমাত্র স্বীকার করে, এবং আপনার বাহিরে যে মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায় রহিয়াছে, তাহারাও প্রাচীন অনার্য্যদের মত সমাজের অঙ্গীভূত হইবার দাবী উপস্থিত করে না।* অতএব প্রাচীন অধিকারিবাদের মধ্যে যে সমস্ত জঞ্জাল জমিয়া গিয়াছে, তাহা পরিষ্কৃত করিবার সময় আসিয়াছে। কি ভাবে সে কাজ করা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিতেছি।

* আমাদের সনাতন সমাজে সমষ্টিশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষা।

কেহ কেহ মনে করেন যে, অধিকারিবাদ জিনিষটাই অনাবশ্যকীয়; কারণ যাহা সত্য, তাহাকে সমর্থাসমর্থনির্ব্বিশেষে ব্যক্ত করায় তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে বিকৃত ধারণার উদ্ভব হইলেও, আখেরে সেই সত্য আপনার প্রতিষ্ঠা আপনি করিয়া লইবেই লইবে। ইঁহারা বলেন যে, যাহা সত্য, তাহা উচ্চকণ্ঠে প্রচার কর, ফলাফল চিন্তা করার দরকার নাই; কারণ সব সত্যই মানুষের হাতে বিকৃত আকার ধারণ করে, হাজার চেষ্টা করিলেও ঐরূপ বিকৃতির হাত হইতে নিস্তার নাই; কিন্তু—ঐরূপ বিকৃতির সঙ্গে সত্যের শুদ্ধপ্রকৃতির সংগ্রাম মানবসমাজে নিয়তই চলিয়াছে, কেবল যিনি সাধন দ্বারা সিদ্ধ হন, তাহার মধ্যেই আমরা সত্যের সেই শুদ্ধপ্রকৃতিকে জয়লাভ করিতে দেখিয়া থাকি। অতএব সত্যের স্বরূপ ও বিকারের মধ্যে যখন সংগ্রাম অনবরত চলিবেই, তখন বৃথা অধিকারিবাদের একটা গণ্ডী তুলিয়া সত্যপ্রচারের কেন ক্ষতি করি?

এরূপ মতবাদীকেও কিন্তু ইতিহাস বলিবে যে, প্রাচীন আর্য্য-সমাজকে এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল যে সত্যের প্রচারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতির হাত হইতে সত্যের স্বরূপকে রক্ষা করিবার জন্য সংকীর্ণ অধিকারিবাদকে প্রচলিত করিতে হইয়াছিল। সে অবস্থায় সত্যের বিকার ও স্বরূপের মধ্যে যে সর্ব্বকালব্যাপী সংগ্রাম চলে, সেই সংগ্রামকে স্বাভাবিক নিয়মে

জীবন অতিক্রম করিয়া যে ধর্ম্মসাধনামূলক সমন্বয় গড়িয়া উঠিবে, সেই সমন্বয়ে (nation) মুসলমান ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের যথাযোগ্য স্থান নির্দ্দেশ হইবে। ("ভারতের সাধনা"—আষাঢ়ের সংখ্যা।)

চলিতে না দিয়া একটী পক্ষকে, অর্থাৎ সত্যের স্বরূপকে, ক্ষতি-স্বীকার করিয়াও, অর্থাৎ আত্মপ্রচাররূপ অঙ্গের হানি করিয়াও, অপর পক্ষের, অর্থাৎ সত্যের বিকারসম্ভাবনার বিরুদ্ধে যুঝিতে হইয়াছিল। সত্যের স্বরূপ ও বিকারের চিরপ্রচলিত সংগ্রামকে সে অবস্থায় আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম পরিহার করিয়া আপদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

যদি বল, বেশ কথা ; সে পরবর্ত্তী যুগের সংকীর্ণ অধিকারি-বাদের কথা ছাড়িয়া দাও ; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বৈদিক যুগের ঋষিরা পর্য্যন্ত অধিকারিবাদের ধূয়া তুলিতেন কেন,—একথা শাস্ত্র কেন বলিলেন যে, "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাং" ?

"বুদ্ধিভেদ" কাহাকে বলে ? আমার স্বভাব ও সামর্থ্য অনুসারে ধর্ম্মসাধনা সম্বন্ধে আমার কি কর্ত্তব্য তাহার একটা ধারণা, উপ-দেষ্টার সাহায্যেই হউক বা স্বতঃই হউক, গঠিত হইয়াছে। এইরূপ যথাসম্ভব নিশ্চয়াত্মিকা ধারণাকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধি যদি অন্য কোনও বিপরীত ধারণার সংঘর্ষের দ্বারা সংশয়ান্বিত ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তবে বুদ্ধিভেদ ঘটে। মনে কর একজন কর্ম্মসঙ্গী গৃহস্থ,—অর্থাৎ, কেবল ক্রিয়াকাণ্ডসংযোগেই যাহার আধ্যাত্মিক চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, এরূপ ব্যক্তি,—অকস্মাৎ বেদান্তবাদীর জ্ঞানযোগমূলক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন সাধনতন্ত্রের সন্ধান পাইল ; অতঃপর সে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের নিরালম্বভাব ও উহার শাস্ত্রীয় প্রশংসাবাদ লক্ষ্য করিরা যদি উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও উদাসীন হয়, তবে বলিতে হইবে, তাহার বুদ্ধিভেদ ঘটিয়াছে, সে 'ইতোভ্রষ্ট ততোনষ্টে'র পথে

অগ্রসর। প্রাচীন শাস্ত্র বলেন যে ঐরূপ অনধিকারী কর্ম্মসঙ্গীর নিকট উচ্চ-তত্ত্বের প্রচার করিও না, কারণ তাহার বুদ্ধিভেদ ঘটিতে পারে।

তাহা হইলে বুঝা গেল যে, বুদ্ধিভেদ নিবারণার্থে অধিকারি-বাদের প্রচলন হইয়াছিল। যদি কেহ দেখাইতে পারেন যে, ঐরূপ একটা প্রয়োজন বাস্তবিক ছিল না, উহা শাস্ত্রকারদিগের মস্তিষ্কে কল্পিতমাত্র হইয়াছিল, অথবা ঐরূপ প্রয়োজন থাকিলেও অধিকারি-বাদীদের দ্বারা উহার নিষ্পত্তি হইতে পারে না, তবে স্বীকার করিব যে প্রাচীন অধিকারিবাদ অমূলক ও নিরর্থক,—নচেৎ নহে।

প্রাচীন আর্য্যসমাজে অধিকারিবাদের উদ্ভবকালে উহার মূলে যে একটা প্রয়োজন নিহিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। যে সমাজের শীর্ষে কতিপয় অসাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজনেতা অবস্থিত হইয়া বিচিত্রস্বভাব জনসমষ্টির মধ্যে আদর্শসঞ্চারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং যে সমাজের শিক্ষণীয় আদর্শ নিতান্ত স্থূল দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানময় যজ্ঞ পর্য্যন্ত নানা সাধনস্তরকে সমন্বিত করিয়া আপনার মধ্যে ধারণ করে, সে সমাজে সাধারণ লোকদের মধ্যে বুদ্ধিভেদ ঘটিবার যেমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমনি যাহারা সেই বুদ্ধিভেদের প্রতিকার যথাসময়ে করিতে পারেন, তাহারাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র উপস্থিত নহেন। সমাজ ও লোকশিক্ষা যে পরিমাণে কেন্দ্রসংহত ও সমষ্টিবদ্ধ (organised) হইলে, বুদ্ধিভেদ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট করে না এবং তৎপ্রতিকারও সঙ্গে সঙ্গে বিহিত হইতে পারে, প্রাচীনযুগের আর্য্যসমাজের পক্ষে সেরূপভাবে সমষ্টিবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি।

এইজন্য বুদ্ধিভেদের সম্ভাবনা যথাসম্ভব কমাইয়া সমাজের স্থিতিকে সাহায্য করিবার জন্য, সত্যের বহুলপ্রচারকে কতকটা ব্যাহত করিয়া সমাজের গতিকে অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বাস্তবিকই সেই প্রাচীনযুগে সমাজের গতি অপেক্ষা স্থিতির দিকে লক্ষ্য অধিক রাখাই আবশ্যক ছিল,—কারণ, নানা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া, নানা আদর্শের সংঘাতের ভিতর, একটা বিশেষ জীবনাদর্শের উপর সমাজ দাঁড়াইবার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এরূপ সমাজের কেবল অপ্রতিহত গতিই সমাজনেতাদিগের লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না। এইজন্য গ্রহীতার সাধনসামর্থ্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়া যথাসম্ভব সাবধানে সত্যের প্রচার করা, বা বিদ্যাদান করাই, প্রাচীন যুগের শিক্ষাদাতাগণ শ্রেয়স্কর বলিয়া বুঝিয়াছিলেন ; তাহারা সমগ্র তত্ত্ব ও বিদ্যার ভাণ্ডার সর্ব্বসাধারণের নিকট উন্মুক্ত করিয়া রাখিতে পারেন নাই, রাখিলে—সত্যের বিকৃতি, সত্যের স্বরূপের বিরুদ্ধে সমাজের চতুর্দ্দিকে কেবলই এমন সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিত যে, আর্য্যসমাজ স্থিতিলাভ করিবার সুযোগ পাইত না।

কিন্তু কালের পটপরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। একমাত্র ব্যষ্টিগত সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র সেই প্রাচীন ভারত আজ অন্তর্হিত হইয়াছে, সমষ্টিগত সাধনার অভিনয়ক্ষেত্ররূপে নবীন ভারত আজ সমুত্থিত। তাই ভারতের নেতৃপুরুষ গম্ভীর নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন, "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূলভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ

ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।"* "বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীর্য্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা পুনর্ব্বার সঞ্চারের জন্য; এ কথা (যখন) মনে থাকে না, (যখন) গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্ব্বনাশের সূত্রপাত।"†

আদর্শের আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণ,—এই দ্বিবিধ অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য প্রাচীনযুগের সমাজকে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমান যুগে ভারতে যে সমষ্টি গঠিত হইবে, তাহা ঐ উভয়বিধ প্রয়োজনের একমাত্র অনুষ্ঠাতার আসন পরিগ্রহ করিবে। এই সমষ্টিশক্তির উন্মেষ অনুভূত হইয়াছে; সেইরূপ অনুভবমূলক উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ সংকীর্ণ অধিকারিবাদের প্রাচীন জীর্ণ প্রাচীরগুলি শীঘ্র ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ভারতবাসীকে বারম্বার আহ্বান করিতেছেন।‡ আজ দেশে প্রতিষ্ঠোন্মুখ সমষ্টিশক্তি, ভাব ও শক্তির পাশ্চাত্য সঞ্চারকৌশল আয়ত্ত করিয়া সমাজের জ্ঞানানুশীলনে অভিভাবকতা করিতে অগ্রসর হইয়াছে,—এখন সমষ্টির দৃষ্টি লোকালয়ের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছে; এ অবস্থায় বুদ্ধিভেদ বা তত্ত্ববিপর্য্যয়ের সুযোগ প্রাচীন কালের মত আর মাথা তুলিতে পারিবে না; এ অবস্থায় আমাদের সনাতন আদর্শের সমন্বয়মূলক

* "বর্ত্তমান ভারত"—৩৩ পৃষ্ঠা (৩ সংস্করণ)।

† "বর্ত্তমান ভারত"—৩৪ পৃষ্ঠা (৩য় সংস্করণ)।

‡ প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত দ্বিতীয় উক্তি এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত।

বিচার ও জ্ঞান দেশের সর্ব্বত্র সংক্রামিত হইয়া পড়িতেছে, এবং লোকশিক্ষার প্রকৃতি ও গতি নানা বিশৃঙ্খলার ভিতর দিয়াও সমষ্টির করায়ত্ত হইতে চলিয়াছে। ভারতে সমষ্টিপ্রতিষ্ঠার সর্ব্বাঙ্গীন উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়কবলিত জ্ঞানভাণ্ডার সমষ্টির জন্য উন্মোচিত হইতেছে এবং আদর্শের যথাযথ সংরক্ষণরূপ যে প্রয়োজন প্রাচীন অধিকারিবাদের দ্বারা সংসাধিত হইত, এখন তাহাকে সমষ্টির দ্বারা সংসাধিত করিতে হইবে বলিয়া, অধিকারিবাদকে স্বয়ং কালই দেশ হইতে অল্পে অল্পে বিদায় দিতেছেন।

কিন্তু সাধকের সাধনসামর্থ্য অনুসারে সাধনপথ নির্দ্দেশ করিবার ভার চিরকালই ধর্ম্মোপদেষ্টাকে গ্রহণ করিতে হইবে; এই মূল অধিকারিবাদকে রহিত করা সম্ভব নহে। যে অধিকারিবাদের অর্থ কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত, সে অধিকারিবাদের যুগ চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে অধিকারিবাদ বলিতে সামর্থ্যের হিসাব বুঝায় সে অধিকারিবাদ রহিত করা যায় না; সকল ক্ষেত্রেই উহা প্রচলিত থাকিবে। সমষ্টির সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডার বা সাধনাভাণ্ডার সকলেরই নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু রত্নাহরণে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যাহার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, কেবল সে-ই উহাদের সম্বন্ধে অধিকার লাভ করিবে।

সমষ্টিগঠনোপযোগিনী শিক্ষার একটী প্রধান আলম্বন বা নিমিত্ত-কারণ—সমষ্টির জন্য সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ বিদ্যা ও সাধনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা। আমরা দেখিলাম, বর্ত্তমান যুগে সে দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। অতএব সমষ্টিশক্তির লীলাক্ষেত্র নির্ম্মাণ, অর্থাৎ—organisation of thought and activity, এবং

সমষ্টির উপযুক্ত মর্য্যাদাদান, অর্থাৎ—উহাকে সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও সাধনার দখল দেওয়া,—বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাবিস্তারের মূলে এই উভয়বিধ নিমিত্তকারণই স্থানলাভ করিতেছে। আগামী প্রবন্ধে আমরা বিচার করিব—সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের মূল উপাদান কিরূপ।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাকেন্দ্র।

(উদ্বোধন—চৈত্র, ১৩১৯)

"* * সমগ্র দেশে পরা ও অপরা বিদ্যাদির প্রচার আমাদিগকে নিজেদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। কথাটা আপনারা বুঝিতেছেন কি? আপনাদের আন্তরিক আশা, আপনাদের কথাবার্ত্তা, আপনাদের চিন্তা—সমস্তই এই মহৎ কর্ত্তব্যটি অধিকার করুক; কারণ, এ ব্রত আপনাদিগকে উদ্‌যাপন করিতেই হইবে। যতদিন না তাহা হইতেছে, ততদিন এ জাতির উদ্ধার নাই। আজকাল যে শিক্ষা আপনারা প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহার কতকগুলি সদ্‌গুণ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার একটী প্রচণ্ড দোষ আছে,—সে দোষ এমনই বিষম যে আর সমস্ত গুণ তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত। প্রথমেই দেখুন, আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলে না, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতেই জানে। এইরূপ অনবস্থামূলক বা অস্থিরতাবিধায়ক শিক্ষা,—কিম্বা যে শিক্ষা কেবল' 'নেতি'-ভাবই প্রবর্ত্তিত করায়,—সে শিক্ষা, মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। * * * মস্তিষ্কের মধ্যে নানা বিষয়ের বহু বহু তথ্য বোঝাই করিয়া সে গুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষালাভ করা বলে না। সৎ আদর্শ ও ভাবগুলিকে এমন ভাবে সুপরিণাম লাভ করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠিত করিতে পারে। পাঁচটী সৎ ভাবকে যদি তুমি পরিপাক করিয়া নিজের জীবনে ও চরিত্রে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে, যিনি কেবলই একটী পুস্তকাগার কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাও তোমার শিক্ষা অনেক বেশী। * * * অতএব আমাদের লক্ষ্য এই যে, আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আমাদের আয়ত্তাধীনে

আনিতে হইবে এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি বজায় রাখিতে হইবে ও যথাসম্ভব সনাতন প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।"*

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, ভারতে সমষ্টিগঠনোপযোগী শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ক্ষেত্র গড়িয়া উঠিয়াছে; কারণ, বহুর ভাব ও শক্তিকে আবশ্যক মত কেন্দ্রীভূত করিয়া একযোগে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার যে-সমস্ত সদুপায় আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে-সমস্ত সদুপায়ের সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। ইংরাজীতে যাহাকে organisation of thought and activity বলে, তাহা, যথাযোগ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, আমরাও এদেশে গড়িয়া তুলিতে পারিব। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সমষ্টির সম্মুখে সর্ব্ববিধ জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার অবারিত হইয়াছে, উহাকে বন্ধ করিবার আর উপায় নাই। সমষ্টির এই যোগ্য মর্য্যাদা সংকীর্ণ অধিকারিবাদের দ্বারা আর রহিত করা যাইবে না; সমষ্টিশক্তির বিকাশের পক্ষে এ মর্য্যাদা নিতান্ত আবশ্যক।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্রকৃতি কিরূপ এবং কিরূপ শিক্ষাকেন্দ্র সে শিক্ষার পক্ষে পরম উপযোগী। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতের যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন নহে। ভারতের আদিযুগেই ভারতের ভাগ্যবিধাতা আর্য্যঋষি উহার ঐতিহাসিক লক্ষ্য ও জীবনাদর্শ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। অগণ্য

---

* মান্দ্রাজে প্রদত্ত "ভারতের ভবিষ্যৎ" নামক বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি।

রাজশক্তির উত্থান-পতন, অগণ্য ধর্ম্মমূলক ও সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আর্য্যসমাজ সেই জীবনাদর্শ ও লক্ষ্যের সাধনায় অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে। উহাদের সনাতনত্বের উপরই ভারতীয় সর্ব্ববিধ আদর্শ ও সাধনার সনাতনত্ব আজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, নচেৎ ভারতীয় "জাতীয়তা"র অন্যপ্রকার কোনও অর্থ নাই। ঐ সনাতন লক্ষ্য ও জীবনাদর্শের আশ্রয় লইয়াই, আজ আমাদিগকে ভারতের বিশেষত্ব, জাতীয়তা, বা national lines, নিরূপিত করিতে হইবে। নূতন করিয়া আবার ভারতের লক্ষ্যনির্ব্বাচন করিবার আর উপায় নাই। মানুষের পক্ষে, নিজের পক্ষে, "পরম অর্থ" কি—তাহা প্রাচীন ভারত চিরকালের মত নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছে ও সেই নির্দ্দেশ অনুসারে সহস্র সহস্র বৎসর জীবনপথে ধাবমান হইয়াছে। এই বহুযুগের সংস্কার দিব্যপ্রেরণার আকারে আমাদের জীবনের নেপথ্যে আজ বিরাজমান; প্রাচীন ভারতের চিরনির্দ্দিষ্ট—"পরম অর্থ" আজ বহুযুগ ধরিয়া ভারতের মনুষ্যোচিত সকল আদর্শ ও সাধনার স্থাননির্দ্দেশ ও গতিনির্দ্দেশ করিয়া আসিয়াছে। আজ অভিনব পাশ্চাত্য-তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা আমরা তাহাদের তাৎপর্য্য, বা আমাদের ইতিহাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ভারতের সেই প্রাচীন লক্ষ্যনির্ব্বাচন ও ব্যবস্থাকে অবহেলা করিতে পারি?

এক "পরমার্থ" শব্দের মধ্যেই ভারতের প্রকৃত পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। "পরম অর্থ" কি তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হইলেই মনুষ্যজীবনের সকল প্রকার প্রয়োজন ও সাধনার স্থাননির্দ্দেশ ও গতিনির্দ্দেশ হইয়া গেল। যদি বল, আধ্যাত্মিক উন্নতির পরমপ্রয়োজনীয়তা

পাশ্চাত্যেরাও স্বীকার করে; তাহা হইলে বলিব, তাহারা মুখে এক কাজে আর এক,—তাহারা সমষ্টিগত জীবনে ও সমবেত সাধনাদির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শকে শ্রেষ্ঠত্ব দিতে পারে নাই, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা অন্যরূপ লক্ষ্যনির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ভারতের কথা স্বতন্ত্র; সহস্র প্রলোভনে বারম্বার আকৃষ্ট হইয়াও ভারতীয় সনাতন সমাজ ঋষিনির্ণীত পরমার্থকেই "পরম অর্থ"রূপে আঁকড়াইয়া পড়িয়াছিল। যে সমবেত শক্তি, যে অধ্যবসায়, যে ক্ষতিস্বীকার ও স্বার্থত্যাগ, সেই সমাজ অতীতে স্বলক্ষ্যনিষ্ঠা বা পরমার্থপরায়ণতার খাতিরে দেখাইতে পারিয়াছে, তাহার দশমাংশও যদি কোনও সমাজ রাজনৈতিক লক্ষ্যসাধনার খাতিরে দেখাইতে পারে, তবে সে আধুনিক রাজনৈতিক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারে। সে লক্ষ্যনিষ্ঠার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই; সে গৌরবের কথা আমাদের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে বা দেখিতে পান নাই,—কারণ, তাহারা ইতিহাস বলিতে এইমাত্র বুঝেন যে, একটা দেশ রাজনৈতিক লক্ষ্যের অনুগমনে কিরূপ ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মস্তিষ্ক এখনও বিকৃত হইয়া রহিয়াছে,—ভারতীয় শিক্ষার (culture) সনাতন গতি ও প্রকৃতি বুঝিলেও কি তাহারা আজ সে শিক্ষার প্রচারকল্পে বদ্ধপরিকর হইবেন ? বিষম সন্দেহ। তাহারা অতীত ভারতের প্রকৃত পরিচয় লাভ করেন নাই, বর্ত্তমান ভারতকেও রাজনীতির মঞ্চ হইতে চিনিবার চেষ্টা করেন; তাহারা আধুনিক জগতের "সস্তা ভব্যতাকে" শিক্ষা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন,—নানাদেশের নানা

সমাচারে মস্তিষ্ক বোঝাই করাকেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করেন। পরমার্থকে "পরম অর্থ" বলিয়া যদিই বা তাঁহারা স্বীকার করেন, তথাপি আপনাদিগকে ও সমগ্র দেশের শিক্ষাকে সেই পরমার্থের নিয়ন্তৃত্বাধীনে স্থাপিত করিতে কি তাঁহারা রাজি হইবেন?

পরমার্থের মুখ্য অর্থ হইল পরমপ্রয়োজন। সেই পরম-প্রয়োজন যে কি, সে সম্বন্ধে বৈদিক কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কখনও সন্দিহান হয় নাই। সেই পরমপ্রয়োজনকে একমাত্র লক্ষ্যরূপে সাধন করিয়া ভারতবর্ষ এতাবৎকাল জীবনধারণ করিয়া আছে। মনুষ্যজীবনের আর সকল প্রয়োজন, এবং যখনই যে সমস্ত নূতন নূতন প্রয়োজন কালপ্রভাবে উদ্ভূত হইয়াছে—সে-সমস্ত প্রয়োজন, ঐ পরমপ্রয়োজনেরই অনুকূল গতি লাভ করিয়া উহারই সিদ্ধির দিকে নিয়মিত হইয়াছে। অতীতে এরূপ চেষ্টা কখনও সফল হইয়াছে, কখনও বা বিফল হইয়াছে, কিন্তু পরমার্থরূপ লক্ষ্য হইতে ভারতের সনাতন সমাজ কখনও বিচ্যুত হয় নাই। দীর্ঘ বৈদিকযুগের বিপুল সংস্কার—অভাবনীয়, আকস্মিক উদ্দীপনারূপে বারম্বার সেই সমাজকে স্বীয় সনাতন লক্ষ্যের সাধনায় অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছে। আমরা "ভারতের সাধনায়" অতীত ইতিহাসের এ সমস্ত কৌশল আলোচনা করিয়াছি।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূলক পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই যদি ভারতের সনাতন লক্ষ্য হয়, তবে ভারতীয় শিক্ষার মূলপ্রকৃতি যে পরমার্থনিষ্ঠ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রাচীন বৈদিককালের ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিতেন যে, "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে"—"পরা চৈবাপরা চ।" "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা

কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।" অতএব সেই প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে আমরা পরাবিদ্যাকে দেখিতে পাই। সে যুগে শিক্ষার (culture) এই কেন্দ্র যিনি অধিকার করিয়াছেন, তিনি প্রকৃতভাবে সুশিক্ষিত (cultured), তদ্ব্যতীত অপরে পল্লবগ্রাহী মাত্র। তার পর আর এক কথা এই যে, পরাবিদ্যা লাভ করা মানে প্রত্যক্ষ পরমার্থলাভ বুঝাইত,—"তত্ত্ব"লাভ করা বুঝাইত, তথ্যলাভ করা বুঝাইত না; শ্বেতকেতু পরমার্থতত্ত্ব, অর্থাৎ পরমার্থ যাহা ঠিক ঠিক তাহাই, লাভ করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধীয় নানা সূক্ষ্ম গবেষণা শিখিয়া আয়ত্ত করেন নাই অতএব শিক্ষা বলিতে সেকালে শুধুই একটা তল্পিদারী বুঝাইত না—"যথা খরশ্চন্দনভারবাহী," শিক্ষা বলিতে কিছু "হওয়া," চিত্ত ও চরিত্রের একটা প্রত্যক্ষ, স্থায়ী, উন্নত পরিণাম বুঝাইত। সকল শিক্ষার ইহাই প্রকৃষ্ট ফল হওয়া উচিত। সেই বহুপ্রাচীন বৈদিক যুগেই ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল; উহা পরমার্থমূলক ও প্রকৃষ্ট-ফলপ্রদ। পরাবিদ্যারূপ শিক্ষার চরমসোপানে উন্নীত হইবার জন্য যখন দেবর্ষি নারদ যতিরাজ সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি যে সমস্ত অধীত অপরাবিদ্যার পরিচয় দিলেন, তাহাতে প্রায় সমস্ত আধুনিক বিজ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু সনৎকুমার বলিলেন যে, সে সমস্তই নামমাত্রে পর্য্যবসিত। [Classification and generalisation of phenomena attaching names to genera and species,—ইহাই আধুনিক বিজ্ঞানেরও কাজ; তবে নবাবিষ্কৃত যন্ত্রাদিসাহায্যে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ (phenomena)

লক্ষ্য করার পরিবর্ত্তে প্রাচীনকালে অনুমান ও প্রমাণের রীতি অন্যরূপ ছিল]। এমার্সন সাহেবও একস্থলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রকৃতি ঐরূপ ভাষায় বর্ণিত করিয়াছেন। নারদসনৎকুমার-সংবাদে ভারতীয় শিক্ষার পরমার্থমূলকতা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

পরবর্ত্তী কলিযুগের প্রারম্ভেও ভারতীয় শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যখন অষ্টাদশ-বিদ্যার প্রচলন ছিল, তখনও বেদই সর্ব্ববাদিসম্মত শিক্ষাভিত্তিরূপে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করিত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার পূর্ব্বে, চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তি বেদের প্রয়োজন-রূপে উক্ত হইলেও, মোক্ষফলই পরমার্থরূপে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইত এবং ছয় অঙ্গ, চার উপাঙ্গ ও চার উপবেদের প্রয়োজন পরমার্থের সহিত বিযুক্তভাবে বর্ণিত হইত না। ভারতীয় শিক্ষার এইরূপ সনাতন প্রকৃতি পরবর্ত্তী কালের বৈদিক সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের মধ্যে বরাবর অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্ব হইতেই বেদকে কর্ম্মকাণ্ডের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা বৈদিক সমাজকে কর্ম্ম-কাণ্ডের উপর স্থাপিত করিয়া সকল দিকেই উহার সংকীর্ণতা বাড়াইয়া তুলিয়াছিল এবং সেই উদ্যোগে বেদগুপ্তিরূপ সাধনায় এবং ষড়ঙ্গ, পুরাণ, কর্ম্মমীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্রের উৎকর্ষসাধনে কৃত-কার্য্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু ন্যায়, দর্শন, বা মীমাংসাশাস্ত্র ও উপবেদগুলি, কর্ম্মকাণ্ডপ্রধান সংকীর্ণ বৈদিকসমাজে অনুকূল আশ্রয় লাভ না করিয়া, অনেকাংশে প্রাচীনকেন্দ্রবিচ্যুত ও নানা বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে—

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাকেন্দ্র।

বৈদিক অষ্টাদশবিদ্যা বহুলপরিমাণে বিলুপ্তাঙ্গ ও বিচ্ছিন্নাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যায় ও দর্শনের বৈদিক ও পারমার্থিক ভিত্তি অনেক স্থলে অদৃশ্য ও অনির্দ্দেশ্য হইয়া গেল; আয়ুর্ব্বেদও ঐ দশা প্রাপ্ত হইয়া নানা অবৈদিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নূতনভাবে গৃহীত ও অনুশীলিত হইতে লাগিল; গান্ধর্ব্ববেদও ঐ ভাবে বিক্ষিপ্ত ও পরমার্থের সহিত বিযুক্ত হইতে লাগিল; ধনুর্ব্বেদ একরূপ বিলুপ্ত হইল, এবং অর্থশাস্ত্র নূতনভাবে নূতন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য পরমার্থ-বিচ্যুত হইয়া নূতন গতি লাভ করিল।

অষ্টাদশবিদ্যা যখন এইরূপে অসংহত ও বিকলাঙ্গ হইতেছে ও নানা বিদ্যা প্রাচীন কেন্দ্র ও কক্ষ হারাইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছে, সেই সময় তক্ষশিলার নাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ভারতীয় নানা প্রাচীন বিদ্যাকে সংগৃহীত করিয়া ভারতেতর দেশে নিক্ষিপ্ত করাতেই তক্ষশিলার ঐতিহাসিক সার্থকতা। তক্ষশিলায় যে পারমার্থিক ভিত্তির উপর নানা বিদ্যার অনুশীলন হইত, তাহা অনুমান হয় না। বৈদিক সমাজকেন্দ্র তখন আত্মরক্ষার্থ সসঙ্কোচে দক্ষিণ-ভারতাভিমুখে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। তক্ষশিলায় সে যুগে বৈদিক প্রভাব উচ্চাসন অধিকার করিত না। তখন নানাপ্রদেশে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে, ঘোর সমাজবিপ্লব চলিয়াছে; নূতন নূতন ক্ষত্রিয়জাতির উদ্ভব হইতেছে; যজ্ঞনিষ্ঠ বৈদিকসমাজ ব্রাহ্মণসেবক ক্ষত্রিয় রাজার সন্ধানে সসঙ্কোচে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; প্রাচীন বেদভিত্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল অর্দ্ধবৈদিক আর্য্যসমাজে বেদানুগত সন্ন্যাসিগণ যজ্ঞাতিরিক্ত নূতন নূতন উপাসনাপদ্ধতির প্রচার করিয়া বেড়াইতেছিলেন,—তাঁহারাও উত্তরভারতের নব নব সমাজ-

বিপ্লবে সচকিত ও স্তব্ধ হইয়াছেন ; ভারতীয় সনাতন পরমার্থলক্ষ্য সমাজের পথ রুদ্ধ দেখিয়া অরণ্যে সন্ন্যাসীর আশ্রয়ভাগী হইয়াছে। নবোত্থিত নানা সমাজের মধ্যে সে সময় তক্ষশীলা প্রসিদ্ধিলাভ করিল ; সেই সকল সমাজের ক্ষত্রিয়, বা ধনাঢ্য কুমারগণ তক্ষশিলায় বিদ্যার্থী হইতেছেন, কেন না পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ভারতীয় নানা বিক্ষিপ্ত বিদ্যা তক্ষশিলায় একত্রিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী কালে পারস্য প্রভৃতি দেশে ভারতীয় বিদ্যাদির নূতন একদফা প্রচার দেখা যায়। ঐ সকল বিদ্যার তরঙ্গ ভারতীয় পরমার্থসাধনপ্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এবং তক্ষশিলায় অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া বিক্ষিপ্তভাবে নানা-স্থান হইতে পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল ; তারপর সে স্থল হইতে ঘাতপ্রতি-ঘাতে দূরবর্ত্তী অনার্য্যদেশসমূহে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল।

অষ্টাদশবিদ্যার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি সাক্ষাৎ-ভাবেই বেদবিদ্যা হইতে উৎসারিত, অতএব উহাদের পরমার্থমূলকতা একরূপ অসংশয়িত। উপবেদচতুষ্টয়ের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োজন মানবীয় সর্ব্ববিধ সাধনারই পক্ষে সর্ব্বাগ্রে অবধানযোগ্য—'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।' যে বলের কথায় শ্রুতি বলিতেছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ',—সনৎকুমার যাহার সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'বলং বাব বিজ্ঞানাৎ ভূয়োঽপি হ শতং বিজ্ঞানবতামেকো বলবানাকম্পয়েতে,'—বিদ্যাচর্চ্চা, বাক্য, মন, সঙ্কল্প, চিত্ত, ধ্যান ও বিজ্ঞান অপেক্ষাও যে বলকে উচ্চস্থান দেওয়া হইতেছে,—সেই বল রুগ্ন, অতএব ক্লিষ্টচিত্ত, ব্যক্তির আয়ত্তীভূত হয় না। সেই জন্য "চিকিৎসাশাস্ত্রস্য চ রোগতৎসাধনরোগনিবৃত্তিতৎ-সাধনজ্ঞানং প্রয়োজনং।" (মধুসূদন সরস্বতী)। এমন কি, আয়ু-

বেদান্তর্গত কামশাস্ত্রের প্রয়োজন কি, তাহা অনুসন্ধান করিয়া উক্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ সন্ন্যাসিপ্রবর লিখিতেছেন, "তস্য চ বিষয়বৈরাগ্যমেব প্রয়োজনং, শাস্ত্রোদ্দীপিতমার্গেণাপি বিষয়ভোগে দুঃখমাত্রপর্য্যবসানাৎ।" গান্ধর্ব্ববেদের প্রয়োজন কি? "দেবতা-রাধননির্ব্বিকল্পসমাধ্যাদিসিদ্ধিশ্চ গান্ধর্ব্ববেদস্য প্রয়োজনং।" আয়ুর্ব্বেদ বা চিকিৎসাশাস্ত্রের মত ধনুর্ব্বেদের প্রয়োজনও সাক্ষাৎ-ভাবে পরমার্থ-মূলক নহে, কিন্তু যে সমাজ পরমার্থসাধনায় মূলতঃ ব্যাপৃত থাকিবে, বিশেষ কতকগুলি বিঘ্ননিরাকরণরূপ একটা আনুষঙ্গিক প্রয়োজন তাহার আছে, সে প্রয়োজন সিদ্ধির ভার ক্ষত্রিয়ের উপর ন্যস্ত এবং "ক্ষত্রিয়ানাং স্বধর্ম্মাচরণং যুদ্ধং দুষ্টদস্যুচৌরাদিভ্যঃ প্রজাপালনং চ ধনুর্ব্বেদস্য প্রয়োজনং।" কিন্তু এই ধনুর্ব্বেদের শিক্ষা রজোগুণাব-লম্বনে হয় না; কারণ, যে মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্ত্রমুক্ত আয়ুধসকলকে ধনুর্ব্বেদে ধনু বলা হইয়াছে, তাহাদের অধিদেবতা ও মন্ত্র আছে,—অতএব দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করা আজকাল-কার রজঃসর্ব্বস্ব যোদ্ধাদের কর্ম্ম নহে। ভারতীয় প্রাচীন পর-মার্থসাধক সমাজের ক্ষত্রিয়গণই ধনুর্ব্বেদের অধিকারী ছিলেন, তাই কলিযুগের ক্ষত্রিয়ম্মন্য নূতন যোদ্ধাদের সময়ে ধনুর্ব্বেদ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কতদূর চিত্তজয়ী হইলে তবে প্রকৃত ক্ষত্রিয় হওয়া যায়, কতদূর আধ্যাত্মিক উন্নতি হইলে তবে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি,—আর ভুলিয়া গিয়াছি যে, পরমার্থরূপ প্রয়ো-জনের নিকট দাস্য গ্রহণ করে বলিয়াই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করা,—ক্ষত্রিয় রাজনৈতিক উচ্চাশার দাস নহে। চতুর্থ উপবেদ "অর্থশাস্ত্রং চ বহুবিধং নীতিশাস্ত্রং অশ্বশাস্ত্রং গজশাস্ত্রং শিল্পশাস্ত্রং সূপকারশাস্ত্রং

চতুঃষষ্টিকলাশাস্ত্রং চেতি।" যখন সকলপ্রকার অর্থ বা প্রয়োজনের সাধনা নির্ব্বেদদ্বারের মধ্য দিয়া মানুষকে ক্রমাগত পরমার্থের দিকে ধাবিত করে, তখনই সমাজের সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থা; আর্য্যসমাজ সে অবস্থা লাভ করিয়া একসময় সর্ব্ববিধ অর্থশাস্ত্রের আলোচনা করিত। যে সমাজ পরমার্থকেই লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া পরমার্থপথের পথিক হইয়াছে, সকল লৌকিক অর্থের যথার্থ উৎকর্ষ ও সামঞ্জস্য তাহার পক্ষেই সম্ভব,—তাহাদের প্রকৃত ভোগ ও ত্যাগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা তাহার পক্ষেই সম্ভব;—যে সমাজ পরমার্থপথের পথিক হয় নাই, লৌকিক অর্থসমূহ তাহার অনর্থই ঘটাইতে থাকে এবং পরস্পর বিরোধভাবাপন্ন হইয়া অশান্তি উৎপন্ন করে। আজকাল পাশ্চাত্য জগতে এরূপ অনর্থ ও অশান্তি তুমুল আকার ধারণ করিতেছে।

কিন্তু অষ্টাদশবিদ্যার সুদিন বৌদ্ধযুগের বহু পূর্ব্বে অস্তমিত হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে দেখা যায়, অষ্টাদশবিদ্যা পরমার্থ-সূত্রে সুসম্বদ্ধ ও সুসংহত না হইয়া সম্পূর্ণ বিক্ষিপ্ত ও বিসদৃশভাবে পল্লবিত হইয়া উঠিয়াছে। এ অবস্থা আমরা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াছি। ভারতীয় শিক্ষার (culture) এই সর্ব্বাঙ্গ-বিচ্ছিন্ন (disorganised) ও ভগ্নাবয়ব (dismantled) অবস্থার মধ্যে বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব ঘটিল। সাক্ষাৎ-ভাবে বেদভিত্তিহীন হইলেও, যে পরমার্থদৃষ্টির দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় সমাজে নূতন সঞ্জীবনী শক্তির সঞ্চার করিল, সেই পরমার্থদৃষ্টির তাড়িত-সম্পাতে ভারতীয় শিক্ষায় আবার নূতনভাবে প্রাণসঞ্চার ও অঙ্গযোজনা হইতে লাগিল। পরমার্থভিত্তি লাভ করিবামাত্র ভারতীয় শিক্ষা (culture) আবার সর্ব্বাঙ্গসংহত (reorganised)

হইতে লাগিল। ভারতীয় শিক্ষার ইহাই একটী মৌলিক রহস্য; বর্ত্তমানযুগে শিক্ষাসমস্যা লইয়া যাহাদের মস্তিষ্ক ঘর্ম্মাক্ত, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া এই রহস্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। যদি আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা বা cultureকে পুনর্ব্বার আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া সুসমন্বিত ও সর্ব্বাঙ্গসংহত (organised) করিতে হয়, তবে পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়কে সর্ব্বাগ্রে উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাকে "জাতীয় শিক্ষা" নাম দিয়া আমরা উচ্চ কলরব করিতেছি, সে শিক্ষার "জাতীয়ত্ব" এই রহস্যের মধ্যে নিহিত।

ভারতীয় শিক্ষার পঙ্কিল, রুদ্ধগতি প্রবাহ বৌদ্ধযুগে যেন একটা নূতন খাত প্রাপ্ত হইল; সে খাত পরমার্থসাধনাদ্বারা কর্ত্তিত, অতএব ভারতীয় শিক্ষা সেই খাত আশ্রয় করিয়া ভারতকে প্লাবিত করিল। কিন্তু প্রাচীন খাতের সহিত এই নূতন খাতের সম্যক্ যোগ স্থাপিত হয় নাই, সেই জন্য অদীর্ঘকালেই প্রবাহ মন্দীভূত হইল,—শিক্ষা, গতি হারাইয়া আবার পঙ্কিল হইয়া উঠিল। শঙ্করাবির্ভাবের পর এই শিক্ষার প্রবাহ আবার প্রাচীন খাতে পরিচালিত হইল। সে সময় ভারতীয় সনাতন সমাজ সমগ্র দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে; * প্রায় কলিযুগের সূচনা হইতেই, অজস্র নব নব জাতির আবির্ভাব ও অভ্যুদয়ে, বৈদিক আর্য্য সমাজের আদর্শ ক্রমাগত সামাজিক বিপ্লবের সহিত চতুর্দ্দিকে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে বিজয়লাভের জন্য যুঝিতেছিল, শঙ্করাবির্ভাবের পর দেখা গেল যে, সেই আদর্শ সমগ্র ভারতকে আত্মসাৎ করিয়াছে।

* "ভারতের সাধনা"—সমাজসম্বন্ধীয় প্রবন্ধদ্বয়।

কিন্তু একই পারমার্থিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও, সে যুগের এই বিশাল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা সনাতন শিক্ষা বা cultureএর প্রকৃত সমন্বয় ও পুনরভ্যুদয়ের পক্ষে অনুকূল ছিল না। যাহা উদরস্থ করা যায়, তাহাকে সম্যক্‌রূপে পরিপাক করা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার; ভারত-প্রচলিত অনেক অনার্য্যসেবিত অবৈদিক ভাব ও আদর্শ, বৌদ্ধধর্ম্মরূপ পাকযজ্ঞে নূতন পরিণাম লাভ করিয়া, উহার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল; সেগুলি দুষ্পাচ্য হইলেও, বৈদিক সনাতন-আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত উহাদিগকেও আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। সে সমস্ত হজম করা যে সময়সাপেক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু অধিক সময় লাগিলেও, ঐরূপ পরিশ্রমের ফলে বৈদিক পরমার্থসাধনার মধ্যে যে অত্যদ্ভুত সমন্বয়-শক্তির অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, তাহা একটী অমূল্য লাভের বিষয়; এই সমন্বয়শক্তির প্রয়োগে ভারতের সর্ব্বত্র পরমার্থসাধনায় বহুবিধ ক্রম, সোপান ও অধিকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমানযুগে স্বামী বিবেকানন্দ জগতে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, ভারতীয় পরমার্থসাধনার সমন্বয়শক্তি অসীম, উহা বসুন্ধরার মত পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মকে ক্রোড়ে স্থান দিতে পারে।

বাস্তবিকই ঐ সময়ন্বয়শক্তি প্রাদেশিক ভাষাগত ও আচারগত সমস্ত ভেদকে অগ্রাহ্য ও অতিক্রম করিয়া, শাঙ্করযুগের পর হইতেই এ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বহুবিধ উপধর্ম্ম ও সাধন-পদ্ধতির ভিতর দিয়া কিরূপে সনাতন বৈদিক পরমার্থ-সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসিয়াছে, তাহা ভাবিলে চিত্ত বিস্ময়াপ্লুত হয়। এই অত্যদ্ভুত কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাদেশিক সাহিত্য ও কাব্যাদির

সাহায্যে লোকশিক্ষার কাজও অগ্রসর হইয়াছে, এবং সে শিক্ষায় ভারতীয় শিক্ষার সনাতন গতি ও প্রকৃতি স্বভাবতঃই রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সনাতনধর্ম্মের সমন্বয়শক্তির পূর্ব্বোক্ত ভারত-ব্যাপী লীলাবিস্তারের একটা আশ্চর্য্য লক্ষণ এই যে, সমস্ত ব্যাপারটা স্বতঃই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে,—প্রত্যক্ষ কোনও কেন্দ্রশক্তি ভারতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নানাস্থানে একযোগে ঐ ব্রত সাধন করায় নাই; নানা প্রদেশে অনেক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়া ঐ ভারতব্যাপী অনুষ্ঠানে নিয়ন্তৃত্ব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষক্ষেত্রে কখনও একজোট হইয়া কার্য্য করেন নাই, বা সে ভাব প্রদর্শন করেন নাই। প্রত্যক্ষক্ষেত্রে এই সংহতি ও একযোগিতার অভাব বৌদ্ধযুগের পর হইতে ভারতীয় সনাতন সমাজে সুপষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ইহার প্রকৃষ্ট হেতুও বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্বোক্ত এক পারমার্থিক সমন্বয়শক্তি ব্যতীত প্রত্যক্ষক্ষেত্রে আর কোনও শক্তি ঐ সমাজে বা জনসমষ্টির মধ্যে একত্ব বা সমতা বিধান করিবার পক্ষে কার্য্য করিতেছিল না। বেদভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত ঐ ভারতব্যাপী বিশাল সমাজ আপনাকে আপনি বুঝিত না,—কারণ, মুসলমানাগমনের পূর্ব্বে অপরের তুলনায় আত্মদৃষ্টি উদ্রিক্ত হইবার অবসর হয় নাই। আবার ভাষা ও আচার-ব্যবহারের ভেদ সেই বিশাল সমাজের সর্ব্বত্র একটা খণ্ডিতভাবকে জাগ্রত করিয়া রাখিত, এবং নানা প্রদেশখণ্ডের লৌকিক জীবনলীলা সম্পূর্ণ বিভিন্ন সূত্রে গ্রথিত থাকায়, লোকের আত্মদৃষ্টি ক্রমাগতই সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইতেছিল। তাহারা একটা ভারতব্যাপ্ত আত্মদৃষ্টি আরোপ করিবার খুবই অল্প অবসর

লাভ করিত। তাহারা কেবল একই পরমার্থরূপ প্রয়োজনসূত্রে পরস্পরের সহিত গ্রথিত ছিল এবং ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে কতকটা একরকম শিক্ষা বা বিদ্যানুশীলনের সূত্রেও সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রয়োজনসূত্রের বিরুদ্ধে শত প্রকারের প্রয়োজন-সূত্র তাহাদিগকে পরস্পরের সহিত বিশ্লিষ্ট করিবার পক্ষে কার্য্যকরী হইতেছিল।

একটা আত্মদৃষ্টিবিরল বিশাল সমাজে যখন এইরূপ অনৈক্য-বিধায়িনী শক্তিরই অধিক প্রাদুর্ভাব হয়, তখন আশা করা যায় না যে, উহার প্রাচীন শিক্ষা (culture) পুনরভ্যুদিত ও কেন্দ্রীভূত হইয়া নূতন উন্নতিপথে ধাবমান হইবে। একটা দেশের জীবনী-লীলা সমসূত্রে গ্রথিত ও সুসংহত (organised) না হইলে, সে দেশের শিক্ষা (culture) সুসংহতভাবে (organised) উন্নতিপথে ধাবিত হয় না। যখন সেই বহুল প্রাচীন অল্পায়তন বৈদিক সমাজে অষ্টাদশ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তখন সেই সমাজের জীবনজাল ঋষিদের দ্বারা এক ছাঁচে নিয়ন্ত্রিত হইত। অতএব যখন সনাতন আর্য্যসমাজ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সেই সময় হইতে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা সুসমন্বিতভাবে পুনরভ্যুদিত হইয়া ক্রমোন্নতি লাভ করিবার সুযোগ পায় নাই। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে দেশের নানাস্থানে প্রাচীন বিদ্যাদির অনুশীলন যে উপায়ে ও যে পরিমাণে হইয়াছে, তাহা অনেকেই জানেন। কিন্তু re-organisation of national culture বলিতে সনাতন শিক্ষার যে সর্ব্বাঙ্গীন প্রাণ-সঞ্চার, কেন্দ্রসন্নিবেশ ও অব্যাহত অভ্যুদয় বুঝায়, তাহা, কতিপয় বৌদ্ধ-শতাব্দীর উদ্দীপনা বাদ দিলে, কলিযুগের পর ভারতে আর

দেখা যায় নাই। বৌদ্ধযুগের উদ্দীপনাতেও সনাতনত্বের হানি ঘটিয়াছিল এবং উহাতে ভারতীয় সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা (culture) আত্মপ্রকাশ করে নাই।

কিন্তু নৈরাশ্যের বা দুঃখের কোনও কারণ নাই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, চতুর্যুগবিভাগ কেবল ভারতের পক্ষেই খাটে, অন্য দেশের পক্ষে নহে; এ নিগূঢ়তত্ত্বের অর্থ এই যে, ভারতেই কেবল অমর-আদর্শ ইতিহাস গড়ে ও মানুষ গড়ে, অন্য দেশে মরণশীল মানুষই আদর্শ গড়ে ও ইতিহাস গড়ে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বৈদিক আদর্শ বারম্বার আপনার অভিব্যক্তির অনুরোধে মানুষসমষ্টি গড়িয়াছে,—ইতিহাস গড়িয়াছে,—এবং কালধর্ম্মবশে গড়া জিনিস পচিলেই আবার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সেই অমর আদর্শ কলিযুগে ভারতকে আপনার লীলাক্ষেত্ররূপে আবার ব্যবহার করিবে, তাই বৌদ্ধযুগের অবসানাবধি সমগ্র ভারতে নূতন সাধকসমাজের পত্তন করিয়া লইল; তারপর উহার অদ্ভুত সমন্বয়শক্তির বিকাশ করিতে করিতে, উহাকে আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে বহির্জগৎ হইতে ভারতে আনয়ন করিল এবং অধুনা সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়রূপ মহাসমস্যার সমাধান করিয়া, organisation-রূপ পাশ্চাত্য কৌশলের সাহায্যে ভারত যাহাতে প্রাচীন শিক্ষা ও সম্পদের পরম-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহারই বিপুল আয়োজন চলিয়াছে। অতএব, হে আর্য্যসন্তান! তোমার অতীত নৈরাশ্যময় নহে,—প্রকৃত তত্ত্বদর্শী হইয়া অতুল গৌরবে গৌরবান্বিত তোমার সুনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও।

ভারতীয় সনাতন শিক্ষাকে (culture) নবোদ্ভাসিত পরমার্থ-

দৃষ্টির দ্বারা re-organise করিবার জন্য আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগে উদ্যোগী হইতে হইবে; ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা পূরণ করিবার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট পথ। নবোদ্ভাসিত পরমার্থদৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি। যে উপচীয়মান পারমার্থিক শক্তিভাণ্ডার আমাদের জন্য উদ্‌ঘাটিত করিতে পরমহংসদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শক্তিভাণ্ডারে অধিকার পাইয়া স্বামীজী পরমার্থদৃষ্টিলাভ করিয়াছিলেন; যাঁহারা বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাসমস্যা পূরণে নেতৃত্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' বৌদ্ধযুগে বুদ্ধের নির্ব্বাণ যে পরমার্থদৃষ্টির সঞ্চার করিয়া শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয় ঘটাইয়াছিল, বর্ত্তমানযুগে আবার সেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে; এই পুনঃস্থাপিত পরমার্থকেন্দ্র হইতে মহাশক্তিপুঞ্জ বারম্বার বিচ্ছুরিত হইয়া, কালোচিত সুকৌশলে ভারতের সর্ব্ববিধ অতীত সাধনা ও সিদ্ধিকে নবজীবন দান করিবে।

কালোচিত সুকৌশলের অর্থ সমষ্টিশক্তির পরমার্থনিষ্ঠ বিকাশ ও উহার চিন্তা ও সাধনার কৈন্দ্রেকাবর্ত্তিত, সুসমন্বিত, উন্নতিবিধান; —(ইংরাজীতে বলা যায়—growth of collective life on a spiritual basis and progressive organisation of its thought and activity)। আমরা দেখিয়াছি, ভারতবর্ষে পরমার্থসাধনার কেন্দ্রই প্রকৃত-শিক্ষাবিস্তারের উপযুক্ত ও সনাতন কেন্দ্র। অতএব এই কেন্দ্র হইতে আধুনিক যুগে কিরূপ আচার্য্যগণের দ্বারা সমষ্টিগঠনযোগ্য শিক্ষা কি ভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়া প্রাচীন ও আধুনিক সর্ব্ববিধ বিদ্যার পরমার্থমূলক তাৎপর্য্য ও গতি নির্দ্দিষ্ট

করিয়া দিবে, তাহাই আমরা আগামীবারে আলোচনা করিব; বলা বাহুল্য, শিক্ষাকেন্দ্র যাঁহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকে, শিক্ষা বা culture প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদেরই আয়ত্তাধীন।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাসংঘর্ষ।

(উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০)

"ভারতে আমাদের উন্নতিপথে দুইটী প্রবল বিঘ্ন বিদ্যমান; জাহাজের সংকীর্ণ পথে দুইপার্শ্বে দুইটী বারিগর্ভস্থিত পাহাড়ের (সাইলা ও চেরিব্ডিস্) মত এই বিষম বিঘ্ন দুইটী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান,—একটী জীর্ণ হিন্দুয়ানির গোঁড়ামী ও অপরটী আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতা। যদি এই দুইটীর একটীকে দেশের জন্য মনোনীত করিতে হয়—আমি প্রাচীন হিন্দুয়ানির গোঁড়ামির পক্ষেই মত দিব, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার পক্ষে নহে। কারণ, যিনি সংকীর্ণ প্রাচীন হিন্দুয়ানির ভক্ত, তিনি কতকটা অজ্ঞানান্ধ হইতে পারেন, তাঁহার মতামত অপরিপক্ক হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার একটা মনুষ্যত্ব, একটা প্রতিষ্ঠাভূমি, একটা বলবত্তা আছে,—তিনি আপন পায়ে ভর দিয়া দণ্ডায়মান। আর যিনি পাশ্চাত্য ছাঁচে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তিনি মেরুদণ্ডবিহীন, তিনি যখন যেমন সুযোগ পাইয়াছেন, নানা বিসদৃশ ভাব ও আদর্শ আহরণ করিয়া আপনার মধ্যে পুঞ্জীকৃত করিয়াছেন,—সেগুলিও আবার সম্যক্ রূপে আয়ত্ত বা পরিপাক করা, অথবা পরস্পর সমঞ্জসীভূত বা সমন্বিত করা হয় নাই। তিনি আপনার পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ান না এবং তাঁহার মস্তিষ্কও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া এক ভাব-কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইঁহার সৎসাধনার পশ্চাতে কোন্ প্রেরণাশক্তি বিদ্যমান? ইংরাজ-সমাজের প্রশংসাসূচক পৃষ্ঠপীড়ন। * * *

"এই সমগ্র প্রাচীন জাতির পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি প্রত্যেক হিন্দুর ভিতরে আশৈশব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ঐ মূল ছন্দেই তাঁহার জীবনগাথা গ্রথিত করিতে হইবে,—উহারই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে নিজের ঐশ্বর্য্য-মান-যশকে, নিজের পাশ্চাত্য-বিদ্যা-বিজ্ঞানাদির শিক্ষাকে আনয়ন করিতে পারিলে, আদর্শ হিন্দুচরিত্রের মূলরহস্য সমাধান করা হইল। অতএব একদিকে সেই প্রাচীন হিন্দুয়ানির

গোঁড়াভক্ত—যিনি সমগ্র জাতির প্রাণশক্তির উৎস পরমার্থনিষ্ঠাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছেন, এবং অপরদিকে ঐ পাশ্চাত্যভাবভাবিত নব্য—যাঁহার করপুট পাশ্চাত্য 'কেমিক্যাল' বা মেকি সোণাজহরতাদিতে ভরা বটে, কিন্তু যিনি জাতির উদ্ভবস্থান পরমার্থনিষ্ঠার সহিত সংযোগ হারাইয়াছেন,—এই উভয় পক্ষের মধ্যে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, সকলেই একমত হইয়া পূর্ব্বোক্ত হিন্দুয়ানির গোঁড়া ভক্তকেই মনোনীত করিবেন, কারণ, ইহার মধ্যে একটা আশাসূত্র রহিয়াছে। ইনি সনাতন জাতীয় জীবন-ছন্দটী বজায় রাখিয়াছেন, এবং ইহার আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা অবলম্বন আছে,—এই কারণে ইনি বাঁচিয়া যাইবেন; কিন্তু অপর ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত। ঠিক যেমন একটা মনুষ্য-দেহসম্বন্ধে দেখা যায় যে, যদি সেই দেহে জীবনসঞ্চারের কেন্দ্রশক্তিটী অক্ষুণ্ণ থাকে, যদি সেই দেহযন্ত্রের মূল ক্রিয়াটী বজায় থাকে, তবে অপরাপর ক্রিয়া সাময়িক আঘাত বা ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইলেও দেহের জীবনসংশয় ঘটে না,—আর দেখাও যায় যে ঐ সমস্ত অবান্তর ক্রিয়াগুলির প্রায়ই অবস্থান্তর ঘটিতে পারে,—ঠিক এইভাবে বুঝিতে হইবে যে, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের সমষ্টিদেহ-যন্ত্রের মূল ক্রিয়াটী অব্যাহত থাকিবে, ততদিন কিছুতেই এ জাতির ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু নিশ্চয় বলিতেছি, মনে রাখিও, যদি তোমরা পরমার্থতন্ত্রতা পরিহার কর এবং উহার পরিবর্ত্তে জড়ভ্রান্তিবিবর্দ্ধিনী পাশ্চাত্য-সভ্যতার পশ্চাতে ধাবমান হও, তবে পরিণামে তিন পুরুষে জাতিলোপ ঘটিবে,—কেন না, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে, জাতীয় জীবনসৌধ যে ভিত্তির উপর উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শূন্যগর্ভ হইয়া যাইবে; ফলে সকল দিকেই ধ্বংসলীলার বিস্তার ঘটিবে।"*

গতবারের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন অর্থাৎ পরমার্থকে লক্ষ্য ও কেন্দ্ররূপে নিরূপিত করিয়া উহারই আনুগত্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার অভিব্যক্তি হইয়াছিল। মানবজীবনের সর্ব্ববিধ আগত ও অনাগত অর্থ বা প্রয়োজন সম্বন্ধে

* রামনদে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

যথাযোগ্য তত্ত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্য প্রদান করাই শিক্ষা বা culture এর উদ্দেশ্য ; ভারতীয় শিক্ষার বিশেষত্ব এই যে, উহা মানবজীবনের আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজনসম্বন্ধীয় তত্ত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্যকে পরমার্থ-সাধনার সোপানরূপে আমাদের সম্মুখে গঠিত ও বিলম্বিত করিয়া দেয়। ভারতীয় শিক্ষার এই বিশেষত্ব রক্ষা করিবার ভার শ্রেষ্ঠ পরমার্থবিদ্‌গণই গ্রহণ করিতে পারেন ; পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে আমরা সে কথা আলোচনা করিয়াছি।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, ভারতীয় সনাতন শিক্ষা বা culture-এর একটা সর্ব্বাঙ্গীন সমন্বয় ও কেন্দ্রীকরণ—re-organisation—হওয়া বর্ত্তমান যুগের একটী প্রধান অনুষ্ঠেয় ব্রত : সে ব্রত কিরূপে উদ্‌যাপিত হইবে, তাহা আমরা আগামী বারে আলোচনা করিব। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষাসমস্যা কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, কেন না ভারতীয় শিক্ষার নূতন সমন্বয়বিধানে (re-organisationএ) যে সে সমস্যারও পূরণ হইবে, তাহা আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার প্রথম সংঘর্ষের ফলে আমাদের দেশে দুই রকম জীবের প্রাদুর্ভাব হয়,—একটী সেকালের রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দু ও অপরটী একালের শিক্ষিতম্মন্য নব্য বাবু। প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজীর উক্তিতে অল্পকথায় ইঁহাদের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা গতিহীন, পরস্পর বিচ্ছিন্নাঙ্গ ও খিন্নপ্রাণ হইয়া ক্রমশঃ অন্ধ-সংস্কারপুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। সেকালের রক্ষণশীল হিন্দু সেই সকল অন্ধ-সংস্কারের সমষ্টি ; কিন্তু

সনাতন-পথের হিসাব হারাইলেও তিনি সে পথেই দণ্ডায়মান আছেন, পথবিচ্যুত হন নাই; তাহার একটা বনিয়াদিরকমের আত্মপ্রতিষ্ঠা আছে, তিনি অপ্রতিষ্ঠ হন নাই। কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য নব্যগণের অবস্থা আরও বিপৎসঙ্কুল; তাহারা পথবিচ্যুত হইয়াছেন,—অতীতের যে সকল শুভসংস্কার একটা জাতির নব নব জীবন সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ বিজয়াস্ত্ররূপে পরিণত হয়, নব্যগণ সেই সকল সংস্কারের এলাকা অতিক্রম করিয়া উধাও হইয়াছেন,—এক কথায় তাহারা জাতির পরমার্থমূলক সনাতন জীবনকেন্দ্রের সহিত সংযোগ হারাইয়াছেন; অতএব জাতির জীবনসংগ্রামে এই সকল অপ্রতিষ্ঠ, কেন্দ্রচ্যুত জীবের বাঁচিবার আশা নাই।

এই দুইরকম জীবের নমুনা প্রদর্শন করিয়া স্বামীজী যে সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দুর পক্ষে অভয়বাণী ও একালের স্বরূপচ্যুত নব্যের সম্বন্ধে মৃত্যুলক্ষণ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহাতে অনেকেই চমকিত ও বিস্মিত হইবেন,—কারণ, অনেকেই ঠিক উল্টা বুঝিয়া বসিয়া আছেন! অনেকেই মনে করেন যে, নব্যগণ সনাতন পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযোগ হারাইলেও আধুনিক জগতের উৎকর্ষবিধায়ক প্রত্যক্ষ জীবনরীতি অবলম্বন করিয়াছেন,—অতএব তাঁহাদের এই আধুনিকত্ব আছে বলিয়াই আধুনিক জগতে তাহারা টিকিয়া যাইবেন; আর যাহারা অন্ধসংস্কারবশে ভারতীয় প্রাচীন জীবনরীতি আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছেন, আধুনিক জগতে তাহাদের টিকিবার বা দাঁড়াইবার স্থান নাই। যাহারা এরূপ মনে করেন, তাহাদের একমাত্র নজীর হইতেছে—the law of self-adaptation—অর্থাৎ, আপনার জীবনের সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সামঞ্জস্যবিধানের

নিয়ম। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মানুষের জীবন রুদ্ধগতি ও উন্নতিবিমুখ হইয়া বিনাশের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা স্বীকার করি যে, সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দু এই প্রাকৃতিক নিয়ম অবহেলা করেন; কিন্তু প্রশ্ন এই যে, একালের শিক্ষিতম্মন্য নব্য কি ঐ প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃতপক্ষে পালন করেন?—কখনই না। বরং সেকেলে হিন্দুর পক্ষে এই নিয়মপালনের সম্ভাবনা ও পথ উন্মুক্ত আছে, একালের নব্যগণ তাহাও রুদ্ধ করিয়াছেন।

নিজের জীবনের সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার একটা উপযুক্ত সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইলে, নিজের একটা জীবন—নিজস্ব একটা কিছু বজায় রাখা চাই; কারণ, কে সামঞ্জস্যবিধান করিবে? সামঞ্জস্য করিবার জন্য দুইটী বস্তু বা পক্ষ থাকা চাই ত? আমরা জিজ্ঞাসা করি, একালের আদর্শ নব্যগণ আপনাদের অতীতাগত কোনও স্বরূপ বজায় রাখিয়া, তারপর আধুনিক কালের জীবনরীতি পরিগ্রহ করিতেছেন কি? পুরুষানুক্রমিক দৈহিক রক্ত ও ইংরাজপ্রদত্ত "নেটিভ" অভিধান ব্যতীত আর কোনও ধ্রুব লক্ষণের দ্বারা আপনাদের স্বরূপকে লক্ষিত ও অবিকৃত রাখিতে চেষ্টা করিয়া, তারপর পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার স্রোতে তাহারা গা ভাসাইয়াছেন কি? যে নিজের স্বরূপেরই পরিচয় জানে না, সে আবার self-adaptation কি করিবে,—সে আবার নিজ জীবনরীতির কালোচিত পরিণাম কি করিবে? যে আত্মপরিচয় জানে না, সে কেবল পারে আপনাকে বিকাইয়া দিতে,—সে পারে বাহিরের প্রভাব ও শক্তির দাসত্বে আপনার বিলোপ সাধন করিতে।

সেকালের সংস্কারান্ধ হিন্দুও আত্মস্বরূপের প্রকৃত পরিচয় জানে

না। কিন্তু সে ত নব্যবাবুর মত self-adaptation করিতে ছুটে নাই? অতএব তাহার পক্ষে মরণবিপদ্ অত সহজে ঘনায় নাই। তাহার সংস্কারগুলি অন্ধ হইলেও তাহাকে স্বরূপভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই, সনাতন পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত রাখিয়াছে। এই সংযোগ একবার প্রত্যক্ষীভূত হইলেই, অন্ধ-সংস্কার দৃষ্টিলাভ করিবে এবং কালোচিত পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আধুনিক জগতে নূতন উন্নতিপথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া লইবে। কিন্তু স্বরূপভ্রষ্ট নব্যগণ যদি জাতীয়জীবনের পরমার্থকেন্দ্রের সহিত সংযুক্ত না হন, তবে ময়ূরের পালক গুঁজিয়া আপাতমনোরম গর্ব্বিত অঙ্গসঞ্চালনের দ্বারা কতদিন দেহের প্রকৃত স্বাস্থ্য বজায় রাখিবেন? ইতিমধ্যেই, "জাতীয় শিক্ষা" "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রভৃতির উচ্চরোলের মধ্যে একূল ওকূল দুকূল হারাইবার আশঙ্কাই কি স্পন্দিত হইতেছে না? ইতিমধ্যেই ঐ সংশয় কি সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত হইতেছে না যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে একটা যোগাসমন্বয়াত্মক, ধ্রুব, নবীন স্বরূপ গড়িয়া দিতেছে না,—কেবল উহার প্রাচীন স্বরূপটাকে নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে? ইতিমধ্যেই কি আমরা বুঝি নাই যে, পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে দেশে যে নূতন শিক্ষিত-সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে, তাহারা কেবল পাশ্চাত্যের ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দাসত্বে এবং ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাহীনতায় সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট,—এতদ্ব্যতীত তাহাদের কোনও রূপ সাধারণ স্বরূপবত্তা নাই? অবশ্য পাশ্চাত্যের নকল-করা অনেক রকম ভাব অজীর্ণাবস্থায় উদরস্থ হইয়া রহিয়াছে;—যথা, রাজনৈতিক জাতীয়ত্ব, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি। ইহাতে মস্তিষ্কের বোঝা-ই বাড়িয়াছে,

দৃষ্টিসঞ্চালন প্রখর ও দ্রুত হইয়াছে, রসনার উদ্গীরণশক্তি দশগুণ বাড়িয়াছে,—কিন্তু সেকালের মানুষ অপেক্ষা যে একালের মানুষ বড় হইয়াছে, তাহার প্রমাণ কি? বরং এখনও যাঁহাদের চক্ষু আছে, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, মানুষ সচরাচর পূর্ব্বাপেক্ষা স্বার্থপ্রিয়, বিরোধপ্রিয় ও "বিষকুম্ভপয়োমুখ" হইয়াছে, এবং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড হারাইতেছে,—এককথায় ভারতের সনাতন জীবনাদর্শ—যদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবনাদর্শ জগতে অন্যত্র কোথাও অভিব্যক্ত হয় নাই, সেই জীবনাদর্শ—আধুনিক নব্যশিক্ষিতদের জীবনে ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিতেছে।

সুখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্যশিক্ষা ভারতীয় শিক্ষার পূর্ব্ব-সংস্কারকে একেবারে বিলুপ্ত ও তিরোহিত করিতে পারে নাই। ঐ পূর্ব্বসংস্কার আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটা আশ্চর্য্য রক্ষণশীলতা জাগাইয়া রাখিয়াছিল। প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ (rationalism) উন্নতির দোহাই দিয়া ঐ রক্ষণশীলতাকে কোণঠেসা ও অপদস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল বটে, কিন্তু শশধর পণ্ডিত, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতির যুগে, রক্ষণশীলতার স্বপক্ষেই পাশ্চাত্য যুক্তি-বাদকে প্রয়োগ করা অন্ততঃ কতক পরিমাণে যে সম্ভবপর, তাহা শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বোধগম্য হইল। সেই সময় হইতে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রয়োগে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন করিবার একটা নূতন পথ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; আজ পর্য্যন্ত অনেক শিক্ষিত ভারতবাসী এই পথের পথিক হইয়াছেন।

কিন্তু এ পথ দিয়া ভারতীয় শিক্ষার (culture) পূর্ণ মর্ম্ম-গ্রহণ ও পূর্ণমর্য্যাদাস্থাপনের সম্ভাবনা নাই। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের

যেমন গুণও আছে, তেমনি দোষও অনেক আছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসের অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রসূতি; সে অভিজ্ঞতার মধ্যে নূতনত্বও আছে, সংকীর্ণতাও আছে,—সে অভিজ্ঞতার দ্বারা ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা ও জীবনলীলার মর্ম্মগ্রহণ করা সম্ভবপর নহে।

দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য-জগৎ বর্ব্বরতায় নিমগ্ন ছিল; ভয় ও বলের তাণ্ডবলীলা এবং বিরোধাত্মক উত্তেজনা দ্বারা সেই বর্ব্বরতার যুগ পরিব্যাপ্ত ছিল। সে অবস্থায় মানবজীবনের কোনও উচ্চপরিণাম ঘটার সম্ভাবনা ছিল না। কালে খৃষ্টধর্ম্মের ভ্রাতৃভাব ও তৎপ্রসূত সামঞ্জস্যনীতি সেই আদিম বিরোধ-প্রবণতাকে যদি প্রশমিত না করিত, যদি গ্রীস-রোমের মনুষ্যোচিত উচ্চানুশীলন পাশ্চাত্য-জাতিদের উচ্চতর বৃত্তিসকলকে উদ্দীপিত না করিয়া দিত, যদি ইস্‌লামের শিক্ষাসম্বন্ধীয় সার্ব্বজনীনতার দৃষ্টান্তে নিতান্ত সংকীর্ণ গণ্ডীসমূহে আবদ্ধ উচ্চশিক্ষা ইউরোপের জনসাধারণের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া শিক্ষাসঞ্চারের নবযুগ (Renaissance) আনয়ন না করিত, তবে পাশ্চাত্য ইতিহাস গ্রীস ও রোমের ইতিহাসেই পর্য্যবসিত হইত। পাঁচ-ছয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তীকালে যখন পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রকৃতপক্ষে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদের অধিকার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, তখন গ্রীসীয় ও রোমীয় অপরা-বিদ্যাদির মূলে উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্বেরও অনুশীলন হইত। পরে যখন এই 'একচেটিয়া' বন্দোবস্ত ভাঙ্গিতে লাগিল, তখনও অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় বন্দোবস্ত সহজে ভাঙ্গে নাই। ইউরোপীয় মধ্য-যুগের উচ্চ অধ্যাত্মতত্ত্ব কখনও সাধারণশিক্ষার অঙ্গীভূত হয় নাই। যে গ্রীসীয় ও রোমীয় শিক্ষা ধর্ম্মানুশীলনের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া

ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল, 'রেনেশাঁসের' (Renaissance) পরে জনসাধারণ তাহাকে বিযুক্ত ও পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদের সহিত জনসাধারণের ব্যবধান আপোষে ভাঙ্গে নাই, সেইজন্য বিগত পাঁচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে যে জন-সাধারণ সমুত্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব আমরা দেখিতে পাই না। যে সময় হইতে পাশ্চাত্য-শিক্ষা পাশ্চাত্য-জনসাধারণের সম্পত্তি হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় হইতেই ধর্ম্মযাজকদের সহিত তাহাদের বিরোধও ধূমায়িত হইয়াছে, সেই সময় হইতে ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি-পত্তি ও প্রভাবও কমিয়া আসিয়াছে ; এইরূপ অবস্থান্তর সংঘটনের মধ্যে 'প্রোটেষ্টাণ্ট'-সম্প্রদায়ের উত্থান একটী আনুষঙ্গিক ব্যাপার।

বিগত পাঁচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে ইউরোপীয় মধ্যযুগের অধ্যাত্মমূলকতা স্থান পায় নাই। সে যুগের যাজকসম্প্রদায় সাধারণ লোককে কুসংস্কারাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল ; জনসাধারণ তাহারই প্রতিশোধরূপে আধুনিক নবজীবন-লাভে খৃষ্টধর্ম্মের পূর্ব্বগৌরব ও উচ্চাসন অবহেলা করিয়াছে এবং উহার নিয়ন্তৃত্ব বর্জ্জন করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য-শিক্ষায় খৃষ্টধর্ম্ম একটী উল্লেখযোগ্য সহকারী বটে, কিন্তু সে সহকারীরও ডাক পড়ে যেন সুবিধামত, অবসরমত বা প্রয়োজনমত! পাশ্চাত্য আপনার ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষকে উপাদান করিয়া, কার্য্যসিদ্ধির অনুকূল বুদ্ধি আপনার মস্তিষ্ক হইতে প্রয়োগ করিয়া, এবং আবশ্যকমত সমমতিবিশিষ্ট পাঁচজনে সমবেত হইয়া, আপনাকে বর্ত্তমান অবস্থায়

উন্নীত করিয়াছে; যে ধর্ম্ম তাহাকে ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ অপেক্ষা অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে অধিক আস্থা-স্থাপন করিতে বলে, যে ধর্ম্ম সিদ্ধি-অসিদ্ধি বিচার না করিয়া সকলক্ষেত্রে সাধুবুদ্ধি প্রয়োগ করিতে বলে, সে ধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্বের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার খাপ-খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সেই জন্য পাশ্চাত্য-জগতের আধুনিক উন্নতির মূলে খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব নাই,—সহকারিতা বেশীভাগ মুখের কথাতেই আছে।

শিক্ষা বা cultureএর মূল উদ্ভবস্থান অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতেই উহা উৎপন্ন ও পল্লবিত হয়। জড়বিষয়সম্বন্ধীয় প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাই পাশ্চাত্যশিক্ষার উদ্ভবস্থান; ইন্দ্রিয়জপ্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার একমাত্র পরমপ্রমাণ। যে সত্য ঐরূপ প্রমাণের কাছে ধরা দেয় না, তাহা hypothesis বা আন্দাজ মাত্র। যদি কোনও দার্শনিক উচ্চতত্ত্বের সমীচীনতা পাশ্চাত্যে প্রতিপন্ন করিতে হয়, তবে জড়বিষয়ের প্রত্যক্ষক্ষেত্রে উহার যোগ্য ফল ফলাইয়া দেখাইতে হইবে। পাশ্চাত্য কেবল জড়বিজ্ঞানের ভাষা ও কৌশল বুঝে,—কারণ, উহাই কেবল তাহার প্রমাণক্ষেত্রের এলাকার মধ্যে অবস্থিত। পাশ্চাত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শন নাই, কেবল অনুমান লইয়া তাহার কার-কারবার।

পাশ্চাত্য-দর্শনে প্রত্যক্ষদর্শনের নজির নাই বলিয়া, পাশ্চাত্য-জাতিদের জীবন আপনাকে দার্শনিক-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। যে মধ্যযুগের খৃষ্টধর্ম্ম অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষদর্শনের স্পর্দ্ধা রাখিত, তাহা ত অনেক পূর্ব্বেই যবনিকার আড়ালে সরিয়া

পড়িয়াছে। অগত্যা ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণ, এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গণ্ডীবদ্ধ থাকাতে জড়বিজ্ঞানই পাশ্চাত্য-শিক্ষার ঔরসজাত পুত্র,—সূক্ষ্মতত্ত্বের বা অধ্যাত্মের দর্শনশাস্ত্রাদি জড়বিজ্ঞানের অনুচর পোষ্যবর্গ।

ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষায় সত্যের একমাত্র গ্রহীতা হওয়ায়, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় সত্য কখনই অনুমানের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রমাণের উপর দাঁড়াইতে পারে না। যাহা শ্রেষ্ঠ প্রমাণে প্রমাণিত হয়, তাহার উপরই মানুষ জীবনতরী ভাসায়। অতএব জড়জগতের ফলাফল বিচার না করিয়া অতীন্দ্রিয় সত্যের উপর জীবনতরী ভাসাইতে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ কখনই মানুষকে উৎসাহিত করিবে না। বাস্তবিকই ইংরাজীশিক্ষিত দেশহিতৈষীদের মুখে অনেক স্থলেই শুনা যায় যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়াই আমাদের দেশটা গোল্লায় গিয়াছে। এ সমস্ত পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের জের। এই পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষার মর্ম্মগ্রহণ করা যাইবে না। ভারতীয় শিক্ষা (culture) অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ও অতীন্দ্রিয় সত্যকে পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করে, সেইজন্য জড়ক্ষেত্রের ফলাফলের অপেক্ষা না রাখিয়া অতীন্দ্রিয় সত্যের সাধনায় মানুষকে নিযুক্ত করে; যদি ইন্দ্রিয়াতীত সত্যই শ্রেষ্ঠ সত্য হয়, তবে ভারতীয় ইতিহাস ও শিক্ষা সহস্র বাহ্য উত্থান-পতনের মধ্যেও ঐ সত্যসম্ভূত অমরত্বে অমর হইয়া থাকিবে।

পাশ্চাত্য জাতিরা পাঁচ-ছয় শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতপক্ষে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে প্রাচীন না বলিয়া

অর্ব্বাচীনই বলিতে হইবে। একটা জাতি যতই প্রাচীন হয়, ততই তদন্তর্ভুক্ত মানবের মনে সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার গুরুত্ব অধিকতর উপলব্ধি হয়, এবং সেই পরিমাণে ব্যক্তিগত মত ও যুক্তির উপর একান্ত বা অন্ধ নির্ভরশীলতা কমিয়া আসে। প্রাচীনের মধ্যে একটা স্থৈর্য্য ও সতর্কতা থাকে, অর্ব্বাচীনের মধ্যে ততটা থাকে না। পাশ্চাত্য-শিক্ষার মধ্যে ব্যক্তিগত মত-স্বাতন্ত্র্যের গৌরব সমগ্র জাতির অভিজ্ঞতার প্রতি ফিরিয়া চাহিবার অবসর দেয় না, উহার এমনই একটা চাঞ্চল্য আছে। এই মতস্বাতন্ত্র্যের ঔদ্ধত্য পাশ্চাত্যদের কার্য্যক্ষেত্রের সংহতি-নিষ্ঠতার দ্বারা অনেকাংশে নিয়মিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশে ততটা অহিতকর হইতে পারে না। কিন্তু পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বাধীনমতের ধুয়া আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষাকে ধৈর্য্য সহকারে বুঝিবার চেষ্টায় নব্য-দিগকে উৎসাহিত না করিয়া অনবরত বিচিত্র মতামতের উদ্ভাবন ও ঘোষণায় উত্তেজিত করিতেছে। যে যুক্তিবাদে স্বাধীন মতামতের গৌরব বহুযুগব্যাপী জাতীয় অভিজ্ঞতার গৌরব অপেক্ষা উচ্চাসন এত সহজে অধিকার করিতে পারে, সে যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও শিক্ষার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার সামর্থ্যলাভ করা যায় না। আর অর্ব্বাচীন পাশ্চাত্য জাতিগণ ইউরোপীয় মধ্যযুগের পরেই ইউরোপীয় পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার ধারা ছিন্ন করিয়া,—খৃষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তৃত্ব বর্জ্জন করিয়া,—রাজা ও প্রজার স্বাধীনতার সামঞ্জস্যের দ্বারা নূতন ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছিল। সেই সমস্ত জাতি যুগযুগান্তপ্রবাহিত অভিজ্ঞতাধারার গৌরব কিরূপে

বুঝিতে পারিবে? এমন কি, ইংরাজজাতির মধ্যে ঐ অভিজ্ঞতার মর্য্যাদা ও তজ্জনিত স্থৈর্য্য যতটা বিদ্যমান, মার্কিনজাতির মধ্যে কি ততটা আছে?

পাশ্চাত্যদিগের অর্ব্বাচীনতার আর একটী কুফল পাশ্চাত্য ক্রম-বিকাশবাদে নিহিত দেখা যায়। এই ক্রমবিকাশবাদকে আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ ঐন্দ্রজালিকের যষ্টির মত জীবজগৎ ও জড়জগতের রহস্যোদ্‌ঘাটনে ব্যবহার করিতেছেন। এই ক্রমবিকাশ বাদের পরিচয় দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবল উহার একটা মূল কথার উল্লেখ করিব। জীব বা জড়ের মধ্যে যাহা বিকশিত ছিল না, তাহা কিরূপে বিকশিত হইল, ক্রমবিকাশবাদ তাহাই ব্যাখ্যা করে। এখন প্রশ্ন এই যে, যাহা বিকশিত হইল, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত হইল, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল কি না? বিকশিত হইবার পূর্ব্বে কোনও না কোনও ক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না? পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ এ প্রশ্নের মীমাংসায় উদাসীন; উহা ব্যক্ত পরিণাম লইয়াই ব্যস্ত, অব্যক্ত অবস্থা সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না; অর্থাৎ, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান evolution স্বীকার করে, involution স্বীকার বা গ্রাহ্য করে না। ফলে দাঁড়ায় এই যে, যে অবস্থায় কিছু ছিল না, সে অবস্থা অর্থাৎ অসৎ হইতে, যে অবস্থায় কিছু আছে, সে অবস্থা অর্থাৎ সৎ হইল,—ইহাই পাশ্চাত্য অভিব্যক্তি-বাদের সিদ্ধান্ত। যদি বল, উহা অব্যক্ত সম্বন্ধে কোনও মতামত দিতে চাহে না, অব্যক্ত সৎ কি অসৎ তাহাও বলিতে চাহে না, তবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মারাত্মকভাবে একদেশদর্শী হইল; এরূপ

অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের দ্বারা জড়তত্ত্বের বা জীবতত্ত্বের সমীচীন ব্যাখ্যান হওয়া অসম্ভব। Evolutionএর সঙ্গে সঙ্গে involution স্বীকার না করিলে জীবতত্ত্ব ও ইতিহাসের প্রকৃত ব্যাখ্যা বা মীমাংসা পাওয়া সম্ভবপর নহে। ভারতীয় বিজ্ঞান বা পরিণামবাদ উক্ত দুইটা তত্ত্বই স্বীকার করে, সেই জন্য কালতত্ত্ব ও মানবীয় উন্নতি (human progress) সম্বন্ধে উহার সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত হইতে বিলক্ষণ।

'বাইবেলে'র সৃষ্টিতত্ত্বে দুইটা বিসদৃশ মতের জোড়াতাড়া দেওয়া আছে,—একটা ভারতীয় স্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি, আর একটা আকস্মিক সৃজন বা হুকুমদারীর সৃজন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ অনেক রকম সৃষ্টিবাদের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যং, সংযোগ এষাং" ইত্যাদি। হুকুমদারীর সৃজন-ব্যাপার 'যদৃচ্ছা'-সৃজনের সঙ্গে মিলে। "Let there be light and there was light"—ইহাকে হুকুমদারীর সৃজন বলিতেছি; 'আদিতে বাক্য ছিলেন'—অর্থাৎ স্ফোটবাদের প্রতিধ্বনি—গ্রীকদিগের যোজনা। একটা শূন্যগর্ভ অসৎ-রূপ সূচনা হইতে উজ্জ্বল ব্যক্ত পরিণামের সঙ্ঘটন প্রাচীন পাশ্চাত্যজাতিদের কল্পনায় বিসদৃশ ঠেকিত না। তাহারা আপনাদের জীবনলীলার অতীত সূচনাকে বর্ব্বরতার দ্বারা তমসাচ্ছন্ন দেখিতে পায়; তাহাদের অনতিদীর্ঘ ইতিহাসে দুর্ভেদ্য অন্ধকার হইতে উন্নতির আলোক আসিয়াছে। অসৎ হইতে সত্তের আবির্ভাবরূপ সিদ্ধান্ত তাহাদের মজ্জাগত অভিজ্ঞতার সহিত নির্ব্বিবাদে খাপ খাইয়া যায়,—নচেৎ আজ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য পরিণামবাদ evolutionএর

সঙ্গে involutionএর যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিল না,—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ"—এ সত্য স্বীকার করিবার আবশ্যকতাও অনুভব করিল না!

Involution, অর্থাৎ অন্তর্নিহিত বা অব্যক্ত সত্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন যথেষ্ট আছে। ব্যক্তভাব ও অব্যক্তভাব—যাঁহারা উভয়ই স্বীকার করেন, তাঁহারা জাগতিক ও জৈবিক পরিণামকে যে চক্ষে দেখেন, পাশ্চাত্ত্যেরা উহাকে সে চক্ষে দেখেন না। পাশ্চাত্ত্যেরা বিশ্বপরিণামের আদি হইতে অন্তের দিকে উন্নতির একটী সরল ঋজু রেখা টানিয়া যায়; এই আদিকে হয় তাহারা অগম্য বলিবে, না হয় পরমাণুর স্পন্দন বলিবে, এবং অন্তকে হয় অসম্ভাবিত বলিবে, না হয় আকস্মিক প্রলয় বলিবে। উন্নতির এই ঊর্দ্ধরেখার নীচের দিকে ধাপে ধাপে অসভ্যতা, বর্ব্বরতা, জড়ত্ব প্রভৃতি অবস্থিত এবং উপর দিকে ধাপে ধাপে উচ্চ হইতে উচ্চতর সভ্যতা অবস্থিত। আমরা পাশ্চাত্য জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে দেখিতে পাই যে, এ বিশ্ব-জগতে কোনও গতি সরলরেখাপন্ন নহে, কিন্তু মানবের উন্নতিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পাশ্চাত্য-শিক্ষা উন্নতির গতিকে সরলরেখাসদৃশ না ভাবিয়া গত্যন্তর দেখেন না। মানবীয় উন্নতিতত্ত্বের এইরূপ ধারণা হইতে, ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিশেষ বিশেষ রীতি গড়িয়া গিয়াছে। কোনও বিশেষ জাতি বা সমাজ সম্বন্ধে গবেষণা চালাইতে হইলে, ক্রমবিকাশবাদ যতই তোমাকে তাহার অতীতের গর্ভে লইয়া যাইবে, ততই তাহার রীতি-নীতি, আচার-বিশ্বাস, শিক্ষা-ধর্ম্ম প্রভৃতির মধ্যে গভীর হইতে গভীরতর অসভ্যতা দেখিতে হইবে, যদি না দেখ তবে তোমার অসঙ্গতিদোষ হইবে।

ভূতপ্রেত ও মৃতের পূজা হইতে ভারতীয় বৈদিক দেবতাবাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই তোমার বাহাদুরী, নচেৎ তুমি কুসংস্কারাপন্ন। মস্তিষ্কের ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থা ও মজ্জাগত কুড়েমি হইতে প্রাচীনকালের অদ্বৈতবাদ উদ্ভূত হইয়াছিল, পরে শঙ্করাচার্য্য তর্কের জোরে উহাকে মাথায় তুলিয়াছেন,—এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিতে পারিলে ক্রমবিকাশবাদের দাবী পূরণ করা যায়, নচেৎ অত প্রাচীন যুগে দার্শনিক অদ্বৈততত্ত্বের প্রত্যক্ষজ্ঞানে মানুষ আরূঢ় হইবে—ইহা ঘোর অবৈজ্ঞানিক কল্পনা। আর অদ্বৈতবাদটাই যে একটা অসম্ভব কথা, শঙ্করাচার্য্যের যুগে ওরকম বাজে বাদবিতণ্ডা চলিতে পারিত, আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে ওসমস্ত অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না! সত্য সত্যই আমাদের দেশের ঐতিহাসিক-ধুরন্ধরগণও এই রকম মতামত বা প্রলাপ লিপিবদ্ধ করিতেছেন, কেননা পাশ্চাত্য ক্রমবিকাশবাদ তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়াছে; পাশ্চাত্য 'বাইওলজি' (জীবতত্ত্ব), পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্বনীতি প্রভৃতির চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিয়া তাহারা ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছেন। আর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র পর্য্যন্ত এই সকল লেখকের হঠকারিতা দেখিতে পান না।

যাঁহারা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ প্রয়োগ করিয়া ভূতার্থবিচার (investigation of facts) করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তসমূহ যে সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক হইবে, তাহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের প্রয়োগে অবশ্যই সুফল পাওয়া যাইতেছে। সর্ব্ববিধ পরিণামের দুইটী দিক্ রহিয়াছে; একটী ব্যক্তক্ষেত্রে কার্য্যকারণের পরম্পরা, আর একটী সেই পারম্পর্য্যবিধা-

য়িনী অব্যক্তশক্তি। আমরা কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সমবায়ে একটী কার্য্যকে উদ্ভূত হইতে দেখি; এরূপ পারম্পর্য্য যে কেন বা কাহার দ্বারা ঘটিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহা অনুসন্ধান করে না, অতটা তলাইয়া দেখিতে চায় না, এককথায় বলে—উহাই nature বা স্বভাব। ভারতীয় পরিণামবাদ ঐ কার্য্যকারণের পারম্পর্য্যকে 'প্রকৃতির আপূরণ' বলে; ইহাতে একদিকে nature শব্দ প্রয়োগে যে অক্ষমতা ঢাকা দেওয়া হয়, তাহার প্রতীকার হইল,—(কারণ, দৃষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইয়া হটিয়া আসা বিজ্ঞানের উপযুক্ত কাজ নহে),—অপরদিকে, অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়, এরূপ অসম্ভব সিদ্ধান্তও নিরাকৃত হইল। "প্রকৃতির আপূরণ" বলিলে প্রথমতঃ একটী অব্যক্ততত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি স্বীকার করা হইল, এবং ইহাও স্বীকার করা হইল যে, যাহা সেই প্রকৃতিতে অব্যক্তভাবে অঙ্গীভূত থাকে, তাহাই সকল পরিণামে কার্য্যরূপে ব্যক্তভাব ধারণ করে। পরিণাম-ব্যাপারে পূর্ব্ববর্ত্তী সমবায়ী কারণ নিমিত্তমাত্র হইলেই—"আবরণ ভেদ" হইয়া অব্যক্ত ব্যক্তভাব ধারণ করে। Evolution বা ক্রমবিকাশ স্বীকার করিলে এই involution বা অব্যক্তভাব স্বীকার করিতেই হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোষ এই যে, যাহা নিমিত্ত বা উপলক্ষমাত্র (condition), তাহাকেই উৎপাদক কারণ (cause) বলিয়া মান্য করে; ফলে, যাহা কার্য্য (effect), তাহাকে প্রকৃত মর্য্যাদা দেওয়া হয় না,—সে যে নিজ অস্তিত্বের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমবায়ের উপর নির্ভর করে না, তাহা প্রকাশ রহিল না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে যে, বানর হইতে নর অভিব্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে প্রকৃতপক্ষে নরের বানরত্ব প্রতিপন্ন

হইল, কিন্তু আসল কথা এই যে, নর যদি অব্যক্তভাবে প্রকৃতিতে পূর্ব্বেই না থাকিত, তবে লক্ষ লক্ষ যুগেও বানরের সাধ্য নাই যে, সে মানুষ অভিব্যক্ত করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিল যে, আদিম মানুষ মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিত এবং জাগ্রৎকালে তাহাকে নৈবেদ্য দিয়া সম্মান করিত; এইরূপ মৃতের সম্মান হইতে এবং ইষ্টকারী ও অনিষ্ট-কারী নৈসর্গিক শক্তির তুষ্টিসাধনা হইতে ক্রমশঃ দেবারাধনা অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু দেবারাধনা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহার অব্যক্ত-সত্তা না থাকিত, তবে অসংখ্য যুগ ধরিয়া লক্ষ লক্ষ বর্ব্বর মানুষ যদি মরিত ও তাহাদের লক্ষ লক্ষ আত্মীয় যদি নৈবেদ্য দিয়া তাহাদের পূজা করিয়া আসিত, তাহা হইলেও দেবারাধনা বলিয়া কোনও ব্যাপারই জগতে প্রচলিত হইত না। কতকগুলি নিতান্ত সাধারণ বা হীন অনুষ্ঠানসমবায়ের সহিত উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের উদ্ভবকে 'যেন তেন প্রকারেণ' সংযুক্ত করিয়া উহাদের মুখে তুড়ি দেওয়াটা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও অস্মদ্দেশীয় তৎশিষ্য-প্রশিষ্যদের একটা বেশ কৌতুকের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এ সমস্ত জঘন্য ব্যবহার পাশ্চাত্য-শিক্ষায়ই সম্ভব, ভারতীয় শিক্ষায় নহে।

পাশ্চাত্য দেশের আদিম মানুষটা যেমন ছিল, জগতের সর্ব্বত্র ঠিক সেই রকম প্রকৃতির মানুষটাই যে আদিমযুগে বিদ্যমান থাকিবে, এরকম অনুমানের মূলে কি কোনও যুক্তি আছে? বৈচিত্র্য যে প্রকৃতির একটা প্রধান নিয়ম, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? অথচ পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ যখন যে দেশেরই পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে যাউক না কেন, পাশ্চাত্যের আদিম বর্ব্বরতা ও যুদ্ধপ্রিয়তাকে সেই দেশের আদিম যুগে ভাড়া করিয়া লইয়া যাইবে! সকল দেশেরই

আদিমযুগে মানুষের জীবনজাল যে নিতান্ত সরল, নিতান্ত উপকরণ-বিহীন ছিল, তাহা স্বীকার করিতে রাজি আছি ; কিন্তু সকল দেশের আদিম মানুষই যে পাশ্চাত্য আদিম মানুষের মত হিংস্র ও অশান্ত ছিল, তাহা অনুমান করিবার কারণ কি ? যদি বল, অনৃশংসতা ও মনঃস্থৈর্য্য অনেকযুগব্যাপী পরিণামের ফল, তাহা হইলে পশুজগৎ হইতে দৃষ্টান্ত দেখাইব যে, একই যুগে চাঞ্চল্য ও স্থৈর্য্য, হিংস্রতা ও অহিংস্রতা প্রভৃতি বৈচিত্র্য ভিন্ন ভিন্ন জন্তুতে লক্ষিত হইতেছে। আসল কথা, প্রত্যেক যুগেই ভাল-মন্দের বৈচিত্র্য লইয়া জগৎ ভ্রাম্যমান। কোনও দেশের আদিমযুগে মৃত্যুবিভীষিকা হয়ত মৃতব্যক্তির অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব পর্য্যন্তই মানুষের কৌতূহলকে আকৃষ্ট করিয়াছে. আবার এমনও নিশ্চয় হইতে পারে যে,সেই মৃত্যুবিভীষিকায় কোনও দেশের আদিমযুগে মানুষ মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্যোগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বলিতেছে যে, "দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্"—ইত্যাদি। তারপর ঋক্, যজুঃ, সাম কিছুতেই মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইতে পারিল না ; তখন সেই বৈদিক আদিম মানুষ উদ্গীথ অবলম্বন করিয়া মৃত্যুতিতীর্ষু হইল,—"যদেতদক্ষরমেতদমৃতমভয়ং তৎ প্রবিশ্য দেবা অমৃতা অভয়া অভবন্।" উদ্গীথ কিরূপে সেই আদিম যুগে অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাও প্রকাশ আছে। উদ্গীথ কি ?—না "ওমিতি হ্যুদ্গায়তি।" এই মন্ত্র নাসিকা, বাক্, চক্ষু, শোত্র ও মনে ধারণ বা ধ্যান করিয়াও যখন ফল হয় নাই, তখন মনেরও অতীত যে মুখ্য-প্রাণ, তাহাতে উহাকে ধারণ করায় অমৃতত্বের অবস্থা লাভ হইল।*

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ ১—২ খণ্ড।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাসংঘর্ষ।

মৃত্যুভয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার জন্য, অমৃতত্ব লাভ করিবার জন্য, আদিম আর্য্যগণের এই যে অক্লান্ত উদ্যমপ্রকাশ, ইহাই প্রাচীন আর্য্যসভ্যতাকে একটা গভীর বিশেষত্ব প্রদান করিয়াছে; এ বিশেষত্ব পাশ্চাত্য সভ্যতায় নাই। এই বিশেষত্বের ফলে প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে এমন অন্তর্মুখতা বিকশিত হইয়াছিল, যাহা জগতের ইতিহাসের আর কোথাও দেখা যায় না। "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ, আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্"—অমৃতত্বলাভার্থে চক্ষু আবৃত করিয়া ধীর সাধক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস এই যে অতুল গৌরবের দাবী করিতেছেন, কোন নিয়মের বলে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ সে গৌরব দান করিতে পরাঙ্মুখ হইবে, তাহা আমরা জানিতে চাই। জগতের নানা প্রাচীন দেশের পুরাবৃত্তে অমৃতত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়; অমৃতত্বের সাধনা যে একটা নিতান্ত আজগুবি কথা, তাহা পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণও অসংশয়ে বলিতে পারেন না। কিন্তু অমৃতত্বলাভের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা কেবল ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রেই আমরা দেখিতে পাই, অন্যত্র নানা গল্প-গুজবই প্রচলিত রহিয়াছে।

মৃত্যুরহস্য জগতের আদিম মানুষের চিত্তকে সর্ব্বত্রই গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। মানুষের স্বভাব চিরকালই বিচিত্র, অতএব সে আন্দোলনের ফল সর্ব্বত্র সমান হয় নাই। এই আন্দোলনের ফলে বৈদিক ঋষির অনুসন্ধিৎসা ও সাধনা যেরূপ গতিলাভ করিয়াছিল, তাহা অনন্যসাধারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে অসম্ভব, সে কথা পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ জোর করিয়া বলিতে

পারে না। সেই অন্তর্ম্মুখতা সাধন করিবার পক্ষে আধুনিক জগতের শিক্ষা বা জীবনযাত্রার জটিল উপকরণ অপরিহার্য্য নহে। সে সাধনার পক্ষে সভাসমিতির বক্তৃতা বা প্রস্তাব, খবরের কাগজে লেখালেখি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি—কিছুই অপরিহার্য্য নহে; জীবননির্ব্বাহের নিতান্ত সরল উপকরণ প্রচলিত থাকা সে সাধনার পক্ষে একটা ব্যাঘাত নহে। অনেক অধ্যয়ন, বহু বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতি না থাকাও সে সাধনার পক্ষে অনধিকারিত্ব প্রকাশ করে না; বরং রাশি রাশি পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধিপরিপক্কতার যেরূপ আধুনিক পরিচয় দেওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যসাধক বলিতেছেন—"নানুধ্যায়াদ্বহুঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ"। অতএব আজকালকার intellectual enlightenment, অর্থাৎ বহ্বধ্যয়নমূলক জ্ঞানবত্তাও সেই বহুপ্রাচীন আর্য্যঋষির সাধনার পক্ষে আবশ্যক হইতেছে না। চাই কেবল শান্তমন, শুদ্ধচিত্ত ও একনিষ্ঠতা; কিন্তু অভিব্যক্তিবাদ যদি বলিয়া বসে যে, সে সকল সম্পদও বহুযুগব্যাপী ক্রম বিকাশের ফল, খৃষ্টপূর্ব্ব বহুশতাব্দীর প্রাচীন জগতে সে সমস্ত উচ্চসম্পদ্ বিকশিত হইতে পারে না, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, খৃষ্টাব্দের সূচনা যাঁহার তিরোভাব হইতে গণিত হয়, ১৯০০ শত বৎসরেও পাশ্চাত্য জগতে তাঁহার মত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ কুত্রাপিও কেন বিকশিত হইল না?

আসল কথা, পাশ্চাত্য-সভ্যতা যাহাকে উন্নতি বলে, সে উন্নতির গতি পরমার্থমূলক নহে,—অতএব ঐ উন্নতির স্তরে স্তরে পারমার্থিক উন্নতিও যে তদনুপাতে লক্ষিত হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য-সভ্যতার মাপকাটিতে ভারতীয় সভ্যতার

পারমার্থিকতা যুগপরম্পরায় মাপিতে চেষ্টা করা নিতান্ত বিড়ম্বনা ও দর্পের কথা। অথচ এইরূপ অসম্ভব চেষ্টারও আজকাল বিরাম নাই,—সেইজন্য ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বের নানারকম অদ্ভুত বিশ্লেষণ চলিতেছে ; দু' একটা দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করিয়াছি।

অব্যক্তবাদ বা theory of involution স্বীকার করিলে, মানব-সমাজের উন্নতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা লাভ করা যায়, তাহার সহিত ইতিহাসের, বিশেষতঃ ভারতীয় ইতিহাসের, অধিকতর সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ মানবীয় উন্নতিকে ঋজুরেখাপন্ন বলিয়া ধারণা করে ; আমরা কিন্তু জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া মানবীয় উন্নতির গতিকে ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট দেখি না। এক একটা প্রাচীন দেশ বা জাতির উত্থান-পতন লক্ষ্য করিলে বেশ মনে হয় যে, উন্নতির গতি অপর সর্ব্ববিধ গতির মত যেন বৃত্তাংশ অঙ্কিত করে—অর্থাৎ, অব্যক্ত হইতে উত্থিত হইয়া উৎক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের মত কিয়ৎকালের পর অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ক্রমে আবার অব্যক্তে বিলীন হইয়া যায়। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত, অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা"—ভৌতিক জীবনসম্বন্ধে গীতার এই উক্তি যেমন খাটে, এক একটা জাতি বা সমাজের জীবনসম্বন্ধে ইতিহাসও যেন ঠিক সেইরূপ সাক্ষ্য দেয়। মার্কিণসুধী এমার্সন সাহেব তাঁহার "বৃত্ত" নামক প্রবন্ধে এইরূপ গতির নিয়ম সুন্দরভাবে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। সর্ব্ববিধ ব্যষ্টিসত্তা ও সমষ্টিসত্তা সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রকটিত হয় যে, উহারা অব্যক্ত হইতে কারণ-সমবায়-সহযোগে উদ্ভূত হইয়া

ক্রমোন্নতি লাভ করে এবং কালের অব্যর্থ প্রভাবে জরা বা অবসাদ প্রাপ্ত হইয়া আবার অব্যক্তে বিলীন হয়। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ",—এই alternation of life and death,—জন্ম-মৃত্যুর পৌর্ব্বাপর্য্য,—মানবীয় ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

ভারতীয় পরিণামবাদে এই ব্যক্তাব্যক্ততত্ত্ব বহুপ্রাচীন কাল হইতেই অঙ্গীভূত হইয়াছে। এইজন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব চতুর্যুগ-বিভাগ স্বীকার করে; কিন্তু ইহাও পুরাণে প্রকাশ আছে যে, কেবল ভারতের পক্ষেই এইরূপ কালবিভাগ খাটে, অন্য দেশের পক্ষে নহে। কারণ, ভারতেতিহাসে একটা পরম আদর্শের ব্যক্তভাব ও অব্যক্ত-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মানবসমষ্টির অভ্যুদয় ও অধঃপতন সংঘটিত হয়, অন্যান্য দেশে উত্থান-পতনের মূলে সেরূপ শ্রেষ্ঠ, অমর আদর্শ নিহিত থাকে না। এই জন্য অন্যান্য দেশের ইতিহাসও ভারতের মত দীর্ঘকালব্যাপী নহে। ভারতের চতুর্যুগের মধ্যে প্রত্যেক যুগেই আবার সনাতন শ্রেষ্ঠ আদর্শ আপনার অভিব্যক্তির ক্ষেত্ররূপে এক একবার একটা সাধক-জনসমষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে ও উহার জীর্ণাবস্থায় উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাপর যুগে আপনার ব্যক্তভাব ক্রমশঃ ম্লান হওয়ায়, কলিযুগে স্বীয় অভিব্যক্তির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল ব্যয়িত করিয়াছে। বিশেষ ধৈর্য্য ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ভারতীয় পরিণামবাদ যে দৃষ্টিতে কালবিভাগ ও কালতত্ত্ব উদ্ভাবিত করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক,—যেহেতু

আধুনিক বিজ্ঞান জ্যোতিষ্ক, গ্রহ প্রভৃতির গতিসম্বন্ধে যেরূপ গবেষণা করিতেছেন, তাহার সহিত উক্ত যুগবিবর্ত্তনবিধির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। সে সমস্ত সূক্ষ্ম আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হইবে না।

যাহা হউক, সংক্ষেপে আমরা ইহাই বুঝিতে চেষ্টা করিলাম যে, পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদ বা পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতীয় সনাতন শিক্ষার প্রকৃত মর্য্যাদা ও মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার কোনও আশা নাই, বরং ঐরূপ সহায়তার উপর নির্ভর করিলে পদে পদে ভ্রান্ত হইবারই সম্ভাবনা রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা এক্ষেত্রে তিনটী কারণের নির্দ্দেশ করিলাম ; প্রথম কারণ—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ, অপরন্তু ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার উদ্ভবকেন্দ্র অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। দ্বিতীয় কারণ—ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রাচীনতা এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অর্ব্বাচীনতা। তৃতীয় কারণ—পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা।

যে শিক্ষা বা cultureএর উদ্ভবস্থান অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় পরমার্থতত্ত্বের অভিজ্ঞতা হইতে যে শিক্ষা ও সভ্যতা বিকশিত ও অভিব্যক্ত হয়, পাশ্চাত্য কোনও কৌশল বা সাধনার নকল করিয়া সে শিক্ষা ও সভ্যতার পুনরভ্যুদয় সংঘটিত করা যায় না। পরমার্থতত্ত্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে মূলভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত না পাইলে, সে শিক্ষা বা সভ্যতা (civilisation) পুনরভ্যুদিত হয় না,—নূতন নূতন ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে অজস্র টাকা সংগ্রহ করিলে কি ফলোদয় হইবে? জীবনাদর্শ বুঝানই ভারতীয়

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে, আদর্শজীবন গড়িয়া তুলাই উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি যুক্তিসহকারে ভারতীয় জীবনাদর্শ বুঝাইয়া দেওয়াই ভারতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত, তবে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়াদি দ্বারা কাজ চলিতে পারিত।

প্রবন্ধের শিরোভাগে উদ্ধৃত আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দের উক্তির মধ্যে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষার সংঘর্ষফলে প্রাচীনতন্ত্রের সংস্কারান্ধ হিন্দু ও নব্যতন্ত্রের পাশ্চাত্যভাবভাবিত বাবুর মধ্যে কিরূপ ব্যবধান ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সেই শিক্ষাসমস্যা পূরণ করিবার আশায় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের (Rationalism) সাহায্যে ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য-শিক্ষার পার্শ্বে স্থান দান করিবার চেষ্টাও যে অসম্ভব, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আগামী প্রবন্ধে আমরা বুঝিতে চাই, ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবকেন্দ্র পরমহংস-দেবের জীবনে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হওয়ায়, উহা এমন প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে যে, তদুপরি দণ্ডায়মান হইয়া উহা পাশ্চাত্য-শিক্ষার সহিত সংঘর্ষে যে কেবল জয়লাভ করিবে, তাহা নহে,— উহাকে যথাসম্ভব আপনার অঙ্গীভূত করিয়া, এক অভূতপূর্ব্ব নবাভ্যুদয়ের সূচনা করিবে।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাসমন্বয়।

(উদ্বোধন—ভাদ্র, ১৩২০)

"The secret of a true Hindu's character lies in the subordination of his knowledge of European sciences and learning, of his wealth, position and name, to that one principal theme which is inborn in every Hindu child—the spirituality and purity of the race.*"—

(সমগ্র হিন্দুজাতির সনাতন পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধি, সঙ্গীতের স্বরলয়ের মত, প্রত্যেক হিন্দুসন্তানের জীবনে আজন্ম অন্তর্নিহিত হইয়া রহিয়াছে; আপনার পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষা ও বিদ্যাবত্তাকে, আপনার ঐশ্বর্য্য, পদবী ও যশকে, ঐ পরমার্থনিষ্ঠা ও সত্ত্বশুদ্ধির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে আনয়ন করাই আদর্শ হিন্দুচরিত্রের রহস্য।

আমরা 'শিক্ষাকেন্দ্র' শীর্ষক নবম প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, ভারতীয় শিক্ষা (culture) পরমার্থমূলক; উহা কেবল মস্তিষ্কের খোরাক যোগাইয়া ব্যাখ্যানপটু পণ্ডিত গড়িতে চাহে না, উহার উদ্দেশ্য—সংসারের সকলক্ষেত্রে পরমার্থনিষ্ঠ কর্ম্মবীর মানুষ গড়িয়া তোলা। পরমার্থসাধনার কেন্দ্রই এইরূপ শিক্ষাবিস্তারের কেন্দ্র এবং যে শক্তিতে দেশে ধর্ম্মজীবন উদ্দীপিত ও সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিতেই ঐ শিক্ষার অভ্যুদয় ও বিস্তার ঘটে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে যে মূলগত প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা আমরা বিগত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

* রামনদে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

আমরা দেখিয়াছি যে, শিক্ষা বা cultureএর আদিম উৎস— প্রত্যক্ষজনিত অভিজ্ঞতা (experience); ইউরোপে যে রকম প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়া শিক্ষারূপ বৃক্ষটী জন্মাইয়াছে ও পত্রপুষ্প-ফলে উন্নতশির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার নাম ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ,— কেবল হয় ত খৃষ্টধর্ম্ম গাছের গোড়ায় সময় সময় সার ফেলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যে রকম প্রত্যক্ষকে জমি পাইয়া শিক্ষারূপ বৃক্ষ মঞ্জরিত ও পল্লবিত হইয়াছে, তাহার নাম অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। জমির প্রভেদ থাকায় গাছেরও প্রভেদ ঘটিয়াছে, কিন্তু দুই-ই গাছ বটে, —ভারতীয় শিক্ষাও culture, পাশ্চাত্য শিক্ষাও culture।

উপনিষদ্ বলেন, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্ব্বানি নিঃশ্বসিতানি।" ভারতীয় শিক্ষাসম্বন্ধে আমাদের চিরকালের ধারণা এইরূপ। আগুনে ভিজে-কাঠ ঠেলিলে যেমন রাশি রাশি ধূম নির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ হইতে ভারতীয় শিক্ষা শাখাপ্রশাখাসমন্বিত নানা বিদ্যার আকারে যেন নিঃশ্বসিত হইয়াছে। এই ঘোর শিক্ষাসমস্যার যুগে আমাদিগকে এই সব শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার উদ্ভবস্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে বলিয়া ভারতীয় শিক্ষার গতিও (trend) নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় শিক্ষা মানুষকে অনিবার্য্যরূপে উহার উদ্ভবস্থানের দিকে গতিশীল করিয়া দেয়; ভারতীয় শিক্ষায় এমন কিছু শিক্ষিতব্য থাকিতে পারে না, যাহার জন্য বা যাহার দ্বারা সেই গতির বিপরীত আকর্ষণ শিক্ষার্থীর

উপর প্রযুক্ত হয়। অতএব পরমার্থের প্রতি অনন্যগতিনিষ্ঠতাই ভারতীয় শিক্ষার সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ; যদি জগতের কোনও বিদ্যা বা তত্ত্বকে ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হয়, তবে ঐ বিদ্যা বা তত্ত্বকে এই বিশেষ লক্ষণের দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে লক্ষণান্বিত করিতে পারিলে, সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইতে পারে। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, এইরূপ প্রণালীর সাহায্যে ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাকে কতদূর আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু এইখানে একটা সন্দেহ উঠিতে পারে। ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকার যাহা অন্তর্গত, তাহাকে ব্যবহার বলে; যে পরমার্থভূমিতে অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের প্রয়োগ হয়, তাহা সর্ব্ব ব্যবহারের অতীত। অতএব কেবল ব্যবহার লইয়াই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার নাড়াচাড়া, তাহার সহিত পরমার্থনিষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষার অনুকূল সংযোগ কিরূপে ঘটিতে পারে?

ব্যবহারের দ্বারা ব্যবহারকে নিরাকৃত করাকেই জীবন বলে। জড়ত্ব নিরাকৃত করাকেই জীবত্ব বলে; আবার জীবন যখন ব্যবহার্য্য স্থূল পদার্থসকলকে সূক্ষ্মমনের সম্ভোগার্থ নিযুক্ত করে, তখন সূক্ষ্ম-দ্বারা স্থূল নিরাকৃত হইতে থাকে; তারপর যখন মানুষের স্বভাবে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর নানারূপ বুদ্ধির প্রকাশ হয়, এবং মন বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া—আপনার স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া—ব্যবহার্য্য পদার্থে পরিণত হয়, তখনও ব্যবহারই ব্যবহারকে নিরাকৃত করে। মানুষের জীবন এইরূপে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্যবহারের দিকে ধাবিত হই-তেছে, এবং পদে পদে স্থূলতর ব্যবহার সূক্ষ্মতর ব্যবহারের দ্বারা নিরাকৃত হইতেছে। ভারতীয় শিক্ষা সেই বহু প্রাচীনযুগ হইতে

এই নিরাকরণ-ব্যাপারের একটা সীমা খুঁজিয়া পাইয়াছিল,—ভারতীয় শিক্ষার প্রাচীন নেতৃবৃন্দ 'নেতি নেতি' করিয়া সর্ব্বব্যবহারের একটা সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। যে গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইবার রহস্য জানে, গোলকধাঁধায় তাহার আর ধাঁধা লাগে না,—তাহাকে গোলকধাঁধার যেখানেই ছাড়িয়া দাও না, সে ঠিক বাহির হইয়া আসিবে। ব্যবহারের ধন্ধ কিরূপে অব্যাহতভাবে অতিক্রম করিতে হয়, সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা,—শ্রেষ্ঠ কৌশলের প্রয়োগে কিরূপে সর্ব্ববিধ ব্যবহারকে ব্যবহারের দ্বারা সম্পূর্ণ নিরাকৃত করিতে হয়, সেই শিক্ষার নামই ভারতীয় শিক্ষা। এ শিক্ষা ব্যবহারের ধন্ধকে ভয় করে না; এ শিক্ষা ব্যবহারকে জয় করিয়া ব্যবহারের অতীতে মানুষকে পৌঁছাইয়া দেয়,—ব্যবহারের পাশ কাটাইয়া, ব্যবহারকে দূরে রাখিয়া, ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইয়া, ব্যবহারের পরপারে পাড়ি দেয় না,—ব্যবহার-প্রবাহ কাটিতে কাটিতে মানুষের চিত্ত-তরণীকে পারে পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ব্যবহারের রাজ্যে চলাফেরা করিতেছে, সে রাজ্যের সর্ব্বত্রই ভারতীয় শিক্ষারও গতিবিধি থাকিতে পারে। তবে প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা হয় ত যেখানে কোনও ব্যবহারকে নিরাকৃত করিতে না পারিয়া উহাকেই চরম বলিয়া ধরিয়া আছে, ভারতীয় শিক্ষা সেখানেও ব্যবহারের অতীতে দৃষ্টি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে, সেখানেও ব্যবহারকে অতিক্রম করিয়া পরমার্থের সহিত সংযোগ রাখিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সৃষ্টিবিলাসের মূলে পরমাণুর স্পন্দন স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু এই পরমাণু ও স্পন্দন লইয়া যতই কেন গবেষণা চলুক না, উহাদের ধারণা নিতান্তই ব্যবহারিক

থাকিয়া যাইতেছে; এমন কি, সম্প্রতি নির্ব্বাত দেশভাগে তাড়িতশক্তি সঞ্চালন করিয়া কেহ কেহ নাকি তথাকথিত শূন্য হইতে জড়ের (হেলিয়ম্ ও নিয়ন্) সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বলিতেছেন যে, যাহাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জড়পরমাণু বলে, তাহাও জড়শক্তিরই একরূপ বিকাশ মাত্র, ইত্যাদি। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, পাশ্চাত্যে শক্তির ধারণাও কতদূর স্থূল; আজ যাহাকে নিছক শক্তি বলা হইতেছে, কাল তাহার ভিতরও জড়ত্ব বা সাকারত্ব দেখা যাইতেছে এবং আজ যাহাকে আদিম জড়পরমাণু বলা হইতেছে, কাল তাহারও সূক্ষ্মতর অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এইভাবে কেবলই কাশীর বিশকৌটা খুলিয়া যাইতেছে,—এ কৌটার পর কৌটা খোলার আর অন্ত নাই। এখন কথা এই যে, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর দাঁড়াইয়া জগতের মূল উপাদান বা মূলশক্তি আবিষ্কার করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ঐন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই যে একটা অনেক পরের গড়া-পেটা জিনিস—যন্ত্রাদি ও অনুমানের সাহায্য পাইলেও উহার দৌড় কতটুকু? ঐরূপ প্রত্যক্ষের ভূমি হইতে কি জগতের মূল-স্পন্দনের প্রকৃতি বুঝা সম্ভব? বরং তার চেয়ে 'বাইবেল'কথিত ব্যাবেলের মিস্ত্রীদের পক্ষে ইটসুরকির দ্বারা পৃথিবীর মাটি হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি গড়িয়া তোলা বেশী সম্ভব!! সে সমস্ত কারিগর অপেক্ষা আধুনিক জড়বাদী বৈজ্ঞানিকদের স্পর্দ্ধা কিছু কম নহে!

যাঁহারা অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে জগতের আদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সৃষ্টির মূলে একপ্রকার স্পন্দনক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন; অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষাও পাশ্চাত্য শিক্ষার

মত ব্যবহারিক জগতের সকল শক্তির মূলে মূলস্পন্দন স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা (culture) পাশ্চাত্য শিক্ষার মত ব্যবহারের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাইয়া অনর্থক কেবলই কৌটার পর কৌটা খোলার অভিনয় করে নাই। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—প্রাণ স্পন্দিত হওয়ায় যাহা কিছু স্থষ্টরূপে বিলসিত, সে সমস্তই নিঃসৃত হইল। এই সূক্ষ্মস্পন্দনব্যাপারটী, যাহা একটী কার্য্যমাত্র, তাহার ধারণায় ভারতীয় শিক্ষা বরং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত যোগদান করিতে পারে; কিন্তু স্পন্দনের কারণ প্রাণবস্তুর ধারণা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এলাকার বহির্ভূত। এই প্রাণবস্তুকে ভারতীয় শিক্ষা কিরূপ দৃষ্টিতে দেখিতেছে?—

"অরা ইব রথনাভৌ প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং
ঋচো যজূংষি সামানি যজ্ঞঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ।
প্রজাপতিশ্চরসি গর্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে
তুভ্যং প্রাণ প্রজাস্ত্বিমা বলিং হরন্তি যঃ প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি।
দেবানামসি বহ্নিতমঃ পিতৄণাং প্রথমা স্বধা
ঋষীণাং চরিতং সত্যমথর্ব্বাঙ্গিরসামসি।
ইন্দ্রস্ত্বং প্রাণ তেজসা রুদ্রোঽসি পরিরক্ষিতা
ত্বমন্তরিক্ষে চরসি সূর্য্যস্ত্বং জ্যোতিষাংপতিঃ।"—ইত্যাদি।*

এই প্রাণবস্তুকে তুমি অবৈজ্ঞানিক বলিতে পার? বৈজ্ঞানিক বলা যায় কাহাকে? না—যাহার সত্তা প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া প্রমাণিত হয়; তাড়িতশক্তি বৈজ্ঞানিক,—কেন না, প্রত্যক্ষ-ক্ষেত্রে উহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। প্রত্যক্ষই বিজ্ঞানের

* প্রশ্নোপনিষৎ—২য় প্রঃ।

অকাট্য প্রমান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই বিজ্ঞানের অস্থিমজ্জা ও মূলভিত্তি। ভারতীয় শিক্ষায়ও 'বিজ্ঞান'-শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য পরমহংসদেব বলিতেন, "জ্ঞানের পর বিজ্ঞান।" অতএব বৈদিক ঋষি যে তত্ত্বকে 'প্রাণ'-নামে অভিহিত করিতেন, সে তত্ত্বের অস্তিত্ব যদি প্রত্যক্ষমূলক হয়, তবে তাহাকে অবৈজ্ঞানিক বলা যায় না,—কারণ, "অবৈজ্ঞানিক" বলিতে সাধারণতঃ "কাল্পনিক" বা "আনুমানিক" বুঝায়।

প্রাণতত্ত্ব ও স্পন্দনতত্ত্বের দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের এলাকামধ্যে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা একযোগে কার্য্য করিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষায় অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই মূলপ্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ায়, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির প্রয়োগক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত অনেক প্রশস্ত ও গভীর। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায় ও অবলম্বন একমাত্র ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, ভারতীয় বিজ্ঞানের সহায় ও অবলম্বন প্রধানতঃ অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ; কিন্তু ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তাহারই তাঁবে কাজ করিতে পারে, কারণ,—স্থূল কার্য্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিই ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অধিকারভুক্ত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান করিতে অগ্রসর হয় না, তাহার সত্তামাত্র অনুমান করিয়া রাখে—(যথা, "A force is that which causes or tends to cause motion."); এইজন্য প্রকৃত হিসাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা যায়। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞান অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কারণের স্বরূপ অনুসন্ধান করে এবং ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে কার্য্যের প্রকৃতি বিচার করে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে প্রকৃত কারণবাদ না থাকায়, প্রত্যেক

পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যসমবায়কেই পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়; কিন্তু ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী কার্য্যসমবায়কে প্রকৃতপক্ষে নিমিত্ত বলাই উচিত। যাহা হউক, একথা সহজেই বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য শিক্ষার কার্য্যতত্ত্বের সহিত ভারতীয় শিক্ষার কারণতত্ত্ব অনুকূল সংযোগে সংযুক্ত হইতে পারে; কেন না, ভারতীয় বিজ্ঞান যাহাকে কারণ বলে, তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কারণ নহে—উহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন থাকের বস্তু। সে থাক্ বা ভূমিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আদৌ গতিবিধি নাই; অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যাহাকে কারণ বলে, তাহাকে নিমিত্তমাত্র ভাবিয়া লইয়া ভারতীয় বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসঙ্কোচে বিচরণ করিতে পারে।

পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পরবর্ত্তী অবস্থার কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হয়, সে ভাব ভারতীয় বিজ্ঞানের পক্ষে উপাদেয় নহে; কারণ, ভারতীয় বিজ্ঞানীকে ঐ ভাবে কার্য্যপ্রপঞ্চের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া বেড়াইলে চলিবে না,—কার্য্যপ্রপঞ্চের অতীতে যে কারণবস্তু প্রকাশমান, অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের সাহায্যে তাহাকে উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিতে হইবে। এইজন্য দেখিতে পাই যে, পরমবিজ্ঞানী পরমহংসদেবের মনে একবার অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কৌতূহল হইল বটে, কিন্তু প্রকৃত কারণতত্ত্বে মনের আকর্ষণ জগৎকে বুঝাইবার জন্যই যেন, সে মন পাশ্চাত্য স্থূল কার্য্যতত্ত্বের ধান্ধার মধ্যে ঢুকিতে চাহিল না,—অনুবীক্ষণ যন্ত্র পরীক্ষা করা হইল না।* আমরা

* এইরূপে পরমহংসদেবের জীবনলীলায় এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহাতে নানাবিষয়ে আমাদের ভারতীয় সনাতন ভাবটী কি তাহা প্রকটিত

কার্য্যপ্রপঞ্চকে কারণ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি বলিয়াই আমাদের পক্ষে একটা স্বতন্ত্র জগৎ থাকিয়া যায়—জীবনের একটা ঐহিক বিভাগ বিদ্যমান থাকে। এই রকম একটা আলাদা বিভাগ বজায় থাকার নামই অবিদ্যামায়া, এইজন্য পরমহংসদেব বলিতেন যে, "যতক্ষণ তাঁকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা"—অর্থাৎ, কারণসত্তার সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত যেরূপ জগৎ থাকে, তাহা মিথ্যা। কিন্তু ভারতীয় বিজ্ঞানীর জগৎ সেরূপ জগৎ নহে, তিনি দেখেন—ব্রহ্মই জীবজগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হইয়াছেন,—"যে ইট-চূণ-সুরকিতে ছাদ, সেই ইট-চূণ-সুরকিতেই সিঁড়ি হইয়াছে।" পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কারণানুসন্ধানে ব্রতী হইলেও, মিথ্যা জগতের এলাকামধ্যে কার্য্যপ্রপঞ্চের ধান্ধায় ঘুরিয়া বেড়ায়। পরমহংস-দেবের জীবনলীলায় এইরূপ ধাঁধা-লাগার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বহুবার ইঙ্গিতে প্রকাশ হইয়াছে।

কিন্তু পরিণামের পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মতর অবস্থাকে বা নিমিত্তসমবায়কে পরবর্ত্তী কার্য্যের কারণ বলিয়া ধরিয়া লইলে যে, কোনও হিসাবে কোনও উপকার নাই, তাহা নহে। সাধারণ সংসারী মানুষ ব্যক্ত জগৎকে স্বতন্ত্র জানিয়া উহাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজে,—পাশ্চাত্য-কার্য্য-কারণবাদের দ্বারা সে আত্মপ্রতিষ্ঠার যে অনেক সুবিধা ও সুযোগ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তারপর আধুনিক জগতে একটা টিকিবার ও দাঁড়াইবার স্থান পাইতে হইলে, প্রত্যেক সমাজ ও

হইয়াছে। ১৩১৯ সালের বৈশাখের "ভারতের সাধনা"য় ("ধর্ম্মজীবন" শীর্ষক-প্রবন্ধে) সংবাদপত্র স্পর্শ করায় তাঁহার সঙ্কোচের উল্লেখ করিয়া আমরা আর একটী এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইতি লেখকস্য।

দেশকেই সমষ্টিশক্তির (collective life) উপযুক্ত বিকাশের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ঐরূপ বিকাশ যে ভাব ও শক্তির একরূপ ব্যূহরচনার (অর্থাৎ, organisation of thought and activity) দ্বারা সম্ভবপর তাহা আমরা পূর্ব্ব এক প্রবন্ধে দেখিয়াছি। ঐরূপ ব্যূহরচনা বা organisationএর জন্য আজকাল পাশ্চাত্যের নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ও কৌশলাদি ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে; সে প্রয়োজন পূরণার্থে ভারতীয় শিক্ষাকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত যোগদান করিতে হইবে। এ সংযোগ কি ধরণের, তাহা আমরা এখন বিচার করিলাম। আমরা দেখিলাম যে, প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত স্বামীজীর উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে; কেন না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিলেই যে ভারতীয় বিজ্ঞানকে পরিহার করিতে হইবে এমন কিছু কথা নহে, বরং ভারতীয় বিজ্ঞান ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কার্য্যপ্রপঞ্চের অনুসন্ধানে নিয়োজিত করিবার জন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে আপনার অঙ্গীভূত করিয়া লইতে পারে এবং যে ভাব ও শক্তির ব্যূহনির্ম্মাণের দ্বারা দেশে সমষ্টিশক্তির প্রতিষ্ঠা হইলে ভারতীয় শিক্ষার নবাভ্যুদয় ঘটিবে, সেই ব্যূহনির্ম্মাণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সম্যক্ রূপে কার্য্যকরী হইতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা দ্বারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আত্মসাৎকার সম্ভবপর হইলেও, একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। যে বিজ্ঞান ও শিল্পে ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই একমাত্র সহায় ও অবলম্বন, সে বিজ্ঞান ও শিল্পের সহিত ভারতীয় শিক্ষা হইতে উদ্ভূত শিল্প-বিজ্ঞানের একটা প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকিবার কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষায়

বিজ্ঞানের উৎকর্ষ যেমন শিল্পে (artএ) প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, ভারতীয় শিক্ষায়ও সেইরূপ হইয়াছিল। আমাদের শাস্ত্রাদির অকাট্য সাক্ষ্য এই যে, প্রাচীন ভারতের আর্য্যগণ প্রকৃতির নানা শক্তিকে আপনাদের কাজে লাগাইতে পারিতেন; আধুনিক পাশ্চাত্যদের মত তাঁহাদেরও প্রকৃতির সঙ্গে সে রকম একটা বোঝাপড়া ছিল। কিন্তু তাঁহাদের বোঝাপড়া ও আধুনিকদের বোঝাপড়ায় যথেষ্ট প্রভেদও রহিয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের সে বোঝাপড়াকে প্রকৃতই বোঝাপড়া বলা যায়, তাহাতে একপ্রাণতা ছিল, হৃদয়ের সাড়া ছিল, ভাবের আদানপ্রদান ছিল; প্রকৃতি তাঁহাদের নিকট প্রাণময়ী ও ভাবময়ী হইয়া পূজা আদায় করিতেন। এ রকম বোঝাপড়া প্রকৃত কারণতত্ত্বের খোঁজ না পাইলে হয় না; কেন না, কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যে প্রকৃতির রূপ জড়যন্ত্রবৎ, কিন্তু কারণভূমিতে তিনি চিন্ময়ী, ভাববিলাসিনী। ঐন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষবাদী আধুনিকেরা সে কারণভূমিতে উঠে নাই,—তাই প্রকৃতি তাহাদের চক্ষে যেন একটা অন্তহীন, বিরাট্ জড়যন্ত্র। এই বিরাট্ যন্ত্রে সূক্ষ্মকার্য্য কিরূপে স্থূলকার্য্যে পরিণত হয়, তাহা ধরিয়া ফেলাকেই আধুনিকেরা প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া বলিয়া মনে করে; এইরূপ একটা বোঝাপড়ার গুণে আধুনিকেরা জড়প্রকৃতির অনুকরণে জড়যন্ত্র সহায়ে কতকগুলি সূক্ষ্মতর নিমিত্তের সমবায় ঘটাইয়া স্বেচ্ছামত স্থূল কার্য্যের সংঘটন করাইতেছে। ইহাই হইল পাশ্চাত্যের শিল্প, বা art, mechanics প্রভৃতি যন্ত্রকৌশল ও যন্ত্রবিদ্যা। প্রাচীন আর্য্যগণ প্রকৃতিকে জড়যন্ত্ররূপে দেখেন নাই, তাই যন্ত্র গড়িয়া গড়িয়া প্রকৃতির নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে যান

নাই। এমন কি, সেরূপ হৃদয়হীন জড়বাদমূলক ব্যবহারকে আর্য্যগণ ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য দেখিতে পাই, যন্ত্রবিদ্যার অনুশীলন ক্রমশঃই উন্নত আর্য্যসমাজে অনুকূল আশ্রয় হারাইয়া কলিযুগের পূর্ব্বেই অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। যুধিষ্ঠিরের সভা গড়িবার জন্য ময়দানবকে ডাকিতে হইতেছে। ময়দানবের জাতিই স্থাপত্য, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি নানা শিল্পের অধিকারী হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির সহিত প্রাচীন আর্য্যের যেরূপ বোঝাপড়া ছিল, তাহাকে যোগবিদ্যা বলা যাইতে পারে। সেই বহুপ্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে ভারতীয় আর্য্যগণ দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির নানা শক্তিকে নিজ প্রয়োজনসাধনে প্রয়োগ করিতে শিখিয়াছিলেন। এইরূপ মন্ত্রসাধন ও দেবতাসাধনের বৈজ্ঞানিক সারভাগ আমরা পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাইতেছি। "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ"—এই সংযম-বিদ্যার প্রভাবে পাঞ্চভৌতিক ও তদপেক্ষাও সূক্ষ্মতর শক্তি আর্য্যগণ আয়ত্তীভূত করিতেন; দেবতা ও মন্ত্র অনেক স্থলেই উপলক্ষ্য-রূপে গৃহীত হইত। "ভারতের সাধনা"র নবম ("শিক্ষকেন্দ্র") প্রবন্ধে আমরা ধনুর্ব্বেদের প্রসঙ্গে এইরূপ দেবতাসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছি। এক দ্বাপরযুগেই এই সকল অদ্ভুত সিদ্ধি আর্য্যগণের শিক্ষার কতদূর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে বেশ প্রত্যক্ষ হইতেছে; এই সমস্ত সিদ্ধিকে যে সেকালে অলৌকিক রহস্য বলিয়া মনে করা হইত না, তাহাও নিষাদতনয় একলব্যের ধনুর্ব্বেদসাধনা দেখিলে বুঝা যায়। একলব্য নির্জ্জনে "সংযম" সাধনা করিয়া গুরূপদিষ্ট না হইয়াও ধনুর্বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

এই দেবতামন্ত্রাদিসাধন একটা অলৌকিক ব্যাপার ছিল না; উহার একটা psychology, একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ছিল। দেবতা-মন্ত্রাদিসাধনকে বৈজ্ঞানিক বলিতেছি,—কেন না, ঐ সাধনতত্ত্ব অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষরূপ মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইতিহাস যদি ঐ সকল সাধনার আর কোন বার্ত্তা আমাদের নিকট পৌছাইয়া না দিয়া কেবল পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রখানি প্রকটিত করিয়া রাখিত, তাহা হইলেও ঐরূপ সাধনাদির কথা আমরা আজ হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতাম না। এই শাস্ত্রখানির প্রতি অক্ষরের পশ্চাতে বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন, অকপট অধ্যবসায় ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসা, প্রকরণযোগ্য ভাষা ও ভাবের সংযম ও প্রাঞ্জলতা এমন "বৈজ্ঞানিক" মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্যক্ত রহিয়াছে যে, নিতান্ত "অবৈজ্ঞানিক" ছাড়া আর কেহ ঐ শাস্ত্রকে চট্ করিয়া অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন না; এই শাস্ত্রখানি হইতে যে উজ্জ্বল আলোক প্রাচীন ইতিহাস-পুরণাদির উপর প্রতিফলিত হইতেছে, তাহাতে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, কলিযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যসমাজে নানা বিদ্যাবিভাগে নানা সিদ্ধিলাভ করিয়া আর্য্যবর্ণত্রয় প্রকৃতির বিবিধ শক্তি ও রহস্যের আয়ত্তীকরণে আধুনিক পাশ্চাত্য-দের অপেক্ষা অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন; তবে সাধারণ মনুষ্য-জীবনের বাহিরের লীলাক্ষেত্রে পাশ্চাত্যদের বিদ্যাবত্তাকে যে আজ আমরা অধিকতর ফলবতী হইতে দেখিতেছি, তাহার কারণ—আধুনিক যুগের অভিনব সমষ্টিগঠনমূলক জীবনকৌশল,—(progressive organisation of thought and activity consequent upon the growth of collective life)—এইরূপ সমষ্টি-

মূলক ও সমষ্টিনিষ্ঠ জীবনকৌশলের দ্বারা ব্যষ্টির চিন্তা ও সাধন-ফলকে সমষ্টির শিক্ষায় ও প্রয়োজনসাধনে অদ্ভুতরূপে নিয়োজিত ও উপচিত করা যায়। কাচসংহতিসংযোগে যেমন আলোকের অত্যদ্ভুত উপচয় ঘটাইতে পারা যায়, সেইরূপ পাশ্চাত্য ব্যষ্টিসংহতিমূলক জীবন-কৌশলের দ্বারা সমাজের প্রত্যেক চিন্তা ও সাধনার সুফলকে প্রয়োজনসাধনের ক্ষেত্রে আশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত করা সম্ভব হইয়াছে। এই কৌশলের কথা আমরা অষ্টম ("শিক্ষা") প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

কিন্তু কারণতত্ত্বের বহুবিধ সাধনার দ্বারা প্রকৃতির নিকট নানা সিদ্ধি আহরণ করা কলিযুগের পর হইতেই আমাদের দেশে লোপ পাইতে বসিয়াছে। ভারতীয় সমাজে এই সকল সিদ্ধির বিকাশ ও প্রচলনের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায়। পাতঞ্জল শাস্ত্রোক্ত "সংযমের" বিচিত্র প্রয়োগে এই সমস্ত শক্তি বা সিদ্ধির উদয় হয়; অতএব যখন দেশে বা সমাজে অধ্যাত্মসাধনার উৎকর্ষ বা উপচয় ঘটে, তখন ঐ সমস্ত সিদ্ধির বিকাশ ও প্রচলন অনুকূল ক্ষেত্র লাভ করে। অতএব যখন কলিযুগের পর হইতে ভারতে নানা স্থানে আর্য্যেতর সমাজসকল অভ্যুদিত হইতেছিল,—ফলে, যখন ভারতীয় সমাজসকলে পারমার্থিক জীবনাদর্শ ম্লান হইয়া আসিতেছিল,—তখন হইতেই আর্য্যসমাজকর্ত্তৃক পূর্ব্বপূর্ব্বযুগার্জ্জিত সিদ্ধিসকল ক্রমশঃই বিলুপ্তপ্রায় হইতে লাগিল, এবং ক্রমশঃই স্থান-বিশেষে ও সাধকবিশেষে উহাদের বিকাশ ও প্রচলন সীমাবদ্ধ হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সাধারণ লোকেও ঐরূপ সিদ্ধিলাভকে অলৌকিক ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর একবার বৌদ্ধ-

যুগে অধ্যাত্মসাধনার উৎকর্ষ ঘটিয়াছিল এবং তাহার ফলে সমাজের নানাস্থানে আবার সিদ্ধিসকলের উদয় দেখা গিয়াছিল। যজ্ঞনিষ্ঠ জীর্ণপ্রায় বৈদিক সমাজের উপকণ্ঠে পূর্ব্ব হইতেই যে তন্ত্রসাধনা নূতন জীবনে সঞ্জীবিতা ও নববলে বলবতী হইয়া আত্মপ্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই তন্ত্রসাধনা যখন ধীরে ধীরে বৌদ্ধসাধনাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, তখন বৌদ্ধযুগের নববিকশিত সিদ্ধিসকল তান্ত্রিকমূর্ত্তি ধারণ করিতে লাগিল। যে কারণে বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণসাধনা ও সত্ত্বশুদ্ধি তদানীন্তন ভারতীয় সমাজসমূহে অগণ্য দেবদেবীপূজা ও ধন্ধসঙ্কুল ক্রিয়াকলাপে পরিণত হইয়াছিল, ঠিক সেই কারণেই সিদ্ধিসকলের বিকাশ ও প্রচলন ক্রমশঃ বিষম আসুরিক ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। সিদ্ধি যখন পরমার্থলাভার্থে ও জগদ্ধিতার্থে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহাকে দৈবী সিদ্ধি বলে, কিন্তু যখন সম্ভোগলিপ্সার আকর্ষণে মানুষ সিদ্ধির অনুশীলন করিয়া মুগ্ধ হয়, তখন উহা আসুরীঃমূর্ত্তি ধারণ করে। বৌদ্ধযুগের শেষাংশে আসুরী সিদ্ধির প্রবল অনুশীলন ও প্রচলনের উপর প্রকৃতিদেবীর ভীষণ অভিশাপ নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার সহিত বোঝাপড়ার দরজা যেন সমাজের পক্ষে ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই অস্তমিতপ্রায় বৌদ্ধযুগের হুজুক বা ঝোঁকটা আজ পর্য্যন্ত আমাদের মন হইতে সম্পূর্ণ চুকিয়া যায় নাই, সেইজন্য এখনও লোকে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি নির্ণয় করিতে সিদ্ধির হিসাব করে, সেইজন্য এখনও যুগাবতার সাবধান করিয়া দেন যে, সিদ্ধি ধর্ম্মপথের বিঘ্ন।

জগদ্ধিতায় সর্ব্বত্যাগী সাধকই দৈবীসিদ্ধি-বিকাশের যোগ্যপাত্র।

সমগ্র দেশ আজ সেইরূপ সর্ব্বত্যাগী সাধকবৃন্দের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় পথ চাহিয়া রহিয়াছে। যেদিন দেশের নানাস্থানে তাহাদের আবির্ভাব ঘটিবে, সেদিন দৈবীসিদ্ধিসমূহেরও পুনরভ্যুদয় ঘটিবে, সন্দেহ নাই। ইতিহাস একবার যাহা অভিনয় করে, অবশ্যই তাহার পুনরাবর্ত্তন বারংবার ঘটে। সেইজন্য ভারতের সনাতন সাধনার সর্ব্বত্যাগী সাধকবৃন্দকে উপলক্ষ্য করিয়া আবার যেদিন ভারতীয় "কারণবিজ্ঞান" দেশে নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সেদিন ভারতের পূর্ব্বার্জ্জিত ও অন্তর্নিহিত দৈবীসিদ্ধিসমূহ আবার বৈজ্ঞানিক শিল্পমূর্ত্তিতে (artএ) অভিব্যক্ত হইয়া পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পকে আপনার নিম্নাধিকারী উত্তরসাধকরূপে পরিণত করিবে; কেননা, পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের প্রভাব কার্য্যপ্রপঞ্চের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কারণ-রাজ্যে উহার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ খাটে না, অর্থাৎ উহা বহির্বিষয়াবগাহিনী একটী শক্তির দ্বারা আর একটী শক্তিকে আয়ত্ত করে, উহাদের সূক্ষ্মতর উৎস হইতে উহাদের স্ফূরণ বা স্তম্ভনের উপর ঐ যন্ত্রশিল্পের কোনও হাত নাই; কিন্তু ভারতীয় "সংযম"-শিল্প বা বিভূতিযোগ,—বহির্বিষয়াবগাহিনী শক্তি ও মানুষের মনের শক্তি, এই উভয়ের যে এক অভিন্ন উৎস বিদ্যমান,—সেই কারণভূমির দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দেয়; অতএব এ শিল্পের নিকট জগতের আর সব শিল্পই নিতান্ত অর্ব্বাচীন ও নিম্নপদভাগী। কিন্তু তথাপি দেশের সমষ্টিশক্তির বিকাশ ও প্রয়োগের নানা কৌশলসম্বন্ধে পাশ্চাত্য যন্ত্রশিল্পের এমন একটা কার্য্যকারিতা আছে, যাহা প্রাচীন আর কোনও বিদ্যা বা শিল্পের নাই, সেইজন্য আধুনিক যন্ত্রশিল্প শিক্ষা করিতে করিতেই আমাদিগকে প্রাচীন বিভূতিযোগের দিকে

অগ্রসর হইতে হইবে এবং পাশ্চাত্য কার্য্যবিজ্ঞানকে পূর্ব্বকথিত-ভাবে ভারতীয় কারণবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিম্ন-থাকে স্থান দিতে হইবে।

ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে পাশ্চাত্যশিক্ষাকে সমন্বিত করিবার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কথা প্রথমেই উত্থাপন করা সমীচীন হইয়াছে,—কারণ, বিজ্ঞানই প্রত্যেক শিক্ষা বা cultureএর কেন্দ্র-স্থানীয় নিয়ামক। জীব ও জগতের সহিত তোমার আমার যেরূপ সম্বন্ধ বিজ্ঞান নির্ণয় করিয়া, দেয়, শিক্ষা বা culture ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ আরোপ করিয়া, সেই সম্বন্ধজনিত দৃষ্টিতে,—জীবজগতের সহিত আজীবন ব্যবহার করিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত ও প্রণোদিত করে। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জগৎকে একটী বিরাট্ যন্ত্ররূপে ধারণা করে; উহা জীবকেও একটী সূক্ষ্মতর যন্ত্র ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে রাজী নহে। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম-সাধক, বা কাব্যরসরসিক, তাঁহারা অবশ্য বিরাটকে অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষায় এখনও ঐ দুই রকম দৃষ্টির একটা সামঞ্জস্য সাধিত হয় নাই; কারণ, যাহা প্রত্যক্ষ-হিসাবে সত্য তাহাই শিক্ষা বা cultureএর গতি ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে; যাহা ভাব বা sentimentএর হিসাবে সত্য, তাহার সে প্রভাব নাই—তাহা কেবল উপাদেয় বলিয়া শিক্ষা বা cultureএর মধ্যে একটা স্থান লাভ করে মাত্র। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিরাটকে জড়যন্ত্ররূপে প্রত্যক্ষ করে, সেইজন্য সেই প্রত্যক্ষই পাশ্চাত্য শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি নিরূপিত করিয়া দিতেছে; অপরপক্ষে আধুনিক খৃষ্টীয় সাধক ও কবির

দৃষ্টিমূলে sentimentই বিদ্যমান, প্রকৃত অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বা realisation নাই।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জীবজগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিবে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সেই দৃষ্টি অবলম্বন ও আরোপ করিতে হইবেই। সেইজন্য পাশ্চাত্যের নানা বিদ্যার মধ্যে সেই দৃষ্টিই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। জগৎ যদি একটা বিপুল যন্ত্র হয়, তবে উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতি অবয়বের খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত, আমাদের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রণিধানযোগ্য হইবে; কিন্তু জগৎ যদি একটা স্বতন্ত্র যন্ত্রবিশেষ না হইয়া সূক্ষ্মতর ভাবপ্রপঞ্চের স্থূলবিকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে আমাদের পক্ষে হৃদয়বেদ্য সূক্ষ্ম ভাবই অধিক প্রণিধানযোগ্য হইবে; অবস্থানবর্ণভূতাদিসংঘাতে উহার যে স্থূল বিকাশ ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে, তাহা ততটা প্রণিধানযোগ্য হইবে না। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের নির্দ্দেশ মানিয়া পাশ্চাত্য-চিত্রশিল্প ভাব অপেক্ষা স্থূলবিকাশের অবয়বকে বেশী প্রণিধানযোগ্য বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছে। কিন্তু ভারতীয় চিত্রশিল্প তুলি ধরিয়া যেন হৃদয়ের ভাবই আঁকিতে চায়, স্থূল অবয়ব আঁকিতে চায় না; সেইজন্য অনেক সময় অনেক জিনিসের ছবি আমাদের প্রত্যক্ষের অনুরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার তুলনায় বেশ বিসদৃশ মনে হয়। অবশ্য অনেকস্থলে এই বৈষম্যকে কমাইয়া আনা দরকার হইয়াছে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতীয় চিত্রশিল্প ধ্যেয় বস্তুই আঁকে, যথাদৃষ্ট বস্তু আঁকে না; উহার ছবির সহিত দৃষ্ট বহির্বিষয়ের খুঁটিনাটি মিলাইতে গেলে চলিবে না, সে ছবি সর্ব্বাঙ্গে ও সর্ব্ববিষয়ে ভাবকে বিকাশ করে কি না, তাহাই মিলাইতে হইবে।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাসমন্বয়।

কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলাসম্বন্ধে আসল কথাটী এখনও আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। সেইজন্য নবপ্রস্তাবিত ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি, "ভারতীয়" এই নামের জোরেই যতটা আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের চিত্তহরণ করিতে ততটা পারিতেছে না। আমরা ভারতীয় শিক্ষা বা culture-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, জীবজগতের সহিত ব্যবহারে ও সকল রকম বিদ্যার চর্চ্চাতেই আমাদের একটী যেন নিজেদের "কোট" আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ভারতীয় শিক্ষার সহিত সমন্বিত বা অঙ্গীভূত করিতে যাই, বা আর যাহাই করিতে যাই, সেই সনাতন নিজেদের "কোট"টীকে কোনমতেই পরিহার করা হইবে না। যখন বলা যায়—অতীন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের উপর ভারতীয় শিক্ষা বিবর্দ্ধিত হইয়াছে, যখন বেদ বলিতেছেন—ভারতীয় শিক্ষা ব্রহ্মপ্রত্যক্ষ হইতে নিঃশ্বসিত ধূমরাশির মত নির্গত হইয়াছে, তখন আমাদের নিজেদের "কোট" যে কি, তাহাও বলিতে বাকি থাকে না। পরমার্থের প্রতি ভারতীয় শিক্ষার অনন্যগতিনিষ্ঠতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; পরমার্থই যে ভারতীয় শিক্ষার চরম প্রয়োজন ও উদ্ভবস্থান, তাহাও বারংবার বলা হইয়াছে। "ভারতের সাধনায়" আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতে সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার; অতএব ভারতীয় শিক্ষায় পরমার্থই যে, উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজনের স্থানভাগী হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহা হইলে আমাদের নিজেদের "কোট" বলিতে আমরা বুঝি—পরমার্থদৃষ্টি; এই পরমার্থদৃষ্টির আরোপ করিয়া

ভারতীয় শিক্ষায় প্রত্যেক বিস্তার উদ্ভব, স্থিতি ও প্রয়োজন নিরূপিত করিতে হইবে।

কিন্তু আমরা আজকাল যে চিত্রকলার অনুশীলন করিতেছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও আমরা নিজেদের "কোটে" প্রকৃতভাবে দাঁড়াইতে পারি নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশের চিত্রকলা ছবি আঁকিতে ভাব আঁকে; অতএব অঙ্কনীয় বিষয়ের একটা সনাতন বা সর্ব্বজনগোচর ভাব নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। তাহা না হইলে, তোমার অঙ্কিত ছবি আমি বুঝিব কেন? কিন্তু অধুনা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি-অনুসারে যে সমস্ত পৌরাণিক চিত্রের দ্বারা যে সকল ভাব অঙ্কিত করা হইতেছে, তাহার মূলে সনাতনত্ব বা সার্ব্বজনীনত্ব আছে কি? তুমি রামচন্দ্রকে যেরূপ বুঝিয়াছ, তুমি সেইরূপ আঁকিতেছ, আবার শিবকে যেমন বুঝিয়াছ, তেমনই গড়িতেছ; কিন্তু সমগ্র সমাজটা রামচন্দ্র বা শিবকে কিরূপ বুঝিতেছে বা কিরূপ বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহা তুমি প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছ কি? যদি বল, আজকাল পৌরাণিক দেবদেবী বা মহাজন প্রভৃতি সম্বন্ধে সমাজের ভাব ও ধারণা সম্পূর্ণ গুলাইয়া গিয়াছে, অতএব কোনরূপ নূতন ভাব ও ধারণা চিত্রকরদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি—ঐ শিল্পিগণ নূতন করিয়া ঐ সমস্ত ভাব গড়িয়া তুলিবার কে? তাহাদের গড়া-জিনিস দেশ লইবে কেন? তাহারা ভারতীয় পদ্ধতি-অনুসারে ধ্যান করিয়া ঐ সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি কি দেখিয়া লইয়াছেন যে—তাহারা ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি-অনুসারে উহাদিগকে তুলিতে আঁকিয়া দেশকে শিখাইতে স্পর্দ্ধা

করিয়াছেন ? তুমি যদি ধ্যানসিদ্ধ চিত্রকর হও তবে তোমার চিত্র হইতে দেশের লোকের ভাবশিক্ষা হইতে পারে ; কিম্বা যদি দেশে পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়ে প্রাচীন ইতিহাসপুরাণের বর্ণনা আবার নূতন করিয়া জীবন্ত ভাবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তবে তুমি চিত্র-বিদ্যার দ্বারা সেই সকল ভাবমূর্ত্তির প্রচারে কৃতকার্য্য হইতে পার। ভারতীয় সনাতন সমাজ সেই আদিযুগ হইতে যে ভাবের ভাবুক হইয়া বিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, যে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট ভাবভিত্তির উপর সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা সুখ-দুঃখ, ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যে ঐ সমাজের সকল লীলা, সকল সাধনার উদ্ভব ও লয় হইতেছে, সেই মূলভাবটী যখন ভারতীয় চিত্রকরের তুলিকা ধারণ করিয়া বর্ণ ও রেখার দ্বারা নানা চিত্রের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত ও চিত্রিত করিতে থাকিবে, তখন বলিব—ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি আবার নূতন প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। নচেৎ আগেকার যুগের চিত্রশিল্পীদের রেখা টানিবার ধাঁজটী মাত্র আজ অনুকরণ করিতে পারিলেই যদি ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির পুনরুদ্ধার হইয়া যায়, তবে উপবীতমাত্র গ্রহণ করিলেই আধুনিক কায়স্থ-বিগ্রহে প্রাচীন ক্ষত্রিয়ত্বের পুনঃসঞ্চার না হইবে কেন ?

সর্ব্বাগ্রে সমগ্র দেশকে আপনার “কোটে” ফিরিয়া আসিতে হইবে। দেশের যাহারা ফিরিলে, সমগ্র দেশটা ফিরিতেছে—একথা বলা যায়, অবশ্য তাহাদের কথাই বলিতেছি। তাহারা আজ পর্য্যন্ত যে পরের কোটে, অথবা পরের কোটের আশেপাশে দিন কাটাইতেছে, তাহাই বুঝিতে পারা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। পরের কোট ও আপনার কোটে প্রভেদ কি, তাহা সম্যক্ রূপে বুঝিতে

পারিলে, তবে আপনার কোটে ফিরিবার চেষ্টা ফলবতী হইতে আরম্ভ করিবে,—নচেৎ নহে। ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিদ্যার ক্ষেত্রে যে আপনার কোটে ফিরিবার একটা উদ্যম ও প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে, সেজন্য অবশ্য প্রবর্ত্তকগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ অর্পণ করিব; কিন্তু আমাদের নিজের কোট কি, এবং সে কোটে ফিরিবার পথপ্রদর্শক হইতে হইলে সত্যের বিচারমূলক সমঝদার (man of intellectual appreciation) হইতে পারিলেই চলিবে, কি সত্যের প্রত্যক্ষমূলক সমঝদার (man of spiritual realisation) হইতে হইবে, সকলেরই পক্ষে এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবারও সময় আসিয়াছে; নতুবা সর্ব্ববিভাগে আমরা ভারতীয় সনাতন সাধনপথে ফিরিয়া আসিতেছি, এ কথা মনে ভাবিলেও, প্রকৃতপক্ষে পথ যে আমরা আরও গুলাইয়া ফেলিতেছি না, তাহা কি কেহ সমস্যার গুরুত্ব ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে জোর করিয়া বলিতে পারেন ?

ভারতীয় সনাতন সমাজের আপনার "কোট" যে কি, তাহা আধুনিক ইতিহাসও প্রমাণ করিয়া দিতেছে; কেন না, এখনও সে সমাজ আপনার কোটে যে বিপুল শক্তির পরিচয় দিয়াছে, সেরূপ পরিচয় অপরের কোটে পথভ্রান্ত হইয়া দিতে পারে নাই; পরমার্থসাধনার গৌরবশিখরে যে উচ্চস্থান সে আজও অধিকার করিয়াছে, আর কোনও সাধনায় সে স্থানে পৌঁছিতে পারে নাই। আপনার কোটে আজ এই অসাধারণ শক্তির অভ্যুত্থান হওয়ায়, সমাজ আপনার সমস্ত সাধনার প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া পাইয়াছে। সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়মূলক পরমার্থসাধনরূপ প্রতিষ্ঠাভূমিতে

আজ যদি আমরা ফিরিয়া আসিতে পারি, তবেই নিজের কোটে ফিরিয়া আসা হইবে। তখন ভারতীয় শিক্ষায় বিজ্ঞান-শিল্পের আবার পুনরভ্যুদয় ঘটিবে। সে অভ্যুদয় কিরূপ লক্ষণাক্রান্ত, তাহা আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ইঙ্গিত করিলাম; অপরাপর বিদ্যাসকলের পুনরভ্যুদয় সম্বন্ধে আগামীবারে আলোচনা করাই শ্রেয়স্কর; কারণ, এবার স্থানাভাব।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাসমন্বয়

(উদ্বোধন—অগ্রহায়ণ, ১৩২০)

গতবারের (একাদশ) প্রবন্ধে 'শিক্ষাসমন্বয়ের' কথা শেষ হয় নাই, সেইজন্য এবারকার প্রবন্ধের শিরোনামা একরূপই রহিল।

গতবারের প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, ভারতীয় শিক্ষার (culture) দৃষ্টিতে জড়জগৎ একটী বিরাট্ জড়যন্ত্রমাত্র নহে; ভারতীয় শিক্ষা স্থূলসূক্ষ্ম জড়কার্য্যসমষ্টির ভিতরে অব্যক্তকারণরূপিণী প্রকৃতির অধিষ্ঠান স্বীকার করে,—সে প্রকৃতি চিন্ময়ী, ভাববিলাসিনী, অতীন্দ্রিয়প্রত্যক্ষগম্যা। প্রকৃতি বা কার্য্যময় জগৎ ভারতীয় শিক্ষায় পাশ্চাত্যশিক্ষার মত একটা বিরাট্ জড়যন্ত্ররূপে গ্রাহ্য হয় না বলিয়া, ভারতীয় শিল্প-বিজ্ঞানাদির গতি ও প্রকৃতি উভয়ই আলাদা। কিন্তু তথাপি কারণবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে না হউক, কার্য্যবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যশিক্ষার সহিত ভারতীয় শিক্ষা একযোগে কার্য্য করিতে পারে;—কেবল স্মরণ রাখিলেই হইল যে, পাশ্চাত্য কার্য্যবিজ্ঞানে একটা sequence (কার্য্যকারণপুট)-এর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তীকে কারণ বা cause বলিলেও, উহা প্রকৃতপক্ষে "নিমিত্তমপ্রযোজকং বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ।"*

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় শিক্ষা জীবজগৎসম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য। পাশ্চাত্য জীবনবিজ্ঞান (Biology) আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষায় গুরুতর প্রভাব বিকীর্ণ করিতেছে। ইহার যেন একটী প্রান্তে বনিয়াদরূপে

---

* ১০ম ("শিক্ষাসংঘর্ষ") ও ১১শ ("শিক্ষাসমন্বয়") প্রবন্ধদ্বয়ে আলোচিত।

জড়বিজ্ঞান অবস্থিত, এবং অপরপ্রান্তে মনোবিজ্ঞান, চারিত্রবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যাগুলি বিজৃম্ভিত হইতেছে। কিন্তু জড়বিজ্ঞান হইতে সুরু করিয়া জীবনবিজ্ঞানের ভিতর দিয়া যতই অপর প্রান্তের বিদ্যাগুলির দিকে আমরা বেশী অগ্রসর হই, ততই ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের এলাকা অতিক্রম করিতে হয়, এবং বিষয়ও সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। মনোবিজ্ঞানেও ঐন্দ্রিয় স্থূল-প্রত্যক্ষ অপেক্ষা আন্তর-প্রত্যক্ষ বা introspection এর প্রয়োজনই বেশী দেখা যায়। এই কারণে, অর্থাৎ ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষকে ষোল আনা অবলম্বনরূপে লইতে পারে না বলিয়া, এই সমস্ত বিদ্যা পাশ্চাত্য শিক্ষা বা cultureএর অঙ্গভূষণ বটে, কিন্তু ঐ শিক্ষার উপর জড়বিজ্ঞানের মত অভিভাবকতা করিতে পারে না। পাশ্চাত্য শিক্ষায় জীব জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা প্রকৃত-ভাবে বুঝিতে হইলে, এই সমস্ত বিদ্যার আশ্রয় লইলে চলিবে না; এ সমস্তের মধ্যে theory বা ফাঁকা মতামত প্রচুর মিলিবে, কিন্তু যে তত্ত্ব প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষিত পাশ্চাত্যদের মধ্যে জীবজগতের প্রতি প্রয়োগযোগ্য দৃষ্টি গড়িয়া দিতেছে, সে তত্ত্বের উদ্ভবস্থান অন্যত্র,—সে তত্ত্ব রাজনীতি ও ব্যবহারশাস্ত্রের সংযোগে জন্মলাভ করিয়াছে।

পাশ্চাত্যে দিব্য তত্ত্বালোকে মানুষকে মানুষ চিনে নাই, অর্থাৎ সে দেশে আদিম যুগ হইতে সাধারণী শিক্ষার মূলে এমন কথা ধ্বনিত হয় নাই, যথা—'যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি সর্ব্বভূতেষু চাত্মানাং ততো ন বিজুগুপ্সতে।' প্রাকৃত মানুষ মানুষকে চিনে ব্যবহারের খাতিরে, অর্থাৎ পরস্পর একটা আদানপ্রদান আছে

বলিয়া। পাশ্চাত্যের আদিযুগে ঐরূপ প্রাকৃত মানুষ প্রাকৃতভাবেই মানুষকে চিনিয়াছিল, তত্ত্বজ্ঞ ঋষির দ্বারা কোনরূপ জীবনাদর্শের আলোক তাহাদের দৈনন্দিন ব্যবহারক্ষেত্রের উপর নিক্ষিপ্ত হইত না। জীবের সহিত জীবের ব্যবহার বলিতে নানা রকমের আদান-প্রদান বুঝায়; রজোগুণী স্বার্থান্ধ হইয়া এই আদানপ্রদানের মধ্যে "আদান", "আদায়," বা স্বাধিকারের উপর বেশী ঝোঁক দেয়, সত্ত্বগুণী "প্রদান", "ত্যাগ," বা স্বধর্ম্মের উপর বেশী ঝোঁক দেয়। পাশ্চাত্যের আদিম মানুষ রজঃপ্রবণ ছিল, তাই নিজের ও পরের স্বাধিকার হিসাব করিতে করিতে সমাজ গড়িয়াছিল। স্বাধিকার বা rightএর হিসাব তাহার সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের মূলগ্রন্থি ছিল। সমাজের নানা অঙ্গের, নানা শ্রেণীর নানা ব্যক্তির স্বাধিকারকে সমঞ্জসীভূত করিয়া রাখাই পাশ্চাত্যের চিরন্তন সমাজসমস্যা। কিন্তু স্বাধিকারবিরোধ যখন একবার দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহা নির্ব্বাপিত করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইউরোপের ইতিহাসে এই স্বাধিকারবিরোধের যে কতবার কত রকমের মীমাংসা করা হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া দেখিবার জিনিষ বটে; কিন্তু সেই ইতিহাসে একথা বেশ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যদি ইউরোপে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব প্রচার না করিতেন, তবে খ্রীষ্টীয় যুগের পূর্ব্বে যে সমস্ত শক্তি স্বাধিকারসামঞ্জস্যের পক্ষে ইউরোপে কার্য্য করিতেছিল, কেবল তাহাদের সাহায্যে ইউরোপীয় সমাজ আর বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। রজোগুণাধিক্যে স্বাধিকারবিরোধ (conflict of rights) ধূমায়িত হয়; সে রজঃপ্রবণতাকে কথঞ্চিৎ সংযত না করিতে পারিলে পাশ্চাত্যের

সমাজ শান্তি বা স্থিতি লাভ করে না। প্রাচীন ইউরোপের উপচীয়মান রজঃপ্রবণত্বকে গ্রীসীয় ও রোমীয় সভ্যতার প্রভাব ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই, খৃষ্টধর্ম্ম তাহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। যে দুর্দ্দান্ত পাশবিক রজোভাব একদিন ইউরোপকে বর্ব্বরতার অন্ধকারে ডুবাইতেছিল, ভগবান্ যীশুর জীবনমন্থনে উদ্ভূত বিপুল সত্ত্বামৃত সেই রজোভাবকে এমন কায়দায় ফেলিয়া আয়ত্ত করিয়া লইল যে, ইউরোপ নবজীবন লাভ করিল। তারপর ইউরোপীয় সমাজসমূহে, নানা দিকে, সকল পক্ষের স্বাধিকারভোগের মধ্যে নানারূপ সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন আমাদের প্রশ্ন এই যে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় জীব জীবের প্রতি কিরূপ দৃষ্টিতে নিত্য-ব্যবহার সম্পন্ন করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্যশিক্ষায় ব্যবহারনীতি ও রাজনীতির প্রভাবই মানুষের প্রতি মানুষের সম্বন্ধ ও দৃষ্টি নির্ণীত ও গঠিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা বা culture প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়ায়, অনুমানজনিত বা বিচারজনিত তত্ত্বলাভের উপর দাঁড়ায় না। সেইজন্য ঐন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের এলাকামধ্যে মানুষের প্রতি মানুষ যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্যবহারের বহুকাল সঞ্চিত অভিজ্ঞতা হইতেই পাশ্চাত্য শিক্ষা জীবজগৎ সম্বন্ধে একটা বিশেষ দৃষ্টি গড়িয়া তুলিয়াছে। ঐ বহুযুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্রে ও রাজনীতিশাস্ত্রে নিহিত রহিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতীয় শিক্ষা জীবের প্রতি জীবের প্রযোজ্য দৃষ্টিটী গড়িয়া তুলে নাই। যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে ভারতীয় শিক্ষা ঐ দৃষ্টি গঠিত করিয়াছে, তাহার

সম্বন্ধে বেদ বলিতেছেন, “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনু-পশ্যত।” এই একত্বের অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া ভারতীয় সাম্যবাদে এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা পাশ্চাত্য সাম্যবাদে আমরা দেখিতে পাই না।

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ ভোগাধিকারের সাম্য লইয়া, ভারতীয় সাম্যবাদ বস্তুগত অভেদতত্ত্ব লইয়া; ভোগাধিকারের সাম্য একটা কাল্পনিক লক্ষ্যমাত্র, সেরূপ সাম্য বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ হয় না,—কেবল ভাবিয়া লইলে সমাজের একটা শান্তি ও গতিশীলতা থাকে; কিন্তু সর্ব্বজীবে অভেদতত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয়, সেরূপ প্রত্যক্ষের একটা সাধনা আছে। এই সাধনার ফলে এমন সাম্যদৃষ্টি লাভ করা যায় যে, মানুষে-মানুষে শতরকম ব্যবহারিক ভেদ থাকা সত্ত্বেও সে ভেদ বিষহীন সর্পের মত সমাজের নানা প্রীতিবন্ধনের অনিষ্ট করিতে পারে না। পাশ্চাত্য সাম্যদৃষ্টি ভোগে, ঐহিক প্রতিপত্তিতে, সমকক্ষতা প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যত, কিন্তু তথাপি প্রকৃতির অলক্ষ্য নিয়মে ভোগে ছোট-বড় থাকিয়া যায়,—কেবল তৃপ্তি এই থাকে যে, ভোগ সমান না হইলেও, ভোগাধিকার ত সমান, এখন যোগ্যতা সমান করিতে পারিলেই, ভোগও সমান হইয়া যাইবে;—কিন্তু হায়! প্রকৃতি যোগ্যতা সমান করিতে দেয় না। ভারতীয় সাম্যদৃষ্টি ভোগের ছোট-বড় লক্ষ্যই করে না, ভোগাধিকারের হিসাবও করে না; এ জগতে যার যেমন প্রবৃত্তি ও উদ্যম, তার সেইরূপ ভোগ ও সিদ্ধি,—“স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে”; যার প্রাক্তন কর্ম্মফল যেরূপ, তার বর্ত্তমান জীবনের ভোগ সেইরূপ হইবে; এই ঘূর্ণায়মান

কর্ম্মচক্রে ঘুরপাক ত অমনিতেই খাইতে হয়, সেজন্য আবার সামাজিক ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত কেন করিব? তার চেয়ে যে ত্যাগ ও সংযমের বলে এই কর্ম্মচক্রকে ফাঁকি দেওয়া যায়, সেই ত্যাগ ও সংযমের হিসাবে সমাজ গড়িতে হইবে। এইজন্য স্বাধিকারের হিসাব করিতে করিতে সমাজ না গড়িয়া, ভারত স্বধর্ম্মের হিসাব ধরিয়া সমাজ গড়িয়াছে,—বলিয়াছে, যার স্বধর্ম্ম বড়, সেই বড়, যার স্বধর্ম্ম ছোট, সেই ছোট; যে ত্যাগে বড়, সেই বড়, যে ত্যাগে ছোট, সই ছোট; অর্থাৎ যদি ব্যবহারিক জগতের অকাট্য নিয়মে সমাজে বড়-ছোট দেখিতেই হয়, তবে ছোট হইতে বড় হইবার এমন একটী সোপান বিলম্বিত করা যাউক, যাহা দ্বারা মানুষ সত্য সত্যই, আসল হিসাবে, বড় হইতে পারে,—যে সেতুদ্বারা মানুষ ভেদমূলক সর্ব্বব্যবহার-ধন্ধ উত্তীর্ণ হইতে পারে। ভেদ-জঞ্জাল অতিক্রম করিবার ইহা ভিন্ন উপায় নাই। ভারতীয় সাম্যবাদ প্রকৃতই চক্ষুষ্মান্, সেইজন্য ভোগাধিকারের হিসাব করিয়া সামাজিক শ্রেণী বা থাক্ নির্দ্দেশ করিতে যায় নাই,—বড়-ছোট হিসাব করিবার জন্য সমাজের হাতে স্বধর্ম্মের মাপকাটী দিয়াছে।

পাশ্চাত্য সাম্যবাদ চায় সমস্ত মানুষকে ভোগাধিকারে সমকক্ষ দেখিতে; তার কাল্পনিক দৃষ্টির দৌড় তুল্যতা পর্য্যন্ত, বেদোক্ত একত্বের খোঁজ-খবর সে তত রাখে না। মানুষের সাংসারিক অবস্থার তুল্যতা বা সাম্যই যার লক্ষ্য, তাকে সব সময়ই যুদ্ধার্থী হইয়া থাকিতে হয়; কারণ, সমাজে ঐরূপ তুল্যতা বা সাম্য সর্ব্বদা ভাঙ্গিয়াই রহিয়াছে,—সামাজিক মর্য্যাদাদানে তারতম্য সর্ব্বদাই রহিয়াছে, সর্ব্বদাই পদ, কুল, শীলের মধ্যে ছোট-বড় থাকিয়া যাইতেছে। সকল মানুষ

সংসারে সমান শক্তি লইয়া জন্মায় না, অতএব নানা বিষয়ে সামর্থ্যের তারতম্য থাকিলে অধিকারের তারতম্য থাকিবেই; সব রকমেরই গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র নিতান্ত আত্মরক্ষার জন্য আপনারই বিগ্রহে উচ্চ-নীচ অঙ্গভেদ গড়িতে বাধ্য। কিন্তু সে কথা বলিলে কি হয়,—পাশ্চাত্য সাম্যবাদের পক্ষে সকল রকম বৈষম্যই অসহনীয়; সেইজন্য পাশ্চাত্য সাম্যবাদীর সর্ব্বদাই "যুদ্ধং দেহি" ভাব, সর্ব্বদাই তাহারা বিরোধ-ধনুর জ্যা টানিয়া বসিয়া আছে। দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবটী আমাদের দেশেও সঞ্চারিত হইয়া পড়িতেছে; মনুষ্যজীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলি আমাদের হিসাবেও অত্যধিক গণ্য হইতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সমস্ত বৈষম্য মানুষের দ্বারা সৃষ্ট, সে সমস্তের মূলে কোনও সমাজনীতি বা সাময়িক প্রয়োজন নিহিত ছিল বা আছে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অগ্রেই আমরা উচ্চবর্ণাদির স্কন্ধে দোষ চাপাইয়া উত্তেজিত হইতেছি। এ সমস্ত অসহিষ্ণুতার ফল। বাস্তবিকই পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে মনুষ্যজীবনের বাহিরের বৈষম্যগুলির প্রতি আমাদের মনে একটা যেন অসহিষ্ণুতা আসিয়া পড়িয়াছে,—ভাব এই যে, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ যেমন social equals গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর, আমরাই বা কেন সেরূপ না হইব? ভারতীয় সাম্যবাদ যে কিংস্বরূপ, তাহার মধ্যে ভোগাধিকারের হিসাব আছে কি না, পাশ্চাত্য সাম্যবাদ অপেক্ষা উহা শ্রেষ্ঠতর ও ভারতীয় সমাজ ও সাধনার পক্ষে যোগ্যতর কি না, এত কথা ভাবিয়া দেখিবার আমাদের অবসর নাই! সামাজিক সম্মান একটা ভোগ্য বিষয়; ভারতীয় সমাজে যাহাদের স্বধর্ম্মের

গুরুত্ব বেশী ছিল, অর্থাৎ যাহারা ত্যাগে বড় ছিল, তাহাদের নিকট ঐ সম্মান অযাচিতভাবে উপস্থিত হইত। এখন অবশ্য সমাজের অধঃপতিত অবস্থায় স্বধর্ম্মও বিগড়াইয়াছে, সম্মানের যাচকতাও যথেষ্ট আছে। কিন্তু যাহারা সমাজসংস্কারে উদ্যোগী তাহারা ঐ সম্মানকেই পাশ্চাত্যদের হিসাবানুযায়ী একটা ভোগাধিকারের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, এবং সামাজিক সম্মানের সোপানে অধস্তন জাতিদের উন্নয়নের জন্য তাহাদের পক্ষ হইতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের অভিযোগ এই যে আমরাই সমগ্র সামাজিক সম্মানটা ভোগ করিব, আর নীচ জাতিরা তাহার অংশ পাইবে না,—এ বড় অত্যাচারের কথা। ইহা ছাড়া, সমাজের নানা জাতি বাহিরের একটা চিহ্ন বা ভেক ধারণ করিয়া, যাহাতে সামাজিক সম্মান বেশী করিয়া লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিতেছে। চারিদিকে সামাজিক সম্মান বা মর্য্যাদার একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। নীচ জাতিদের মধ্যে যদি কেহ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিল, তবে ত কথাই নাই,—তার অসহিষ্ণুতা শতগুণে বাড়িয়া গেল, সে নিজে ও তার পক্ষ হইতে অগণ্য লোক সামাজিক সম্মানের দাবীতে তুমুল আন্দোলন তুলিল। এই যে সামাজিক সম্মানের জন্য তীব্র আগ্রহ ইহার সঞ্চার অবশ্য ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে সুরু হইয়াছে। যখন বৌদ্ধযুগের সমাজ-ব্যবস্থা লুপ্ত হইয়া নূতন করিয়া বৈদিকতার প্রতিষ্ঠা হইতে লাগিল, সেই সময় সামাজিক আভিজাত্য ও সম্মানের নূতন-নূতন হিসাব গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা

দেশে ত কৌলিন্য লইয়া একটা বিরাট্ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। অতএব সামাজিক সম্মানের উমেদারী কতকটা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের দেশে সুরু হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেকালে ঐ সম্মানের ভাগাভাগি বা বণ্টন রাজারাজড়াদের উপর নির্ভর করিত, সেইজন্য ঐ উমেদারী কাড়াকাড়িতে পরিণত হইতে পারে নাই। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সর্ব্বত্রই মানুষ ভোগাধিকার লইয়া নিজ নিজ নখদংষ্ট্রা পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে শিখিতেছে; এ অবস্থায় সামাজিক সম্মানের জন্য কে আর উমেদারী করিবে এবং কোথাই বা করিবে;— তাই দেখিতেছি সর্ব্বত্র কাড়াকাড়ি কামড়াকামড়ি আরম্ভ হইয়াছে; সমগ্র দেশে ভীষণ, চিরস্থায়ী বিরোধের বিষ সঞ্চারিত হইতেছে।

আমাদের আপত্তি এই যে, এই সমগ্র ভাবটিই আমাদের দেশের শিক্ষা বা culture-এর বিরোধী। ভারতীয় শিক্ষা মানুষের সম্মুখে একটা সামাজিক সম্মানের সোপান খাড়া করিয়া দিয়া, উহাতে উঠিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানুষকে প্রলুব্ধ বা উত্তেজিত করে নাই; ভারতীয় শিক্ষা সামাজিক উন্নতির এমন অর্থ করে নাই। প্রকৃতির পক্ষপাতহীন বিধিতে যিনি সমাজের যে কক্ষে জন্মহেতু অবস্থিত, সেই কক্ষ সম্বন্ধে দ্রোহী না হইয়া সন্তোষপরায়ণ হওয়াই ভারতীয় শিক্ষার অঙ্গ। উপনিষদে দেখা যায় যে, অনেক তত্ত্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের নিকট যখন ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত, তখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ সম্মান দান করিয়া নিজের সামাজিক

হীনতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না, অর্থাৎ যোগ্যতায় বড় বলিয়া সামাজিক সম্মানে বড় হইতে ব্যস্ত হইতেছেন না। মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধ জ্ঞানে ও শিক্ষাগরিমায় ঋষিতুল্য হইয়াও জাতি-পেশা ছাড়িতে অধৈর্য্য হন নাই, অথবা সামাজিক সম্মানের জন্য ব্যস্ত হন নাই। আর আধুনিক হিন্দুসমাজেও দেখা গিয়াছে যে, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ নাগ মহাশয় অধ্যাত্মরাজ্যে ব্রাহ্মণত্ব অতিক্রম করিয়াও সামাজিক হিসাবে আপনার "শূদ্র" পরিচয় সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যথাযুক্ত সন্মান দিতে ভ্রমক্রমেও ত্রুটি করিতেছেন না। বাহিরে সমাজ যেরূপই ছাপ দিক্ না কেন, ভিতর হইতে বড় করিয়া তোলাই ভারতীয় শিক্ষায় সুকৌশল। ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে নিম্নজাতিও শিক্ষাভিমানী হইয়া উঠে না, সামাজিক সম্মান দখল করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে না, অন্ততঃ একটা জন্ম নিরুদ্বেগে অপেক্ষা করিবার মত ধৈর্য্য সে শিক্ষার দ্বারা যথেষ্ট সঞ্চারিত হয়।

বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় শিক্ষার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইতেছে। আমরা অষ্টম ("শিক্ষা") প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, সমাজের যেরূপ স্তরেই যিনি অবস্থিত হউন, ভারতীয় শিক্ষায় তাহার সামর্থ্যানুযায়ী অধিকার বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে সকল শ্রেণীর নজর সামাজিক সম্মানের দিক্ হইতে ফিরাইয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষার প্রতি নিপতিত হয়, সামাজিক সম্মান কে কত দখল করিয়া বসিবে তাহার হিসাব-গণ্ডা ভুলিয়া যাহাতে ভারতীয় শিক্ষা কে কতটা দখল করিতে

পারে তাহারই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত হয়—সেইরূপ দেশব্যাপী উদ্যম ও আন্দোলনেই দেশের ও সমাজের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যাঁহারা প্রকৃত সমাজসংস্কারক হইতে চান, তাঁহারা সম্মানের কাড়াকাড়ি হইতে সমাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া ভারতীয় শিক্ষার কাড়াকাড়িতে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করুন, ইহাই বাঁচিবার পথ, অন্যথা কেবল সম্মান ও কর্ত্তৃত্বের কাড়াকাড়ি করিতে চারিদিকে সম্মিলনী গড়িবার আন্দোলনের দ্বারা সামাজিক সংঘর্ষ ও মৃত্যুর পথকেই আরও সুগম করা হইবে। সকল শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার করিবার জন্য সমগ্র সমাজ কটিবদ্ধ হউন। সকল বর্ণকে ভারতীয় শিক্ষায় উন্নীত করিয়া তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্বের সঞ্চার করাই প্রাচীনতম সমাজস্রষ্টাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, সমাজের নানা উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদের উপর পাহারা দেওয়া উদ্দেশ্য ছিল না। যিনি ভারতীয় সমাজতত্ত্বের এই মূল কথাটী বুঝেন নাই, তিনি যেন "সমাজ" "সমাজ" করিয়া বৃথা বাহ্বাস্ফোট না করেন।

ভারতীয় সমাজতত্ত্বের মধ্যে ভোগাধিকারের হিসাব স্থান পায় নাই। এ সত্যটী মূলমন্ত্রের মত আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক। ভারতীয় সমাজতত্ত্বের মূলসূত্র স্বধর্ম্মপালন। পাশ্চাত্য ব্যবহারশাস্ত্র বলেন, স্বধর্ম্ম ও স্বাধিকার,—duty and right,—একই জিনিসের এপিট আর ওপিট; যার right আছে তার duty ও আছে; বেশ কথা। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য সামাজিকের বোঝাপাড়া স্বাধিকার বা right লইয়া, স্বধর্ম্ম বা duty লইয়া নহে; ফলে স্বাধিকারের দিক্ দিয়াই সমাজের বিধি-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে, স্বাধিকারের দিক্ দিয়াই প্রত্যেকে আত্মপ্রতিষ্ঠার

পথ খুঁজিতেছে। স্বধর্ম্মের হিসাব বা স্বধর্ম্মের প্রসঙ্গ ধর্ম্মযাজক বা ধর্ম্মোপদেষ্টার মুখেই শুনা যায়; স্বধর্ম্ম সমাজবিগ্রহে তোমার স্থান নির্দ্দেশ করিবে না, বা গতি নির্দ্দেশ করিবে না;—স্বধর্ম্মের ভরসা তোমার-আমার মর্জ্জির উপর, তাহার কোনও জবরদস্তি নাই।

পাশ্চাত্য সমাজতত্ত্ব right বা স্বাধিকারের দিক্ দিয়া সমাজের বিধিব্যবস্থা গড়িয়াছে, ভারতীয় সমাজতত্ত্ব duty বা স্বধর্ম্মের দিক্ দিয়া বিধিব্যবস্থা গড়িয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্রাদি কা'র কি স্বধর্ম্ম তাহাই বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। সমাজ, পঞ্চায়েৎ বা ধর্ম্মাধিকরণ সর্ব্বদা দেখিবেন কে স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন, কে করিতেছেন না। যিনি স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন না, তিনি দণ্ডনীয়; তাঁহার স্বধর্ম্মলঙ্ঘনের ফলে যিনি উৎপীড়িত তিনি ধর্ম্মাধিকরণে বিচারার্থী হইতেন। প্রাচীনকালে law-suit, বা case কাহাকে বলিত?

স্মৃত্যাচারব্যপেতেন মার্গেণাধর্ষিতঃ পরৈঃ
আবেদয়তি চেদ্রাজ্ঞি ব্যবহারপদং হি তৎ।—(যাজ্ঞবল্ক্য।)

—স্মৃতি ও আচারের বিরুদ্ধ কার্য্যের দ্বারা কেহ যখন উৎপীড়িত হইয়া, রাজার নিকট আবেদন করিয়া বিচারার্থী হন, তখন তাহাকে ব্যবহারপদ, বা case বলে। অতএব যিনি অর্থী বা বাদী তিনি তাঁহার স্বাধিকারাভিমানের উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইতেন না, স্মৃতি ও আচার যাহাকে স্বধর্ম্ম বলিয়া কাহারও পক্ষে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে, সেই স্বধর্ম্মের লঙ্ঘনহেতু অপর একজন যখন ধর্ষিত, তখন এই উৎপীড়ন ধর্ম্মাধিকরণের গোচরীভূত করা হইত।

এইরূপ ভাবে স্বধর্ম্মের দিক্ দিয়া মানুষে-মানুষে আদান প্রদানের

হিসাব রাখা ভারতীয় সমাজনীতির বিশেষত্ব। সকল প্রকার ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বধর্ম্ম। গৃহে বা সমাজে তোমাতে-আমাতে যে মেলামেশা হয়, তাহাতে তুমি দেখিতেছ আমার প্রতি তোমার কি স্বধর্ম্ম, আমি দেখিতেছি তোমার প্রতি আমার কি স্বধর্ম্ম ; অর্থাৎ, তোমাকে আমার কি দিবার তাহাই আমার দ্রষ্টব্য, এবং আমাকে তোমার কি দিবার তাহাই তোমার দ্রষ্টব্য। কিন্তু পাশ্চাত্যে ব্যবহারনীতি ও রাজনীতি যেরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া দিয়াছে, তাহার ফলে ঐরূপ ক্ষেত্রে তুমি দেখিবে আমার সম্বন্ধে তোমার কি স্বাধিকার এবং আমি দেখিব তোমার সম্বন্ধে আমার কি স্বাধিকার, অর্থাৎ তোমার নিকট আমার কি পাইবার আছে, তাহাই আমার দ্রষ্টব্য এবং আমার কাছে তোমার কি পাইবার আছে, তাহাই তোমার দ্রষ্টব্য। পরস্পর সামাজিকদের মধ্যে এই যে দুই রকম দৃষ্টির কথা বুঝা যাইতেছে, ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, ভারতীয় সমাজ ও পাশ্চাত্য সমাজের প্রকৃতি ও ধাতুই আলাদা ?

অথচ আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-দীক্ষার মধ্যে এই গভীর পার্থক্যের কথা আমরা হিসাবের মধ্যেই আনি না। ফলে পাশ্চাত্য স্বাধিকারভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বন্যার জলের মত ঢুকিয়া বসিয়াছে ; স্বাধিকার দখল করিবার উচ্চ রোলে সমাজের সদর অন্দর হাট ঘাট বাট সব মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে,—পিতা-পুত্রে স্বামী-স্ত্রীতে আদালতে দৌড়িতেছে, চারিদিকেই 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।' সমাজ ত ভাঙ্গিয়াছিলই,—স্বধর্ম্মলঙ্ঘনের প্রতীকারসাধনে সমাজ ত পঙ্গু হইয়াছিলই,—তাহার উপর স্বাধিকারভাবের বিষ সমাজের রক্তে ঢুকিয়া গিয়াছে, অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ফোড়া, দেহ পচিয়া

খসিয়া পড়িতেছে। শাস্ত্র স্বধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব কল্পনা করিয়া ভারতকে আশ্বাস দিয়াছিল যে, অবতারপুরুষ ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে প্রয়োজনমত আসিবেন; কিন্তু এই পাশ্চাত্য স্বাধিকারভাবরূপ বিষের কথা বুঝি শাস্ত্রও কল্পনা করিতে পারেন নাই!

অবশ্য পাশ্চাত্যের পক্ষে স্বাধিকারভাব বিষ না হইয়া পথ্যই হইয়াছে। পাশ্চাত্যের ধাতুই আলাদা। জীববিবর্ত্তনের একটা গোড়ার কথা জীবে-জীবে স্বার্থবিরোধ। অবিদ্যায় এক বহু হয়, অবিদ্যায় বৈষম্য ঘটে; জীববিবর্ত্তনে সকল বৈষম্যের মধ্যে স্বার্থ-বৈষম্য একটা প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই স্বাভাবিক স্বার্থবিরোধের স্রোতে পাশ্চাত্য আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল, শেষে স্বার্থের সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হিসাব গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য একটা কূল পাইয়াছে। পাশ্চাত্যসমাজে সর্ব্ববিধ বিবর্ত্তনের গতি বিরোধ হইতে সামঞ্জস্যের দিকে; স্বাধিকার ভাব লইয়া সমাজের বিধিব্যবস্থা গড়িয়া তোলা, এ রকম সমাজেই পোষায়, অন্যত্র নহে।

ভারতীয় শিক্ষায় সমাজতন্ত্রের প্রকৃতি কি, তাহা ভারতীয় স্বধর্ম্মবাদ ও ভারতীয় সাম্যবাদ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে ভারতীয় অব্যক্তবাদের (theory of involutionএর) কথা বলিয়াছি। ভারতীয় জীবনবিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থাৎ সকল বিজ্ঞানের মূলেই ঐ অব্যক্তবাদ বিদ্যমান থাকিয়া ভারতীয় শিক্ষার একটা গভীর বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। জীবনবিজ্ঞানে পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদই যদি তুমি কেবল স্বীকার কর, তবে জগতের জীব-জানোয়ারের প্রতি নিতান্ত

একটা ব্যবহারিক দৃষ্টি ছাড়া আর কোন রকম দৃষ্টি প্রয়োগ করিবার পথ তোমার থাকিবে না, কিন্তু যদি জীবনবিজ্ঞান অনুশীলন করিবার কালে ভারতীয় অব্যক্তবাদও স্বীকার কর, অর্থাৎ যদি সকল প্রকার অব্যক্ত, ব্যবহারিক, জৈবিক বিচিত্রতার মধ্যে একই স্বরূপসত্তাকে অব্যক্ত কারণরূপে অধিষ্ঠিত দেখিবার সাধনায় যত্নবান থাক, তবে জগতের জীব-জানোয়ারের প্রতি তোমার দৃষ্টি অন্য রকম হইয়া যাইবে। ভারতীয় শিক্ষা জীবের প্রতি জীবের দৃষ্টিকে পরমার্থের সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে, ভারতে সেই জন্য সংসারও ধর্ম্মক্ষেত্র,—সেই জন্য এখানে ব্যবহারিক পারমার্থিকের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া আছে।

ভারতীয় সাম্যবাদের বিশেষত্বও অব্যক্তবাদের সুফল। মানুষে-মানুষে সমান কেন? উত্তরে ভারত বলিয়াছে, তাহারা অব্যক্ত স্বরূপে এক, যদিও ব্যক্ত লক্ষণে ভিন্ন; পাশ্চাত্য বলিয়াছে, ব্যক্ত দেহমন-চিত্তের সর্ব্ববিধ ভোগে মানুষের সমান অধিকার থাকাই ন্যায়সঙ্গত, অতএব সাম্যবাদই শ্রেষ্ঠ বাদ। পাশ্চাত্য অব্যক্তবাদ বুঝে না, বুঝিতে পারে না, সেই জন্য বহুযুগের গড়া-পিটা একটা ন্যায়বুদ্ধির উপর সাম্যবাদকে দাঁড় করাইয়াছে। এই বেলে-মাটির ভিত্তির উপর সাম্যনীতি গড়িয়া পাশ্চাত্যকে সর্ব্বদাই সামাল-সামাল ও খবরদারি করিতে হইতেছে।

ভারতীয় সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বধর্ম্মভাবেও অব্যক্তবাদের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষে-মানুষে সামাজিক সম্বন্ধ আদান-প্রদান লইয়া। মানুষ অহংতন্ত্র জীব, অহংএর স্থিরতা আছে বলিয়াই আর সমস্তের একটা ধার-করা

নিশ্চয়তা। এ অবস্থায় স্বভাবতঃ মানুষে-মানুষে আদান-প্রদান সম্বন্ধে, প্রত্যেকে আদানের ভরসাকেই মূল ভরসা, মূল খুঁটি বলিয়া ধরিয়া থাকে। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা ঠিক উল্টা বুঝাইল কিসের জোরে? প্রদানের জন্য, দিয়া দিবার জন্য মানুষকে উত্তেজিত করা, আর গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে বলা, একই কথা বলিয়া মনে হয়। এ রকম ঝাঁপ দিবার শিক্ষায় সমগ্র সমাজকে শিক্ষিত করার মূলে কি রহস্য নিহিত রহিয়াছে? রহস্য আর কিছু নয়,—এক অখণ্ড স্বরূপসত্তার প্রত্যক্ষ।

যদি তুমি ও আমি স্বরূপে এক হই, তবে আদান ও প্রদানের চরম গতি ও ফল এক হইয়া যায়। অতএব স্বধর্ম্মভাব যখন সর্ব্বদাই তোমাকে কি দিতে হইবে ইহাই আমাকে হিসাব করাইতেছে, তখন সর্ব্বদাই একটা অনিশ্চয়তায় আমাকে ঝাঁপ দিতে হইতেছে না; আমি তোমার প্রতি স্বধর্ম্ম করিতে যাইয়া নিজেরই প্রতি স্বধর্ম্ম করিতেছি,—আমার ত্যাগ ত্যাগ নহে, আত্মসম্ভোগ। মূলের এই রহস্যটী জানা ছিল বলিয়াই, ভারতের প্রাচীন সমাজ-স্রষ্টারা সমাজকে স্বধর্ম্মভাবের মধ্য দিয়া অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করাইতেন, স্বাধিকারের হিসাবগণ্ডা শিখাইতেন না। যদি বল সব মানুষ যখন স্বরূপে এক, তখন আদান-প্রদান সম্বন্ধের মধ্যে প্রদানের মত আদানের চরম ফলও ত এক? এক বটে, কিন্তু আদান বা আদায়ের ভিতরকার ভাবটী অহংতন্ত্রমূলক, অহঙ্কারের পরিপোষক। যে অহংভাব বা অহঙ্কার অবিদ্যাবৃক্ষের শিকড়তুল্য, যে অহংভাব থাকিতে মায়াজঞ্জালের নিবৃত্তি নাই, যে অহংভাবকে নিঃশেষে উৎপাটন করাই সমস্ত পরমার্থসাধনার স্ফুট বা অস্ফুট

লক্ষ্য, সমাজবন্ধনের যেরূপ মূলসূত্র অবলম্বন করিলে সেই অহং-ভাবের পরিপোষকতা করা হয়, ভারতীয় শিক্ষা সেরূপ মূলসূত্র গোড়া হইতেই পরিহার করিয়াছে, তাই "আদান" বা আদায়কে খুঁটি ধরিয়া মানুষে-মানুষে সকল প্রকার সম্বন্ধ তাঁহারা সমাজে প্রবর্ত্তিত করেন নাই।

স্বাধিকারভাব ভেদকে প্রশ্রয় দেয়, ভেদকে বজায় রাখে, সেইজন্য উহা রাজসিক; স্বধর্ম্মভাব অভেদকে উদ্বোধিত, উদ্রিক্ত করে, সেই জন্য উহা সাত্ত্বিক। স্বাধিকারসামঞ্জস্যের অনুকূলে যে উদ্যম, উহা রজোনিয়ন্ত্রিত তমের স্ফুরণ করে; স্বধর্ম্মপালনের জন্য উদ্যমপ্রকাশে সত্ত্ব নিয়ন্ত্রিত রজোভাবের লীলা হয়। ভারতীয় সমাজ সুস্থাবস্থায় সত্ত্ব-রজের ক্রীড়াভূমি, পাশ্চাত্যসমাজ সুস্থাবস্থায় রজঃসত্ত্বের ক্রীড়াভূমি।

ভারতীয় শিক্ষায় সমাজবিজ্ঞানের স্থান অতি উচ্চ ও মর্য্যাদা-মূলক। আধুনিক যুগে এই সমাজবিজ্ঞানের নূতন ব্যাখ্যা দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে; সে ব্যাখ্যায় আধুনিক বিদ্বজ্জনসম্মত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেই সমাজ বিজ্ঞানের দুই একটী মূলসূত্রের ইঙ্গিতমাত্র করিতে পারিয়াছি, কিন্তু ইহা দ্বারাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সমাজবিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিলেও ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভেদ বুঝা যায়। কিন্তু সমাজবন্ধনের মূলসূত্রে প্রভেদ থাকিলেও, অর্থাৎ পাশ্চাত্যে সমাজবন্ধনের মূলসূত্র স্বাধিকারভাব এবং ভারতে সে সূত্র স্বধর্ম্মভাব হইলেও, সমাজবন্ধনের কৌশল সম্বন্ধে পরস্পর বহু স্থলে আদান-প্রদান চলিতে পারে। অতএব ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে পাশ্চাত্য সমাজবন্ধনের কৌশলগুলি অনুধাবনযোগ্য। এই সকল কৌশলের

সাহায্যে পাশ্চাত্যের সামাজিকগণ organised বা ব্যূহবদ্ধভাবে স্বাধিকারভাবের পুষ্টিসাধন, স্বাধিকার নিরূপণ, সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ করে, তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া দেখার প্রয়োজন আছে, কেননা স্বধর্ম্মভাবের পুষ্টিসাধন, স্বধর্ম্ম নিরূপণ, স্বধর্ম্ম-সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য organised বা ব্যূহবদ্ধভাবে সাধিত হওয়া আমাদের দেশেও বর্ত্তমান যুগে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। এই organisation বা ব্যূহবদ্ধতার ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষা হইতে আমাদিগকে আহরণ করিতে হইবে, যদিও ঐ ব্যূহরচনার লক্ষ্য ও প্ররোচকভাব উভয়ই পাশ্চাত্য সমাজনিহিত ভাব ও লক্ষ্য হইতে সম্পূর্ণ আলাদা।

জড়জগৎ ও জীবজগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষা কিরূপ দৃষ্টি প্রয়োগ করে, তাহা আমরা সংক্ষেপে দুইটী প্রবন্ধে আলোচনা করিলাম। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভারতীয় শিক্ষার মধ্যে বৈলক্ষণ্য কোথায়, তাহা এই দুই প্রবন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশদভাবে আমরা দেখিলাম, এবং ইহাও দেখিলাম যে, উভয়বিধ শিক্ষার (cultureএর) মধ্যে ন্যূনাধিক সংযোগ ও সমন্বয়ের সম্ভাবনা রহিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাকে আবশ্যকমত ও যথাসম্ভব আত্মসাৎ করিয়া ভারতীয় শিক্ষার যে যুগোচিত নবাভ্যুদয় সংঘটিত হইবে, দেশের বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্রে তাহার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব। "শিক্ষাকেন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা ভারতীয় শিক্ষাপ্রচারের যোগ্য কেন্দ্রের কথা বলিয়াছি; ঐ শিক্ষাপ্রচারের বন্দোবস্ত বর্ত্তমানে কিরূপ করিয়া তোলা সম্ভব, তাহাই আগামীবারে আলোচ্য বিষয়।

দেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাপ্রচার

(উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩২০)

ভারতীয় শিক্ষা বা culture সম্বন্ধে গত পাঁচটী প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আধুনিক যুগে ঐ শিক্ষার পক্ষে নূতন আলম্বন ও অবলম্বন কি তাহা অষ্টম ("শিক্ষা") প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি। দশম ("শিক্ষাসংঘর্ষ") প্রবন্ধে ভারতীয় শিক্ষার অন্ধসংস্কারের সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম সংঘর্ষ কিরূপ তাহা দেখিয়াছি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে যে কেন ভারতীয় শিক্ষাকে প্রকৃতভাবে চেনা অসম্ভব, তাহা উভয় শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্ভবস্থান ও গতির পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া আমরা বুঝিয়াছি। উক্ত পার্থক্যসত্ত্বেও ভারতীয় শিক্ষা কি ভাবে আপনার সহিত পাশ্চাত্য শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয় রক্ষা করিতে পারে, তাহা একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যক ("শিক্ষাসমন্বয়") প্রবন্ধদ্বয়ে দেখিয়াছি, এবং নবম ("শিক্ষাকেন্দ্র") প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতীয় শিক্ষা পরমার্থমূলক ও পরমার্থপর, অতএব দেশে যাহা পরমার্থ-সাধনার সমন্বয়কেন্দ্র তাহাই ভারতীয় শিক্ষাপ্রচারেরও প্রকৃত কেন্দ্র। এখন আমাদের আলোচ্য এই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কিরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ভারতীয় শিক্ষার পুনঃপ্রচার ও পুনরভ্যুদয় হইতে পারে।

বিষয় বড় সহজ নহে,—কেন না, দেশের "আট-ঘাট" সমস্ত পাশ্চাত্য শিক্ষার আয়ত্তে। সে কেমন, তাহা প্রথমেই পরিস্ফুট করা দরকার।

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শিক্ষাপ্রচার।

কোনও শিক্ষা বা cultureএর প্রতিষ্ঠার প্রধান পথ—অধ্যাপনা, সে অধ্যাপনা আশ্রমেই হউক, বা টোলেই হউক, বা স্কুলেই হউক। প্রতিষ্ঠালাভের এই প্রধান পথটা ভারতীয় শিক্ষার পক্ষে বর্ত্তমানে একরূপ বন্ধ। কারণ স্কুলে ছাত্রসমাগম হওয়াই আজকালকার চাল এবং সেই স্কুলে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই নিয়ন্ত্রত্ব; সরকার বাহাদুর পাশ্চাত্য শিক্ষাই ভাল বুঝেন এবং দেশের স্কুলকলেজে সে শিক্ষার প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। এ অবস্থায় ভারতীয় শিক্ষাকে দেশের স্কুল-কলেজে কে শ্রেষ্ঠ আসন দিবে!

পাশ্চাত্য শিক্ষার সম্মুখে প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিলেও ভারতীয় শিক্ষাকে যে দেশের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যায় না, তাহা নহে। পাশ্চাত্য শিক্ষার অঙ্গীভূত বিদ্যাদির অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিলেই যে পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই ঐরূপ শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। আজকালকার স্কুল-কলেজে পাঠ করার অর্থ কতকগুলি বিবিধ বিষয়ের তথ্য বা information মনের মধ্যে বোঝাই করা; কিন্তু ঐ তথ্যগুলি কি ভাবে ছাত্রদের চিন্তা, সাধনা, ও আদর্শের গতি নির্ণয় করে, কি ভাবে জড় ও জীবের প্রতি দৃষ্টি গড়িয়া দেয়, ইহার সম্যক্ তত্ত্বাবধান করাই কোনও শিক্ষা বা cultureএর কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য বিদ্যাদির অনুশীলনে ছাত্রগণ যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে, তাহাদের উপর ঐরূপ তত্ত্বাবধান করিবার ভার যদি কোনও উপায়ে ভারতীয় শিক্ষার উপর সংন্যস্ত করা যায়, তবে আজকালকার স্কুলকলেজের মধ্যেও ভারতীয় শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া সম্ভব হয়। এরূপ একটা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার উপায় কি?

যদি বল, সে উপায়—সরকারী কর্ত্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে স্কুল-কলেজ স্থাপন করা, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—আমাদের সমাজের কি এখনও সেরূপ কর্ত্তৃত্বশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে? সমাজ ত এখনও আপনাকে আপনি চিনে না,—আপনার চিরন্তন প্রতিষ্ঠাভূমি, আপনার প্রকৃতি ও গতি, আপনার আদর্শ, সমাজ এখনও উপলব্ধি করে নাই; সমাজের সর্ব্বাঙ্গে এখনও আত্মবিস্মৃতির পঙ্গুত্ব রহিয়াছে। অতএব তথাকথিত স্বকর্ত্তৃত্বের সম্পূর্ণ প্রয়োগে দেশে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে পারিলেও, দেশের লোক প্রথমতঃ ভারতীয় শিক্ষা প্রচার করিবার সামর্থ্য এখনও লাভ করে নাই; কেন না, ভারতীয় শাস্ত্রাদি বা বিদ্যাদির অধ্যাপনা করাইলেই যে ভারতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা নহে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের লোক স্বকর্ত্তৃত্বাধীনে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিলেও, উহারা তল্লব্ধ বিদ্যাকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজ হইতে লব্ধ বিদ্যার মত অর্থকরী করিতে পারিবে না। নানা অর্থকরী বিদ্যায় যাহারা পাত্রতা বা যোগ্যতা লাভ করে, দেশের লোক এখনও সরকারী "ডিপ্লোমা" বা ছাপ না দেখিলে তাহাদিগের সে যোগ্যতা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারে না। এই ত অবস্থা।

অর্থকরী বিদ্যার জন্য এখনও আমাদের প্রধানতঃ সরকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়েরই দ্বারস্থ হইতে হইবে। ধরিয়া লইতে হইবে যে দেশের সাধারণ লোক অর্থকরী বিদ্যারই প্রার্থী। অতএব বে-সরকারী স্কুলকলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিতে পারিলেই যে দেশের ছাত্রদের ভারতীয় শিক্ষার আয়ত্তাধীনে আনিয়া ফেলা যায়, ইহা অর্ব্বাচীনের জল্পনা। এখনও ভারতীয় ছাত্র বলিতে সাধারণতঃ

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বুঝিতে হইবে, এবং আমাদের সমস্যা এই যে এই ভারতীয় ছাত্রের বিদ্যানুশীলনকে ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে কিরূপে সম্পূর্ণ প্রভাবান্বিত করা যায়।

এ সমস্যার মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে যে ছাত্রজীবন গঠন করিবার ভার কাহার উপর অর্পিত। সহজেই বুঝা যায় যে সে ভার,—স্কুলে শিক্ষক, গৃহে গুরুজন এবং সর্ব্বত্রই সঙ্গ,—এই তিনের উপর প্রধানতঃ অর্পিত রহিয়াছে। যে বয়সে ছাত্রদিগের জীবন বিশেষ কোনও আদর্শে গড়িয়া দেওয়া অধিক সুবিধা ও সুযোগ, সে বয়সে তাহারা উক্ত তিনটী দিক্ দিয়াই যে সকল ব্যক্তির প্রভাবও সংস্পর্শে আসে, তাঁহারা আমাদের সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই সকল ব্যক্তিকে ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারিলে যখন ছাত্রদিগকেও সেই প্রভাবে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব হয়, তখন আমাদের সমস্যা এই দাঁড়াইল যে সমাজের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার কিরূপে সর্ব্বাঙ্গীন সঞ্চার সংঘটিত করা যায়।

শিক্ষাসমস্যার প্রকৃত অর্থ কি, এতক্ষণে আমরা বুঝিলাম। আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যা ছাত্রদের লইয়া নহে, সমাজ লইয়া। সমাজে যদি ভারতীয় শিক্ষা বা cultureএর প্রচার থাকে, তবে দেশের ছাত্রদল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্য বিদ্যার অনুশীলন করিতে যাইলেও কোনও আশঙ্কার কারণ নাই, কিন্তু সমাজে যদি ভারতীয় শিক্ষার প্রচার না হয়, তবে দেশের ছাত্রদিগকে জাতীয় বা বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরিয়া ভারতীয় শাস্ত্রাদি পড়াইলেও, ভারতীয় শিক্ষার প্রচার হইবে না। শিক্ষাসমস্যার মীমাংসা খুঁজিতে

আমরা যে দেশের ছাত্রদল লইয়া টানাটানি বা কাড়াকাড়ি করি, ইহাতেই আমাদের অল্পদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। আপাততঃ ধরিয়া লইতে হইবে যে ছাত্রসাধারণকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েরই আশ্রয় লইতে হইবে,—সাধারণ ছাত্র অর্থকরী বিদ্যারই প্রার্থী,—কিন্তু তথাপি তাহার বিদ্যানুশীলনের মূলে ভারতীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে হইলে যে সমাজকক্ষে তাহাকে ছাত্রজীবন যাপন করিতে হয়, সেখানে ভারতীয় শিক্ষার আসন বিছাইতে হইবে। ভারতীয় শিক্ষার প্রচারে যাহারা উদ্যোগী হইবেন, তাঁহাদের সম্মুখে ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয় হইতে বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্রয়ে ছাত্রদিগকে আনয়ন করাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য নহে।

আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্যা যে সমাজকে লইয়া, ছাত্রদিগকে লইয়া নহে, এ কথা প্রথমেই বলিয়া রাখিবার একটী গূঢ় তৎপর্য্য আছে। আধুনিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে বিদ্যাদান করিবার সময় তাহাদিগকে পরীক্ষার্থী তৈয়ারী করিবার ভাবই আমাদের মনে জাগরূক থাকে, তাহাদের ভিতর দিয়া আমরা যে একটা সমাজকে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিতেছি, এ কথা বা এ ভাব মনে থাকে না। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, অর্থবিনিময়ে ছাত্রদিগকে সেই পরীক্ষা উত্তীর্ণ করাইয়া দেওয়ার নামই আধুনিক শিক্ষকতা। আধুনিক শিক্ষকতার মর্য্যাদা কি? আধুনিক শিক্ষক মহাশয় একটা জাতির, একটা সমাজের শিক্ষক নহেন, আরও দশ রকম বৃত্তিধারীর মত তিনি একজন বৃত্তি-ধারী। প্রথমেই বলিয়া রাখি, এরূপ শিক্ষক ভারতীয় শিক্ষার

প্রচারক হইতে পারে না। সমাজকে শিক্ষা দিবার মর্য্যাদা যাঁহার আছে, তিনিই ভারতীয় শিক্ষার প্রচারক হইতে পারেন। আমাদের দেশে সে মর্য্যাদা বড় সামান্য মর্য্যাদা নহে।

আর এক কথা,—বিদ্যাদান ও শিক্ষাদানের মধ্যে আমরা একটা প্রভেদের ইঙ্গিত করিতেছি। আজকালকার স্কুলে যেমন ভাষা শিখান হয় এবং নানা বিষয়ের তথ্য বুঝাইয়া মস্তিষ্কের একরূপ উৎকর্ষ করিয়া দেওয়া হয় তাহাকেই বিদ্যাদান বলিতেছি, এবং বিশেষ রকম আদর্শে সমঝদার মানুষ গড়িয়া দেওয়াকে শিক্ষাদান বলিতেছি। বিদ্যা (learning) ও শিক্ষা (culture) সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রভেদ আপাততঃ বুঝিয়া রাখা দরকার। আমরা এ পর্য্যন্ত যতরকম শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহাতে বিদ্যাদানই লক্ষ্য করা হইয়াছে, শিক্ষাদান লক্ষ্য করা হয় নাই। অবশ্য বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্রদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও আজকাল করিতেছেন, যথা আর্য্যসমাজ বা আদিব্রাহ্মসমাজ। কিন্তু সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ বা সুসমন্বিত ভারতীয় শিক্ষা নয়, তাহাতে আধুনিক যুগের ধর্ম্মসংস্কারের একদেশদর্শিতা ও প্রতিবাদপরায়ণতা অত্যধিক নিহিত রহিয়াছে। যে সমন্বয়দৃষ্টি না থাকিলে ভারতীয় শিক্ষা ও ইতিহাসের সর্ব্বাঙ্গীন মর্য্যাদা ও মর্ম্মগ্রহণ করা অসম্ভব, সে সমন্বয়দৃষ্টি আধুনিক সংস্কারকগণ লাভ করিতে পারেন নাই, ফলে তাঁহারা একটা সাম্প্রদায়িক মতামতের ছাঁকনি দিয়া ভারতের পুরাণ, ইতিহাস হইতে তাঁহাদের উপাদেয় ভাবগুলি ছাঁকিয়া ছাঁকিয়া গ্রহণ করেন। ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই, পুরাকাল হইতেই ভারতের বিশেষ

বিশেষ সম্প্রদায়ে ঐরূপ ব্যাপার আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। ভারতীয় পরমার্থসাধনা ও শিক্ষার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বরাবরই ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। কেবল আধুনিক যুগে আমাদের একটা অমূল্য ও অতুলনীয় লাভ এই ঘটিয়াছে যে ভারতীয় সাধনা, ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় ইতিহাসের একটা অখণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য যোগ্য সমন্বয়দৃষ্টি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। এ সমন্বয়দৃষ্টি মস্তিষ্কালোড়নের দ্বারা উদ্ভাবিত নহে, ভারতীয় সনাতন আদর্শে মনুষ্যত্বের বিশেষ সুপরিণামের সুফলরূপে এ দৃষ্টিকে আমরা উদ্ভাসিত হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি যে এই সমন্বয়দৃষ্টির বিকাশ ও প্রয়োগের ফলে সমগ্র দেশের সম্মুখে সমন্বয়ের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। যতদিন ব্যক্তিগত রুচি, ভাব ও সংস্কারজনিত বিচারভঙ্গী ভিন্ন ভিন্ন রকম থাকিবে ততদিন ভিন্ন ভিন্ন রকমের সাম্প্রদায়িক শিক্ষা, তত্ত্বদৃষ্টি, ও সাধনা দেশে প্রবর্ত্তিত থাকিবে; কিন্তু যে সাম্প্রদায়িকতা সত্যকে একচেটিয়া-মালের মত নিজের গণ্ডীতে বন্দী করিতে চায়, সে সাম্প্রদায়িকতার যুগ চলিয়া গিয়াছে। এখন লোকে বলিতে শিখিতেছে যে আমার ভাব আমার পক্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ও সত্য, যদি সে ভাব আর কাহারও পক্ষে সেইরূপ ভাল ও সত্য হয়, তবে সে সন্ধানও রাখিব, কারণ সমবেত ভাবসাধনার অনেক সুফল আছে। আজকালকার সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এইরূপ একটা সুভাব দেখা দিতেছে। এ যুগের আসরে সাম্প্রদায়িকতার আস্ফালন মানায় না, পসার পায় না। লোকে সত্যের বিচিত্র সাজসজ্জা, বিচিত্র গতি, বিচিত্র বিকাশ দেখিতে পাইতেছে, সেই জন্য গোঁড়ামির

হঠকারিতা নরম হইয়া আসিতেছে। যখন হিন্দুর তথাকথিত পৌত্তলিকতা ভাঙ্গিবার জন্য ধর্ম্মসংস্কারকগণ তুমুল আন্দোলনে নানা "সমাজ" গড়িতে লাগিল, সে একদিন গিয়াছে। তখন হিন্দুর সেই পৌত্তলিকতার স্পর্শ হইতে সত্যকে বাঁচাইয়া এক একটা "সমাজে" নজরবন্দী করিয়া রাখিবার কি বিষম উৎসাহ! তারপর পূজারী ব্রাহ্মণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভিতরে হিন্দুর "পৌত্তলিকতায়" মাখামাখি হইয়া যেদিন হইতে সত্যের এক উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে, সেইদিন হইতে বিষম সন্দেহ উঠিয়াছে যে হিন্দুর "পৌত্তলিকতা" বাস্তবিকই পৌত্তলিকতা কি না ; এমন কি আজ-কাল "পৌত্তলিকতা" কথাটাই উঠিয়া যাইবার মত হইয়া পড়িয়াছে। এ যুগে সত্যের নানারকম মূর্ত্তি মানুষের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সেই জন্য সাম্প্রদায়িকতা বলিতে যে সঙ্কীর্ণতা সূচিত হয়, সে সঙ্কীর্ণতা চারিদিকেই অন্তরালে সরিয়া পড়িতেছে এবং দেশের মধ্যে একটা সমন্বয়ের আসর গড়িয়া উঠিতেছে। এই সমন্বয়ের যুগে একটা উদার সমন্বয়দৃষ্টি ভারতীয় শিক্ষার মেরুদণ্ডরূপে পরিগণিত হইবে ; সেইজন্য বিশেষ কোনও ধর্ম্মসংস্কারকসম্প্রদায়ের শিক্ষাকে আমরা ভারতীয় শিক্ষা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি না।

বিদ্যাদান ও শিক্ষাদানের প্রভেদ আমরা উল্লেখ করিয়াছি। বিদ্যা (learning) লাভ করিলেই যে শিক্ষাও (culture) লাভ করা হইল, তাহা নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত আজকাল ভারতীয় বিদ্যা (learning) আয়ত্ত করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারা কি ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছেন ?—ভারতের জীবনাদর্শ তাঁহারা কি আয়ত্ত করিতেছেন ?—ভারতীয় বিদ্যায় বিদ্বান হইলেই কি

ভারতের আদর্শপুরুষরূপে গণ্য হওয়া যায়? বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যত্বের সে বিশেষ পরিণাম স্বভাবতঃ সম্পন্ন হয় কৈ? এই জন্য বিদ্যা ও শিক্ষার মধ্যে একটা প্রভেদ স্বীকার করিতে হয়, এবং ইহা স্পষ্টই বলিয়া রাখিতে হয় যে, আমরা আমাদের সমাজে ভারতীয় শিক্ষার প্রচার করাকেই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া গণ্য করি।

এখন প্রশ্ন এই যে, প্রস্তাবিত হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় আমাদের সমাজে ভারতীয় শিক্ষা প্রচার করিবার পক্ষে উপযোগী হইবে কি না। প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা, সেই শিক্ষার প্রণালী ও সেই শিক্ষার শিক্ষক,—এই তিনের সংযোগ যদি হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে, তবে নিশ্চয়ই উহা ভারতীয় শিক্ষার প্রচারে কৃতকার্য্য হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃত ভারতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে। সে শিক্ষার মূলে ভারতের চিরন্তন, সার্ব্বজনীন লক্ষ্য নিহিত রহিয়াছে —পরমার্থের সাধনা, সংরক্ষণ ও প্রচার। সে শিক্ষা আপনার গৌরবে আপনি প্রতিষ্ঠিত, আপনার বিজ্ঞানালোকে জগতের যাবতীয় শিক্ষাকে বিচার করে এবং তাহাদের মধ্যে আপনার পক্ষে যাহা উপাদেয় তাহা গ্রহণ করে। সে শিক্ষা জড় ও জীবের সহিত সর্ব্ববিধ ব্যবহারে বিশেষ তত্ত্বদৃষ্টি ও সাধনসামর্থ্যের সঞ্চার করিয়া দেয়। মানুষের যে জীবনাদর্শ ভারতের পক্ষে সনাতন, সে শিক্ষার্থীর জীবনে তাহাই প্রতিষ্ঠিত করে। সে শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের নিকট হইতে শুধু বিদ্যা গ্রহণ করিতে হয় না, শিক্ষাও গ্রহণ করিতে হয়; অতএব সে শিক্ষাপ্রণালীর অনুসারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন বিশেষ ঘনিষ্ঠ সংযোগে সংযুক্ত হওয়া চাই,—সে সংযোগ শুধু দৈনিক পাঠের অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় পর্য্যবসিত নহে, সে সংযোগ চিন্তা ও

সাধনার সূত্রে ছাত্রজীবনকে সর্ব্বদা শিক্ষকের জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে। তৃতীয়তঃ, ভারতীয় শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষক সংগ্রহ করা চাই। সে শিক্ষক সমাজের শিক্ষক হইবেন,—সমাজের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে তাঁহার জীবন উৎসর্গীকৃত। তিনি পরমার্থেরও সাধক ; কেন না, ভারতীয় শিক্ষার আদি, মধ্য ও অন্তে পরমার্থরূপ প্রয়োজন নিহিত রহিয়াছে। তিনি প্রত্যক্ষবাদী,—সমাজে যে শিক্ষা ও পরমার্থসাধনার উৎস নিহিত রহিয়াছে তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,—অতীতের জল্পনাকল্পনা দ্বারা মস্তিষ্কোদ্ভূত আবেগ ও শক্তি লইয়া সমাজকে শিক্ষা দিতে তিনি দণ্ডায়মান হন নাই ; কেন না, শুধু অতীতের নজীর দেখাইয়া ভাঙ্গা সমাজকে গড়িয়া তোলা যায় না,—সে অতীত যদি বাঁচিবার ও বাঁচাইবার মত হয়, তবে ভাঙ্গা-সমাজ গড়িয়া তুলিবার উপযুক্ত সময়ে তন্নিহিত শিক্ষা ও পরমার্থসাধনার উৎস আবার লোকসমক্ষে প্রত্যক্ষীভূত হইবে। সে উৎস, সে শক্তিভাণ্ডার, যাঁহার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, যিনি সে শক্তিভাণ্ডারের সহিত আধ্যাত্মিক সংযোগে সংযুক্ত, তিনিই কেবল বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় সমাজের শিক্ষক-পদবী লাভ করিতে পারেন। আমরা "শিক্ষাকেন্দ্র" শীর্ষক নবম প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

যে শক্তিতে ছাত্রকে বিদ্যাদান করা যায়, সে এক রকম ; আর যে শক্তিতে সমাজকে শিক্ষাদান করা যায়, সে আর এক রকম। তুমি যদি ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ প্রখর বুদ্ধিতে বুঝিয়া ফেলিয়া থাক, বেশ কথা. তোমার দ্বারা সে আদর্শ একরকমে লোককে বুঝানই চলিতে পারে, কিন্তু তুমি যদি শিক্ষক হইয়া সে

আদর্শে জীবন গড়িয়া দিতে যাও, তবে পদে পদে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িবে। শ্রেষ্ঠ মতামতের দ্বারা, মস্তিষ্কে শ্রেষ্ঠ আদর্শপোষণের দ্বারা, মানুষের জীবন গড়িয়া দেওয়া যায় না; বুদ্ধির আলোকে সমাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শে জীবন গড়িয়া দেওয়া যায় না। শ্রেষ্ঠ-জীবনের আলোকে সমাজে জীবন গড়িতে হয়; গড়া-মানুষের প্রত্যক্ষশক্তিতে মানুষ গড়া যায়। মানুষ গড়িবার শক্তি মাথা হইতে আসে না। সমাজকে ভারতীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা মানে, মানুষকে ভারতের শিক্ষা দ্বারা গড়িয়া তোলা। কিন্তু সে শিক্ষা যদি শত শত শিক্ষকেরও মস্তিষ্কগত শিক্ষা (culture) হয়, তবে সে শিক্ষায় সমাজ গড়িবে না। সমাজে, মানুষের জীবনে, সে শিক্ষার মূর্ত্তিপরিগ্রহ করা চাই। ভারতীয় শিক্ষা ও পরমার্থসাধনা যদি মানুষের জীবনে মূর্ত্তি ধরিয়া আমাদের সমাজে আজ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তবেই সমাজের আশা আছে, তবেই সমাজ আবার গড়িয়া উঠিবে,—নচেৎ নহে। বর্ত্তমানে সেই আত্মপ্রকাশকে আমাদের সকল চেষ্টা, সকল উদ্যোগের কেন্দ্রস্থানীয় করিতে হইবে, তবেই চেষ্টা ও উদ্যোগ সফল হইবে। নচেৎ শুধু সূক্ষ্মবুদ্ধির সমঝদারী লইয়া শিক্ষাপ্রচার করা যায় না।

অতএব শিক্ষাপ্রচারের যথার্থ কেন্দ্র চাই। সেই কেন্দ্র পরমার্থ-সাধনার কেন্দ্র। এ যুগে ভারতীয় শিক্ষার যদি পুনরভ্যুদয় ঘটে, তবে বৌদ্ধযুগের মত উহাকে নবোদ্ভাসিত পরমার্থদৃষ্টিরূপ ভিত্তি লাভ করিতে হইবে। সেইজন্য আমরা নবম ("শিক্ষাকেন্দ্র") প্রবন্ধে বলিয়াছি—"ভারতীয় শিক্ষার ইহাই একটী মৌলিক রহস্য; বর্ত্তমান যুগে শিক্ষাসমস্যা লইয়া যাহাদের মস্তিষ্ক আলোড়িত, তাহাদিগকে

ভাল করিয়া এই রহস্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতে বলি। যদি আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা বা cultureকে পুনর্ব্বার আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া সর্ব্বসংহত ও সুসমন্বিত করিতে হয়, তবে পরমার্থসাধনার পুনরভ্যুদয়কে সর্ব্বাগ্রে উহার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। যাহাকে 'জাতীয় শিক্ষা' নাম দিয়া আমরা উচ্চ কলরব করিতেছি, সে শিক্ষার 'জাতীয়ত্ব' এই রহস্যের মধ্যে নিহত।"

বর্ত্তমান যুগে ভারতে যে পরমার্থসাধনার উপযুক্ত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা "ভারতের সাধনা"য় "ধর্ম্মজীবন" ও "সন্ন্যাস" শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি। সে কেন্দ্র সাম্প্রদায়িক নহে; কেন না, সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমত ও সাধনপথ সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সাধনলীলাসূত্রে সমন্বিত হইয়া রহিয়াছে; সে কেন্দ্রে ভারতের পরমার্থসাধনা ও শিক্ষা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিদ্যমান; কেন না, সেখানে বেদবেদান্ততন্ত্রের সার্থকতা ও সত্যতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনপটে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং যে শক্তি ও পরমার্থদৃষ্টি লাভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় শিক্ষার আচার্য্যপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, সেই শক্তি ও পরমার্থদৃষ্টির উৎস সে কেন্দ্রে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে যাঁহাদের জীবন উৎসর্গীকৃত, তাঁহাদিগকে এই কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা প্রাচীন বিদ্যাদির পঠনপাঠন, প্রাচীন বিদ্যাদির গৌরবঘোষণা প্রভৃতির ধূমধাম পড়িয়া গেলেও ভারতীয় শিক্ষার পুনরভ্যুদয় (re-organisation) ঘটিয়া উঠা অসম্ভব।

ভারতীয় সমাজের শিক্ষক সংসারের আবহাওয়ায় গড়ে না। সংসারের চাকায় ঘুরপাক খাইতে খাইতে লক্ষ্যনিষ্ঠা ও লক্ষ্যসাধন-

সামর্থ্য বজায় থাকে না; সেইজন্য ভারতীয় শিক্ষার পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রচার রূপ সুমহৎ লক্ষ্যের সাধক হইতে হইলে, সেই লক্ষ্যের কাছে সমস্ত জীবনটাকে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে দু'নৌকায় পা রাখা চলে না। ভারতীয় শিক্ষা বা cultureকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা কি সহজ ব্যাপার? সেই বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ভারতে যে ইতিহাস রচনা করা হইয়াছে, ইহা সম্যক্ রূপে বুঝা কি সামান্য ব্যাপার? আমরা যে বেদ দেখিতে পাই, ইহা কি, ইহার মধ্যে সে যুগের চিন্তা ও সাধনা কতটা প্রতিবিম্বিত, কতটা বা ইঙ্গিত মাত্র হইয়া রহিয়াছে, সে চিন্তা ও সাধনার প্রকৃতি কিরূপ, বেদোক্ত মন্ত্রাদির সাধনায় কিরূপ সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, বেদভিত্তি হইতে কিরূপে কোন্ বিদ্যার উদ্ভব হইল, কিরূপেই বা একটা শিক্ষা বা cultureএর উদ্ভব হইয়াছিল, বৈদিক যুগের জীবনাদর্শ নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপে যুগের পর যুগ যুঝিয়া আসিতেছে, বৈদিক সমাজ কিরূপে নানা বিপ্লবের মধ্য দিয়া রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে, বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড পরিবর্ত্তন ও সংস্কারের মধ্য দিয়া কিরূপে আধুনিক কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইয়াছে,—এইরূপ নানা বিষয় যেমন এক দিকে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে, অপরদিকে প্রাচীন বিদ্যাদির অনুশীলনে আবার পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের উৎকর্ষসাধনে পৌছিতে হইবে, এবং পূর্ব্বপ্রবন্ধোক্ত প্রণালীতে আধুনিক জগতের শিল্প-বিজ্ঞানাদির সহিত উহাদের সংযোগ সাধন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রাদির ও বিদ্যাদির রহস্যোদ্ঘাটনের চাবি পরমার্থসাধনার হাতে, অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে সাধনারও উন্নত

হইতে হইবে। সেইজন্য বলিতেছিলাম, ভারতীয় শিক্ষার পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সামান্য ব্যাপার নহে।

দুঃখের বিষয়, স্বামী বিবেকানন্দ বেদবিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা দ্বারা যখন এই বৃহৎ ব্যাপারটীর সূচনা করিতে সংকল্প করিতেছিলেন, সেই সময় কালের কি দুরধিগম্য ইঙ্গিতে তিনি দেহ সংবরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সঙ্কল্প এখনও আমাদের প্রাণের মধ্যে প্রেরণার আকারে বিদ্যমান, এখনও দেশের লোক যদি ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে স্বামীজীপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবে ঐ বৃহৎ ব্যাপারটীর সূচনা করা যাইতে পারে। পরমার্থসাধনার কেন্দ্র তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, এখন সেই কেন্দ্র হইতে এমন একটী আশ্রমের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যেখানে পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান ও অনুশীলনে যাহারা যথাযোগ্যভাবে ব্রতী হইবেন, তাহাদিগকে একত্র করা যায়। পরে এই আশ্রম হইতে ভারতীয় শিক্ষার শিক্ষক সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িবেন এবং নানাস্থানে শাখাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া চিন্তা ও সাধনার স্থানীয় ধারাগুলিকে উপযুক্তভাবে ভারতীয় শিক্ষা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবেন। এই সকল শিক্ষকদের সাহায্যে দেশের ছাত্রগণ একদিকে অর্থকরী বিদ্যালাভে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত থাকিলেও ভারতীয় শিক্ষারূপ প্রতিষ্ঠাভূমির উপর দাঁড়াইতে পারিবে এবং নিজের "কোর্টে" দাঁড়াইয়া বৈদেশিক বিদ্যাদির অনুশীলন করিতে সমর্থ হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান যে চলিতেছে না, তাহা নহে; কিন্তু ভাব ঠিক নাই। মনে কর,

একজন সাহেব বিলাত হইতে আমাদের দেশের গার্হস্থ্যজীবন বুঝিয়া দেখিবার জন্য আসিয়াছে; সে যদি আপনার ভাবে কোনও গৃহস্থের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া যায়, তবে কি তাহার কৃতকার্য্য হইবার আশা আছে? গার্হস্থ্যজীবনের নানা কার্য্যকলাপের ভিতর কিরূপে, কোন্ পথ দিয়া, হিন্দুর বুদ্ধি ও চিত্ত তৃপ্তিলাভ করিতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে সেই বুদ্ধি ও চিত্তের ভাবে আপনার বুদ্ধি ও চিত্তকে ভাবান্তরিত করিতে হয়। সেইজন্য বলি যে, ভাব ঠিক-ঠিক হওয়া চাই। আজকাল যাঁহারা আমাদের দেশে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ভাব এখনও ঠিক হয় নাই; সেইজন্য রাশি রাশি নূতন তথ্য সংগৃহীত হইলেও প্রাচীন ভারতের প্রাণটার সঙ্গে বোঝাপড়া আরম্ভ হয় নাই;—পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে একটা সমষ্টিমন কোন্ সময় কিরূপে কোন্ পথ দিয়া আত্মতৃপ্তি খুঁজিতেছে, কখন্ সফল হইতেছে, কখন্ বা বিফল হইতেছে,—সে মনের প্রকৃত পরিচয় কি, কি ছাঁদে সে গড়া, কোন্ যুগে সে কি রকম গতি লাভ করিয়া আপনার লক্ষ্য খুঁজিতেছে,—এ সমস্ত বুঝিতে গেলে ভাব ঠিক থাকা চাই। আমাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টি এখনও পাশ্চাত্যভাবভাবিত; সেই জন্য দেখিতে পাই যে, আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন কোনও ঘটনার ঠিক ঠিক মূল্য ও স্থান নিরূপণ করিতে সাধারণতঃ ভুল করিয়া বসি।* পাশ্চাত্যদেশে মানুষের যেমন অভিজ্ঞতা যুগে যুগে সঞ্চিত হইয়াছে, সেইরূপ অভিজ্ঞতার আলোকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি গড়িয়া

* ১৩১৯ সালের 'ভাদ্র' ও 'কার্ত্তিক'-সংখ্যা "উদ্বোধনে" প্রকাশিত "গৌড়-রাজমালা" ও "জাতিভেদ" নামক পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

উঠিয়াছে। সেরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টি আমাদের দেশের উপর প্রয়োগ করিলে চলিবে কেন?

এই সব কারণে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় ইতিহাস বুঝিবার যেরূপ পথ ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগকে অবিলম্বে সেই পথে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। দেশের লোক যে ভারতীয় শিক্ষাকে শ্রদ্ধা ও মর্য্যাদা দিতে আরম্ভ করিতেছে, তাহা একরূপ নিশ্চিত; কেন না, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' বা 'হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়' প্রভৃতির নামে আন্দোলন চালাইলে লোকে আজকাল অর্থদান করিতে রাজি হয়, দেখা যাইতেছে। আর এ সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই অর্থ ও ত্যাগশীল কর্ম্মীর সমাগম প্রথমেই দরকার পড়ে। আবার ঠিক-ঠিক কর্ম্মী পাওয়া গেলে অর্থের জন্যও ভাবিতে হয় না। সেইজন্য স্বামীজী মান্দ্রাজে প্রদত্ত কোনও বক্তৃতায় যখন ভারতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে নানাস্থানে কেন্দ্রাদি গঠনের কথা উল্লেখ করিতেছেন, তখন বলিতেছেন—

"Then the work will extend through these bands of teachers and preachers, and gradually we shall have similar temples in other centres, until we have covered the whole of India. That is my plan. It may appear gigantic, but it is much needed. You may ask, where is the money? Money is not needed. Money is nothing. For the last twelve years of my life, I did not know where the next meal would come from; but money and everything else I want must come,

because they are my slaves, and not I theirs; money and everything else must come. Must—that is the word. Where are the men? That is the question."

ভাবার্থ:—এই সকল আচার্য্য ও প্রচারকগণের চেষ্টায় যেমন কার্য্য বিস্তৃত হইতে থাকিবে, অমনি এইরূপ আচার্য্য ও প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িতে থাকিবে; ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানে এইরূপ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিবে—যতদিন না উহারা সমগ্র ভারত ছাইয়া ফেলে। ইহাই আমার কার্য্যপ্রণালী। অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ইহা চাইই চাই। তোমরা বলিতে পার, টাকা কোথায়? টাকার প্রয়োজন নাই, টাকায় কি হইবে? গত বার বৎসর ধরিয়া আমার কাল কি খাইব তাহার ঠিক ছিল না, কিন্তু আমি জানিতাম অর্থ এবং আমার যাহা কিছু আবশ্যক সে সব আসিবেই আসিবে; কারণ অর্থাদি আমার দাস, আমি তাহাদের দাস নহি। আমি বলিতেছি, নিশ্চিত আসিবে। জিজ্ঞাসা করি, লোক কোথায়?—উহাই প্রশ্ন।"

প্রবন্ধাবসানে আমরাও সেই প্রশ্ন দেশের যুবকবৃন্দকে জিজ্ঞাসা করি,—প্রকৃত কর্ম্মী কই? যাহারা ভারতীয় শিক্ষার পুনরভ্যুদয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইবেন, তাহারা কই আজও সমবেত হন নাই,—নচেৎ কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত!

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শেষ কথা।

(উদ্বোধন—কার্ত্তিক, ১৩২১)

যে সাধনা লইয়া ভারতের জন্ম ও জীবন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য তেরটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এইবার শেষ কথা।

প্রথম প্রবন্ধে আমরা 'নেশন'-শব্দের আলোচনা করিয়াছি। নেশন অর্থে যদি এমন একটী জনসমষ্টি বুঝায়, যাহারা একটী লক্ষ্যের সাধনোদ্দেশ্যে সমষ্টিবদ্ধ, যাহাদের সমষ্টি-জীবনের সকল অঙ্গ সেই লক্ষ্যসাধনার দ্বারা অভিব্যক্ত, সংযোজিত ও জীবিত, এবং যাহাদের সমষ্টিজীবনে অঙ্গ ও অঙ্গীর এই পারম্পর্য্যবিধানের জন্য উপযুক্ত নিয়ন্তৃশক্তি উদ্বোধিত ও প্রতিষ্ঠিত, তবে ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাইবে যে, সুদূর অতীতে একটী নেশন সগৌরবে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ পর্য্যন্ত নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে অদ্ভুত কৌশলে জীবনধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। নেশনের স্বরূপলক্ষণ আমরা যেরূপ বলিয়াছি, তাহা যদি সর্ব্ববাদিসম্মত হয়, তবে ভারতবর্ষে ঐরূপ একটী নেশনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। এ নেশনের আকারে ও প্রকৃতিতে পাশ্চাত্য নেশনদের সহিত যে এত বিভিন্নতা তাহার কারণ,—জীবনলক্ষ্যের বৈষম্য। পাশ্চাত্য নেশনের জীবনলক্ষ্য রাজনৈতিক, এ নেশনের জীবনলক্ষ্য পারমার্থিক,—পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার।

ভারতীয় লক্ষ্যের সাধকসমষ্টি নেশন-নামে অভিহিত হউক বা

না হউক, বিশেষ কিছু আসে যায় না। ঐ শব্দ যে প্রথমেই আমাদের আলোচনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, আজ কাল দেশের লোক পাশ্চাত্যদের অনুকরণে ঐনামটী নিজেদের উপর আরোপ করিতে পারিলে যেন গৌরবান্বিত হয়। সেইজন্য আমাদের জানা আবশ্যক যে, কি অর্থে ভারতেও নেশনের পত্তন বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। এখন পাশ্চাত্যের অনুকরণে আর নূতন করিয়া নেশন গড়া সম্ভব নহে।

বাকি দ্বাদশটী প্রবন্ধে ভারতের ইতিহাস, শিক্ষা ও সমাজকে অবলম্বন করিয়া কি ভাবে একই জীবনলক্ষ্য ভারতের সকল সাধনার চরমসাধ্য হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, সেই ইতিহাস, শিক্ষা ও সমাজকে ভবিষ্যতে কোন্ পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ প্রবন্ধে আমরা বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। বলিবার—বুঝাইবার—কথা অনেক বাকি আছে, অনেক রকমে সে কথা বহুদিন ধরিয়া বলিয়া যাইতে হইবে। তবে সে কথার সারাংশ "ভারতের সাধনা"য় ইঙ্গিত করা রহিল। এই সমস্ত ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া চিন্তাশীল পাঠক ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ভারতের সাধনার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে পরিচিত হইবেন।

ভারতের সেবা করিতে হইলে ভারতকে প্রকৃতভাবে চিনিতে হয়। ভারতকে না চিনিয়া ভারতের সেবা করিতে যাইয়া সেবার অভিমানে আমরা আজকাল খুবই স্ফীত হইয়া উঠিতেছি, কিন্তু সেবার প্রকৃত গৌরব ও কল্যাণ আমাদের ভাগ্যে জুটিতেছে না। ভারতের সাধনাকে এখনও আমরা আমাদের সাধনায় পরিণত

করি নাই,—আমরা বিদেশী ভাবের স্বদেশী করিয়াছি, এখনও স্বদেশী ভাবের স্বদেশীতে হাত দিই নাই।

ভারতের সাধনার খাঁটি সাধক যে কি বস্তু, তাহা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেখিয়াছি। আর অন্যত্র যাহা দেখিয়াছি, হয় তাহা ভারতের সাধনার অঙ্গহীন মূর্তি, না হয় আসলের সহিত পাশ্চাত্য নকলের বিমিশ্রণ। ভারতের সাধনা কি, তাহাই যখন অন্যত্র শুনিতে পাইলাম না, তখন সে সাধনার সাধক অন্যত্র কোথায় দেখিব?

ভারতবাসীকে ভারতের সাধনায় মাতাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগ অবতীর্ণ হইয়াছে। এ যুগ কি বিফল হইবে? আসর ও সরঞ্জাম দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। ভারতের আদর্শ ভারতের ইতিহাস না গড়িয়া যদি ভারতের মানুষ ভারতের ইতিহাস গড়িত, তবে বর্ত্তমান যুগ যে সফল হইবে, এ আশা পোষণ করিতে পারিতাম না। ভারতের আদর্শ যেন একটা রহস্যময় সজীব শক্তি; বারংবার ব্যক্ত পরিণতি লাভ করিয়া সে আদর্শ ভারতেতিহাসে একটা বাস্তব সত্তারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, আবশ্যক হইলেই মূর্ত্তিধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। "ভারতের সাধনা"য় তৃতীয় প্রবন্ধে * আমরা এই আশ্চর্য্য কৌশলের কথা আলোচনা করিয়াছি। পুরাণে যেমন শুনা যায় যে, কয়েকজন প্রাচীন মহাবীর বা মহাতপস্বী অমর হইয়া ভারতে আজও বিরাজমান আছেন,—যেমন তাঁহারা ভারতের পক্ষে অমর বা সতত বিদ্যমান,—সেইরূপ ভারতের আদর্শ অমর ও সতত-বিদ্যমান থাকিয়া যুগে যুগে ভারতের ইতিহাস গড়িতেছে।

* "ভারতীয় নেশনে বেদমহিমা ও অবতারবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

এ আদর্শ আত্মপ্রকাশের জন্য তোমার-আমার মস্তিষ্কালোড়নের উপর নির্ভর করে না, তাই রক্ষা।—নচেৎ বর্ত্তমান যুগের সফলতার কোন আশা পোষণ করিতে পারিতাম না।

আদিম বৈদিক যুগে ভারতের এই আদর্শ অমৃতত্ব নাম ধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সে যুগে যাহারা বৈদিক প্রবৃত্তিধর্ম্ম পালন করিত, তাহারাও দেবতাদিগের একটী পরমপদ * স্বীকার করিত। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অন্তরালে, উহারই প্রতিষ্ঠাভূমিরূপে, অমৃতত্ব-লাভের আদর্শ নিহিত ছিল; উহাই পরে জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্রূপ নাম ও আকার ধারণ করে। ভারতেতিহাসের ভিত্তি এই উপনিষদের মধ্যে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে এবং ঐ ভিত্তির উপরই ভারতের জীবনলীলা বিবর্ত্তিত হইয়াছে ও হইবে। এই ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের ধারা ও প্রকৃতি কিরূপ, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সে আচার্য্যবাণী "ভারতের সাধনা"য় তৃতীয় প্রবন্ধশীর্ষে উদ্ধৃত করিয়াছি;—"সকল তত্ত্বের সীমায় যে অখণ্ডৈকত্ব বিদ্যমান, কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না; বেদ এই শেষসীমায় উপনীত হইয়াছেন, ইহার পারে যাওয়া অসম্ভব। যখন 'তত্ত্বমসি' আবিষ্কৃত হইল, অধ্যাত্মতত্ত্ব তখন সম্পূর্ণতা লাভ করিল; এই পূর্ণতাই বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। এখন কেবল বাকি রহিল মানুষকে যুগে যুগে, দেশকালভেদে, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার তারতম্যে, বেদব্যক্ত লক্ষ্যের প্রতি নিয়ন্ত্রিত করা,

---

* "—যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি—"

ঋগ্বেদ ১০, ১৬৪।

সেই সনাতন পথে পরিচালিত করা ; এবং এই উদ্দেশ্যেই মহান্ নেতৃদিগের, মহিমান্বিত মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব।" *

এই উক্তি দ্বারা স্বামীজী ভারতীয় ইতিহাসরহস্যের চাবিটী আমাদের হাতে দিয়া গিয়াছেন। এই চাবিটী সাবধানে ব্যবহার করিলে ভারতের ইতিহাস জানা যায়,—বুঝা যায়, ভারতকে চেনা যায় ; নতুবা স্তূপীকৃত তথ্যরাশির মধ্যে পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ভারতকে,—ভারতের সাধনাকে চিনিতে পারিবে না। মুখ্যতঃ ভারতের ইতিহাসে দুইটী ভাগ ;—একটী আদর্শ-স্থাপনার ইতিহাস, আর একটী আদর্শ-প্রয়োগের ইতিহাস। যে সমস্ত প্রাচীন যুগে বেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আদর্শস্থাপনার ইতিহাস রচিত, তৎপরবর্ত্তী যুগসমূহ লইয়া আদর্শপ্রয়োগের ইতিহাস। আদর্শস্থাপনার ইতিহাসে প্রধান নায়ক ঋষি ; ঋষির চরিত্র, নেতৃত্ব, কীর্ত্তি জানিতে ও বুঝিতে পারিলেই ভারতেতিহাসের এই ভাগ জানা ও বুঝা হয়। আদর্শস্থাপনার ইতিহাসে ঋষি ব্যতীত আর যে সমস্ত মহাপুরুষ বা অবতারপুরুষের প্রসিদ্ধি আছে, তাঁহারা ঋষিনেতৃত্বের সহায়ক ; সেইজন্য তাঁহারা ধর্ম্মগুরুর বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই, প্রধানতঃ ক্ষত্রিয়বৃত্তিই অবলম্বন করিয়াছেন। নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল আসুরীয় দেশে (অর্ব্বাচীন আসিরিয়া)। সমরক্ষেত্র, উৎসব প্রভৃতিতে নানা পশুর আকৃতিতে দেহের শীর্ষদেশ সজ্জিত করার প্রথা সে দেশে খুব প্রচলিত ছিল ; সেইজন্য নৃসিংহমূর্ত্তিতে ঐশীশক্তির আবির্ভাব সম্পূর্ণ দেশোপযোগী হইয়াছিল। সেকালের ভারতের সহিত আসিরিয়াপ্রমুখ দেশের ঘনিষ্ট সংস্রব ছিল।

* "The sages of India" নামক বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত।

সে সব দেশে ঋষিদের প্রভাবও অনেক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সেই প্রভাব রক্ষা করিবার জন্য এবং অসুরপ্রভাবের আশঙ্কা ভারত হইতে অপনীত করিবার জন্য নৃসিংহাবতারের আবির্ভাব। বামনাবতারের উদ্দেশ্যও ঐরূপ। ভৃগুবংশীয় ঋষিদিগের আনুকূল্যে বলিরাজার প্রতাপ ভারতসীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। অবশেষে ভৃগুকচ্ছে ঐশীশক্তির দ্বারা বলিরাজার দমন হয়। ক্রমশঃ ঋষিনিয়ন্ত্রিত আর্য্যসমাজ পাশ্চাত্য ভারতেতর দেশসকল হইতে আপনার আসর উঠাইয়া ভারতের মধ্যেই আপনার ঘর গুছাইয়া লয়। পরশুরামের পর রামচন্দ্রকে আমরা সম্পূর্ণ ভারতান্তর্গত ঋষিসমাজের সহায়তায় যুদ্ধনিরত দেখিতে পাই। শ্রীকৃষ্ণও তাই; কেবল বলদেব শেষ জীবনে ভারতসীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছিলেন। অনন্তনাগরূপে সমুদ্রপ্রবেশ, সারিবদ্ধ শত শত জলযানসমূহের সমুদ্রযাত্রা ভিন্ন আর কিছু নহে।

নানা পথে, নানা মতে পরমার্থের সাধনে, নানা বিদ্যা ও তত্ত্বের অনুশীলনে, বর্ণাশ্রমসহযোগী সমাজগঠনে আশ্রমী ও অত্যাশ্রমী-ঋষিদিগের ধারাবাহিক কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিলেই আদর্শস্থাপনার ইতিহাস লিখিত হইল। এ ইতিহাসে আদর্শ-স্থাপনারূপ চরমোদ্দেশ্যেই ক্ষত্রিয়শক্তি ও বৈশ্যশক্তি ঋষিদের দ্বারা নিয়মিত; ক্ষত্রিয়শক্তি যখন প্রবল হইয়া সে নিয়ন্তৃত্ব মানিতে চাহে নাই, তখন তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। পরশুরামের যুদ্ধাভিযান ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ এ সত্যের নিদর্শন। আদর্শস্থাপনার ইতিহাসে প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, সংসারের নানা অর্থ বা প্রয়োজন মানুষের জীবনে কি ভাবে স্থান পাইয়াছে।

মোটামুটি আমরা দেখিতে পাইব যে, একটি প্রয়োজনকে ঐ সমস্ত যুগে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে পরমার্থ বা অমৃতত্ব; মনুষ্যজীবনের অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজনকেই উহারই সোপানভাবে অবলম্বন ও সাধন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে চেষ্টা কিরূপে নিয়মিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝা যায়। পরমার্থ ব্যতীত আর সমস্ত সাংসারিক প্রয়োজনের সাধনা দেবতাবিজ্ঞান, মন্ত্রবিজ্ঞান ও যজ্ঞের আকারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এমন কি, পরমার্থসাধনায় প্রবেশলাভ করিতে হইলেও দেবতা, মন্ত্র ও যজ্ঞের ভাবনামূলক প্রণালী প্রযুক্ত হইত। সর্ব্ববিধ প্রয়োজন সাধনের এই যে একটা সাধারণ বৈদিক প্রণালী, ইহা সম্যগ্‌রূপে না বুঝিলে, বৈদিক সভ্যতা, শিক্ষা ও সমাজ কিছুই বুঝা যায় না। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা বুঝিতে হইলে যেমন উহার ভিত্তিস্থানীয় যন্ত্রবিজ্ঞান বুঝা আবশ্যক, সেইরূপ বৈদিক সভ্যতা বুঝিতে হইলে দেবতামন্ত্রবিজ্ঞান প্রথমেই বুঝা আবশ্যক। বৈদিক ঋষি এই দেবতামন্ত্রবিজ্ঞানের আবিষ্কর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং এই বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাচীন আর্য্যসমাজ গড়িয়াছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, দেবতা ও মন্ত্রের উপর অত্যধিক নির্ভর করায় প্রাচীন আর্য্যগণ ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিয়াছেন। এইরূপ সন্দেহ দূর করিবার জন্য আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দেবতা ও মন্ত্রের সাহায্যে ফলকে আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু কর্ম্মকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। স্বচেষ্টার সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য সংযুক্ত না হইলে কোনও কর্ম্মেরই সুফল পাওয়া যায় না। মূলভাবে অবস্থা প্রতিকূল হইলেও, বাহিরের একটা অনুকূল

যোগাযোগ বা ভিতরের একটা অজ্ঞাত প্রেরণা আসিয়া আমাদের স্বচেষ্টার সুফল ফলাইয়া দেয়, ইহা আমরা দেখিয়াছি। কর্ম্মকে বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাইবে যে, কর্ম্মব্যবহৃত শক্তি কতকটা আমার, কতকটা প্রকৃতির। তোমার-আমার শক্তির সহিত প্রকৃতির শক্তির সংযোগে কর্ম্ম হয়। এই প্রাকৃতিক শক্তিকে যে যত বেশী নিজের করিয়া লইয়া কাজে লাগাইতে পারে, সে তত অধিক ফল পাইয়া থাকে। দেবতামন্ত্রবিজ্ঞান এই প্রাকৃতিক শক্তিকে বেশী করিয়া কাজে লাগাইবার একটী বিদ্যামাত্র। উদ্যমশীল ব্যতীত কেহ এ বিদ্যার অধিকারী হয় না। অলস কস্মিন্ কালেও দেবতা ও মন্ত্রে সিদ্ধ হয় না। বরং আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগে কুঁড়েরও অধিকার আছে, কিন্তু মন্ত্রবিজ্ঞানের প্রয়োগে মনীষী ও উদ্যমশীল ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। যন্ত্রবিজ্ঞানের ফল টাকায় বিকায়, মন্ত্রবিজ্ঞানের ফল সাধনা ও উদ্যম সাপেক্ষ।

অমৃতস্বরূপ পরমার্থের আশ্রয়ে দেবতা, মন্ত্র ও যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া, বৈদিক সমাজের শক্তি ও শিক্ষা রজোভাবের দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়ে নাই। সে সমস্ত যুগে যাহাদের অসুর বা রাক্ষস বলা হইত, তাহাদের ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত। অমৃতত্বপ্রয়াসী ঋষি বৈদিক সমাজের ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে নিয়ন্ত্রিত করিতেন, সেইজন্ত ধর্ম্ম-অর্থ-কামও পরমার্থের দিকে মানুষকে অগ্রসর করাইয়া দিত, অথবা অনুকূল পথের যাত্রী করিয়া রাখিত। পারমার্থিক আদর্শের দ্বারা ঋষি, ঋষির দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং উভয়ের দ্বারা সাধারণ মানুষ পৃথিবীর সেই প্রাচীনতম যুগে কিরূপে দৃঢ়ভাবে ও স্থায়িভাবে আর্য্যোচিত আদর্শে গঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেই প্রধান আদর্শ-

স্থাপনার ইতিহাসাঙ্কে আমরা উপলব্ধি করি। ভারতের সনাতন আদর্শকে ঐ ইতিহাসভাগ এমন গভীরভাবে মানুষের আশা ও উদ্যমে, দৃষ্টি ও কল্পনায়, নিহিত করিয়া গিয়াছে,—ভারতের জীবন-নাট্যের একমাত্র নেপথ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছে যে, স্থির-মৃত্যুব্যতীত আর কোনও শক্তি ভারতকে ঐ আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ঐ সনাতন আদর্শই ভারতের আত্মশক্তির উৎস এবং ইহাই ভারতের ইতিহাস রচয়িতা।

কুরুক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ স্থাপনার ইতিহাস সমাপ্ত হইলে, সর্ব্বত্রই নূতন নূতন জাতি ও রাজশক্তির অভ্যুদয় ঘটিয়া একটী নূতন ভারতের সৃষ্টি হইল। তখন এই নূতন ভারতকে প্রাচীন আদর্শে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করাই প্রধান ঐতিহাসিক সমস্যা। প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে যে, এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিবার শক্তি ভারতে কিরূপে সংরক্ষিত হইয়াছিল। "ভারতের সাধনা"য় তৃতীয় * প্রবন্ধে আমরা সেই সংরক্ষণ-নীতির আলোচনা করিয়াছি। বেদ-পুরাণাদির সঙ্কলন ও বিশেষ বিশেষ ঋষিবংশ বা গুরুপরম্পরার উপর উহাদের সংরক্ষণ ও প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া মহর্ষি ব্যাস যে সনাতন আদর্শ রক্ষা করিবার কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা উক্ত প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি। ইহা ব্যতীত স্মার্ত্তযুগের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল শ্রুতিগত বিদ্যা ও আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখা। এই যুগে ধর্ম্মসূত্রাদি ও ধর্ম্মব্যাখ্যানাদির দ্বারা যেমন কর্ম্মকাণ্ডকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করা হইত, সেইরূপ ব্রহ্মসূত্র ও ভিক্ষুসূত্রাদির দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের সংরক্ষণ সাধিত হইত। আদর্শস্থাপনার পর স্মার্ত্ত-

* "ভারতীয় নেশন বেদমহিমা ও অবতারবাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ।

প্রয়োগের ইতিহাসে বৈদিক শিক্ষা ও আদর্শের প্রয়োগকল্পে উহাদের সংরক্ষণ-ব্যবস্থা যে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা ইতিহাসে পাইতেছি। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চতুর্ব্বর্গের মধ্যে বৈদিক ধর্ম্ম ও মোক্ষ যেমন আত্মরক্ষার সদুপায় লাভ করিয়াছিল, বৈদিক ক্ষত্রিয়রাজার অভাবে অর্থ ও কাম সেরূপ সদুপায় হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। বৈদিক ক্ষত্রিয়ের মহিমা যেখানে মাঝে-মাঝে কলিযুগের ক্ষত্রিয়ের মধ্যে দেখা দিয়াছে, সেখানে এক একবার আমরা বৈদিক ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সামান্য আভাস দেখিতে পাই, নচেৎ ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্ব থাকাতে যেমন বৈদিক ধর্ম্ম রূপান্তরিত হইয়াও একপ্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, বৈদিক অর্থ ও কাম প্রকৃত ক্ষত্রিয়রাজার অভাবে সেরূপ আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। তাহাদের আদর্শও ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।

আদর্শপ্রয়োগের ইতিহাসে বৈদিক ধর্ম্ম ও মোক্ষের আদর্শ ভারতের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা দেখিতে পাই। "সম্ভবামি যুগে যুগে" গীতায় এই ভগবদ্বাণীর গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে, আদর্শের ঐরূপ গভীর ও অচল প্রতিষ্ঠার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমরা "ভারতের সাধনা"র তৃতীয় প্রবন্ধে অবতারবাদের মর্ম্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। ভারতীয় আদর্শের দেশোপযোগী প্রয়োগের জন্য বুদ্ধ ও শঙ্করের যে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা পঞ্চম ("সন্ন্যাসাশ্রম") প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বুদ্ধপূর্ব্ব যুগে যে বৈদিক ধর্ম্মাদর্শের মধ্যে কালোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তাহা নহে। খাঁটি বৈদিক সমাজ না হইলে খাঁটি

বৈদিক ধর্ম্মের যজন-যাজনা হয় না। কলিযুগের আরম্ভ হইতেই নূতন নূতন জাতি ও সমাজের অভ্যুদয়ে খাঁটি বৈদিক সমাজ কোণঠেসা হইতে থাকে, অতএব খাঁটি বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা তাহারই একটা নূতন সংস্করণের প্রচলন সেই নূতন ভারতের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। এই গভীর প্রয়োজনসাধনের জন্য পঞ্চোপাসনা ও তন্ত্রের প্রচার হয়, এবং উহাদের সাহায্যে নূতন নূতন অনেক অবৈদিক সমাজ এক হিসাবে বৈদিক সমাজের পরিচয় লাভ করে। বৈদিক প্রণবতত্ত্ব ও যোগতত্ত্বের ভিত্তির উপর উপনিষদ্‌কার সন্ন্যাসী পঞ্চোপাসনা ও তন্ত্র গড়িয়া তুলেন, এবং তাঁহারই শিক্ষায় অনেক অবৈদিক জাতি নূতন বৈদিকতার আশ্রয় লাভ করে। কিন্তু এমন জাতি ও সমাজ অনেক বাকি ছিল, যাহাদের অনার্য্যভাবকে আয়ত্ত ও পরিবর্ত্তিত করা এই নূতন বৈদিকতারও সাধ্যাতীত। ফলে এই সমস্ত জাতি ও সমাজের প্রভাব আর্য্যসমাজের পক্ষে সর্ব্বদাই বিপত্তয় ও পরিণামে মৃত্যুভয়ের আকারে বিদ্যমান ছিল; কেননা, তাহাদের আদর্শের সহিত সংগ্রামে আর্য্যাদর্শের পরাজয় হইলেই আর্য্যসমাজের মৃত্যু। আমরা পঞ্চম ("সন্ন্যাসাশ্রম") প্রবন্ধে দেখিয়াছি যে, ভগবান্ বুদ্ধ এই ভীষণ মৃত্যু হইতে আর্য্যসমাজকে রক্ষা করেন। তারপর তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসাধনা এক দিকে জরাজীর্ণ বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপর চরম আঘাতটা অর্পণ করিলেও, অপর দিকে নূতন উৎসাহে ও বর্দ্ধিত প্রতাপে প্রবর্ত্তিত তন্ত্রোপাসনার কবলে নিজেই কবলিত হইয়া মহাযানের আকার ধারণ করিল। পরে পরে আরও যে সমস্ত আকার বৌদ্ধধর্ম্ম ধারণ করিয়াছে, সে সকল বেদতন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের দ্বারা

উহার পরিপাকক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক ব্যাপার। বৌদ্ধযুগের পর ভগবান্ শঙ্কর আবির্ভূত হইয়া বৈদিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তৎকালীন সর্ব্ববিধ উপসনাপদ্ধতিকে সেই সেই বৈদিকতার আশ্রয়ে আকর্ষণ করেন। ("সন্ন্যাসাশ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ)

বেদনিঃসৃত ভক্তিধারা কৃষ্ণলীলাতরঙ্গে সম্মিলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যে ত্রিবেণীসঙ্গম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার মধুররস এই ত্রিবেণীতে মিলিত হইয়া উৎকৃষ্ট রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের রসতত্ত্ব যদি প্রচারিত না হইত, তবে বহুসংখ্যক বৌদ্ধতান্ত্রিক স্ত্রী-পুরুষ হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় পাইত না। শ্রীচৈতন্যের যুগে বাঙ্গলা-দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের একটা বিপুল সমাজ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধুররসসাধনাকে শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আশ্রিত করাইয়া গৌর-নিতাই তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত করিয়া লন। যে নূতন রসতত্ত্বের সহায়ে বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণবসাধনা এই অসাধারণ কীর্ত্তি প্রকাশ করে, তাহারই ফলে বঙ্গীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বিশেষত্ব ও গৌরব প্রকটিত হইয়াছে।

বৈষ্ণবসাধনার দ্বারা জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের যে বিরোধ ধূমায়িত হইয়া উঠে এবং সন্ন্যাসাদর্শের সহিত বর্ত্তমান যুগের কর্ম্মাদর্শের সামঞ্জস্যের যে প্রয়োজন অনুভূত হয়, সে সম্বন্ধে কিছু বলিবার বাকি আছে। আগামী বারে সে কথা বলিয়া, এবং ভারতের সাধনার পথে আমরা এখন কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, তাহার ইঙ্গিত করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধপর্য্যায়ের উপসংহার করিব।

* * * *

নেশনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা—শেষ কথা।

(উদ্বোধন—ফাল্গুন, ১৩২১)

পুরাকালে ভগীরথ যেমন গঙ্গা আনিয়াছিলেন, সেইরূপ ইতিহাস মানুষের দ্বারা নানা দেশে নানা রকমের সাধনার ধারা বহাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু ভারতে যে সাধনার ধারা আদিযুগ হইতে বহিয়া আসিয়াছে, তাহার উপমা নাই, তুলনা নাই। এ ধারা যেমন বিপুল, যেমন গভীর, যেমন অবিচ্ছিন্নগতি, যেমন বিশ্ববিস্তৃত-প্রভাব, আর কোনও দেশের সাধনাধারা সেরূপ নহে। যাহারা বলেন—ভারতের ইতিহাস নাই, তাহারা অন্ধ; যাহারা পাশ্চাত্যে-তিহাস-লব্ধ দৃষ্টিতে ভারতেতিহাস আবিষ্কার করিতে যান, তাহারা শুধু অন্ধ নহেন, আরও কিছু। ভারতে ইতিহাস গড়িবার মাল-মশলা আলাদা, প্রণালী আলাদা, আদর্শ আলাদা, কারিগর আলাদা। আমরা চতুর্দ্দশটী প্রবন্ধে এ সব কথার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। ভারতের ইতিহাস আজ আমাদের কোন্ স্থানে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে, এখন তাহারই একটা সংক্ষিপ্ত বিচার করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধপর্য্যায়ের চরম উপসংহার করিব।

ভারতের সাধনাস্রোত বন্ধুর অতীতকাল-হিমাদ্রি অতিক্রম করিয়া আজ বর্ত্তমানযুগ-ভূমির উপর নিপতিত হইতেছে। শিবের মত এই বিপুল ধারা শিরে ধারণ করিয়াছেন সমাধিবিধৃতাসন শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব, আর সেই ধারাকে যুগোচিত বিচিত্র কর্ম্মখাতে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন শ্রীমদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ। আধুনিক যুগ-ভূমির উপর ভারতের সাধনা প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ভারতের যাহা কিছু সনাতন, যাহা কিছু এককালে ছিল, কিন্তু বীজ রাখিয়া নষ্ট হইয়াছে, সবই আজ ঐ প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দখলে আসিয়াছে।

এখন বাকি কেবল সে সমস্তকে আয়ত্ত করা। কালতরঙ্গাঘাতে সর্ব্বদা বিক্ষিপ্ত হইলেও আজ ভারতবাসীর আর ভয় নাই ; কেন-না, দাঁড়াইবার জমি, বাস করিবার ঘর, তাহার জন্য প্রস্তুত। আজ তাহাকে কেবল জাগিতে হইবে, জানিতে হইবে, আপনার বুঝিয়া লইতে হইবে। আবার বলি—ভারতে যুগে যুগে নানা ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করিয়া, বারংবার নানা দিক্ হইতে শাখাস্রোত-সকল আত্মসাৎ করিয়া, যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাধনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার কিছুই নষ্ট হয় নাই। সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণভাবে সেই স্রোত আজ আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত। অতএব অতীতের দিকে চাহিয়া হা-হুতাশ করিবার আর প্রয়োজন নাই, পশ্চাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সম্মুখের কর্ত্তব্য আর অবহেলা করিতে হইবে না, উদ্দীপনা ও প্রেরণার উৎস খুঁজিবার জন্য আর অতীতারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। বুঝিবার ও কাজে লাগাইবার নিতান্ত উপযোগী হইয়া অতীত আজ আমাদের কাছে ধরা দিয়াছে। সংযোগের এই যে মহাকেন্দ্র, ইহাতে শক্তি ও সাধনার সমস্ত প্রাচীন উৎস একযোগে আপনাদিগকে সংযোজিত করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণতা লাভ করিয়া ভারতের সাধনা আজ এই মহাকেন্দ্র হইতে অভূতপূর্ব্ব গৌরবে আত্মপ্রকাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

ভারতের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের আদর্শগুলিকে নানা পথ দিয়া ইতিহাস পরিচালিত ও সংগঠিত করিয়া আনিয়াছে। তাহারা যখন ভিন্ন ভিন্ন পথের যাত্রী ছিল, তখন পরস্পর হয়ত বিরোধ ঘটিয়াছে। যখন ভক্তি আপনার বিবিধ অঙ্গকে পরিপুষ্ট করিতে

চাহিয়াছে, তখন আপনার চারি পাশে বেড়া দিয়া জ্ঞান কর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য আদর্শগুলির সহিত ঘনিষ্ঠ সংশ্রব হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে। আবার জ্ঞানও আপনার তত্ত্বদৃষ্টিকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য বিচারের প্রাচীর তুলিয়া ভক্তিমার্গের সাধন ও বিশ্বাসগুলিকে তফাতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। এইভাবে এক সম্প্রদায় হইতে আর এক সম্প্রদায়,—গৃহী হইতে সন্ন্যাসী—বৈষ্ণব হইতে শাক্ত—কর্ম্মপন্থী হইতে জ্ঞানী,—পরস্পর-বিশ্লিষ্ট, এমন কি প্রয়োজনমত পরস্পর-বিরুদ্ধ হইয়া পরমার্থসাধনার ভিন্ন-ভিন্ন অঙ্গকে প্রতিষ্ঠ ও পরিপুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার ভিতর দিয়া ভারতের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ইতিহাস এক মহাসঙ্গমের দিকে পরিচালিত করিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু পরমহংসদেবের আবির্ভাবে আজ যে মহাসমন্বয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করিয়া পরমার্থ-সাধনার আদর্শগুলি পূর্ণাঙ্গ হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছে। এতদিনে ভারতেতিহাসের সুচিরপোষিত নিগূঢ় অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে। এখন প্রত্যেক সম্প্রদায়, প্রত্যেক আদর্শ, আপনার বিশেষত্ব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়াও, অপর সম্প্রদায়, অপর আদর্শের সহিত অপূর্ব্ব সমন্বয়ে সুসমন্বিত। সে গভীর সমন্বয়ের কৌশল ও সত্যতা যদি তোমার-আমার বুদ্ধিতে উপলব্ধ না হয়, তথাপি পরমহংসদেবের অলৌকিক জীবনকে উহার স্থূল নির্দ্দেশরূপে (symbol) অবলম্বন করিয়া তুমি-আমিও উচ্চ সমন্বয়ভূমিতে প্রবেশাধিকার পাইব। তিনি আপনার জীবন, আপনার সাধন-সম্পদ্ আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া দেশের আপামর-

সাধারণকে প্রকৃতভাবে ধর্ম্মসমন্বয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তুমি জ্ঞানমার্গী, ভক্তিমার্গী বা কর্ম্মমার্গী হও,—তুমি অদ্বৈতবাদী বা দ্বৈতবাদী হও,—তুমি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীশ্চান হও,—তুমি বৈষ্ণব হও, বা শাক্ত হও,—তুমি যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার মধ্য দিয়া তুমি অপর সমস্ত সম্প্রদায়ের সহিত অবিচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে আবদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি এখন ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে,—কিন্তু হে দেশবাসী, যদি ঐ ছবির দিকে চাহিয়া তুমি এই মহাসম্মিলন, এই যুগসমন্বয় প্রাণের মধ্যে অনুভব না কর, যদি তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে সকল সম্প্রদায়ের সহিত, সকল ভারতবাসীর সহিত এক বলিয়া অনুভব না কর, তবে সে ছবি রক্ষা করা তোমার বৃথা হইয়াছে! ভারতের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধন ও দুঃখমোচনের মূল উপায় একতা। সেই রাষ্ট্রীয় একতার নিদর্শনরূপে পরমহংসদেবের জীবন ও সাধনা আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। এই অতি সুলভ নিদর্শনকে কেন্দ্র করিয়া আজ যদি আমরা সম্মিলিত না হই, তবে মিলনের—একতার আর আশা নাই।

সর্ব্বধর্ম্মমার্গের সমন্বয় একটা সামান্য কথা নহে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতি বিশাল সহানুভূতি ও উদারতার দ্বারা, অতি-তুঙ্গতত্ত্বশিখরস্পর্শী পাণ্ডিত্যের দ্বারা এ সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সর্ব্বসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকদিগের সাধনসম্পদ্ এই মহাসমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাতাকে আপনার মধ্যে একাধারে বিকশিত করিতে হয়,—খ্রীষ্ট-বুদ্ধ-মহম্মদ-শঙ্কর-চৈতন্যাদির সাধনসম্পদ্ একটী জীবনে আয়ত্ত ও প্রতিফলিত করিতে হয়। একের মধ্যে এই সকলকে যদি আমরা

খুঁজিয়া পাই,—যদি খ্রীষ্টের জীবার্থৈকসর্ব্বসহিষ্ণু প্রেম, বুদ্ধের জীবকল্যাণমাত্রৈকপ্রতিহতা নির্ব্বাণনিষ্ঠা, মহম্মদের মরুকে কাননে পরিণত করিবার কর্ম্মাভিজ্ঞতা, শঙ্করের সর্ব্বশাস্ত্রমর্ম্মগ্রাহী মেধাবিত্ব, চৈতন্যের ভবদ্রবকারী মহাভাব, আমরা একাধারে অভিব্যক্ত দেখিতে পাই,—তবেই বুঝিব, মহাসমন্বয়ের যুগ যুগাবতারকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়াছে। হে মানব, অকপটচিত্তে আজ পরীক্ষা করিয়া দেখ, সে যুগ ও যুগাবতার আজ তোমার সম্মুখে উপস্থিত কি না। এ প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া তোমার জীবন ও তোমার দেশের জীবন তুমি কোন্ পথে চালিত করিবে ?

এই সমন্বয়কেন্দ্রে অবস্থিত হইয়া ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে ভারতীয় চিন্তা ও সাধনার প্রাচীন সমস্ত বিরোধ মিটিয়া গিয়াছে এবং ভারতের ভাবী ইতিহাস গড়িবার সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত ও ব্যক্ত হইয়া প্রকৃত কর্ম্মিবৃন্দের প্রতীক্ষা করিতেছে। আধুনিক জগতে যে-কোনও দেশের ইতিহাস গড়িবার জন্য একটী অভিনব কৌশল কালের দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছে। যে দেশ সে কৌশল অবলম্বন না করিবে, উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য বা উপায় সে খুঁজিয়া পাইবে না। এই কৌশলের নাম nationalism ; একটী চরম লক্ষ্যকে কেন্দ্ররূপে অবলম্বন করিয়া ও জীবনের কর্ম্মপ্রপঞ্চকে তাহার সাধনরূপে পরিণমিত করিয়া, যখন সমস্ত দেশবাসী দেশের কল্যাণ ও উন্নতিসাধনে সমবেতভাবে অগ্রসর হয়, তখন সেই সমষ্টিবদ্ধতাকে nationalism বলা যায়। পাশ্চাত্যে এইভাবে একটী চরমলক্ষ্য লইয়া দেশে দেশে এক একটী সমষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ সমষ্টিগঠনের ফলে অদ্ভুত অপরিমেয় শক্তি ও কর্ম্মতৎপরতার বিকাশ

হইয়াছে এবং আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি যে, ভারতবর্ষকে যদি বাঁচিতে হয়, তবে ঐ সমষ্টিগঠনের কৌশল আমাদিগকেও অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু এযাবৎ আমাদের দেশহিতৈষিগণ সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য কৌশলটী অনুকরণ করিতে যাইয়া, সমষ্টিগঠনের পাশ্চাত্য লক্ষ্যটী পর্য্যন্ত আমাদের দেশে আমদানি করিবার চেষ্টা করিয়া আপনাদিগকে ও দেশকে বিষম ভ্রান্তির কবলে কবলিত করিতেছেন। সেই জন্য আমরা "ভারতের সাধনা"য় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, ভারতীয় সমষ্টিজীবনের লক্ষ্য বহু পুরাকাল হইতেই নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভারতের ইতিহাস কখনও সেই লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই বলিয়াই, ভারত আজও বাঁচিয়া আছে। কিন্তু আজ যদি পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার রূপ সেই সনাতন লক্ষ্যকে নববলে উদীয়মান দেশের সমষ্টিজীবনে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, পাশ্চাত্যের অনুকরণে রাজনৈতিক লক্ষ্য ও একতাকে অবলম্বন করিয়া রাজনৈতিক সমষ্টিজীবন গড়িবার জন্য দেশের শিক্ষিত লোক আপনারা ক্ষেপিয়া উঠেন ও দেশকে ক্ষেপাইতে চান, তবে দেশের মৃত্যু অনিবার্য্য। সেই ভীষণ আসন্ন বিপদের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"* * The result will be that in three generations you will be an extinct race; because the backbone of the nation will be broken, the foundation upon which the national edifice has been built will be undermined, and the result will be annihilation all round."—* * ফল এই হইবে যে, তিন

পুরুষে তোমরা মৃত জাতিতে পরিণত হইবে; কারণ, জাতির (নেশনের) মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িবে, যে ভিত্তির উপর দেশের সমষ্টিজীবন গঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলচ্ছেদ হইবে এবং ফলে সকল দিকেই ধ্বংস দেখা দিবে।”

এ সমস্ত কেবল আবেগের কথা নহে। বাস্তবিকই মরণ-বাঁচনের সন্ধিস্থলে আমরা আজ দাঁড়াইয়া আছি। কালের আহ্বান—অগ্রসর হও; যুগধর্ম্মের আদেশ—নেশন গঠন কর। এখন দেখিতে হইবে, আমরা কোন্ পথে পদক্ষেপ করি, মরণের পথে—না বাঁচনের পথে? আমরা কোন্ রকমের nationalism (জাতীয়তা বা স্বদেশ-পরায়ণতা) গ্রহণ করিব? ইহা জীবন-মৃত্যুর সমস্যা। একটী পথ রহিয়াছে—রাজনৈতিক ভাবের উপরে নেশন ও সমষ্টিজীবন গঠন করা। দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক এই পথে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, ডাকিলেও সাড়া দেয় না। আর একটী পথ—ভারতীয় সমষ্টি-জীবনের ও ব্যষ্টিজীবনের চিরন্তন লক্ষ্যকে লইয়া নেশন গঠন করা। কালে এ পথ জঙ্গলাকীর্ণ ও দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও সাধন আবার উহাকে সুসংস্কৃত করিয়া আমাদের দখলে আনিয়া দিয়াছে। আচার্য্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া এই পথের পরিচয় আমরা “ভারতের সাধনা”য় দিয়াছি; বহু প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কিরূপে এই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে, কিরূপে এই পথ ধরিয়া উহাকে ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এই দুইটার মধ্যে কোন্টী বাঁচিবার পথ এবং কোন্টী মৃত্যুর, সে বিষয়ে কি এখনও সন্দেহ আছে?

অনেকে বলেন যে, আমরা আর এক দিক্ দিয়া মরিতে বসিয়াছি। তাহারা বলেন যে, একে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুসমাজের গোঁড়ামি, তাহার উপর অন্নাভাব, এই দুই কারণে হিন্দুরা মরিতে বসিয়াছে, —তাহারা dying race ; উপায়—সমাজের প্রবেশদ্বার যথাসম্ভব উন্মুক্ত কর, সমাজের ভিতরে বিধবাবিবাহাদি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত রীতিনীতির প্রচলন কর, ইত্যাদি। সব সমাজেই ত অন্নকষ্ট আছে কিন্তু হিন্দুসমাজেই যখন লোকক্ষয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তখন যুক্তি এই যে, ব্যাধিও সামাজিক এবং প্রতীকারও সামাজিক হওয়া চাই।

বিড়াল, কুকুর, বা আর কোনও জানোয়ারদের যদি সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতে দেখা যায়, তবে বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ঐ জন্তুদের জাতটা লোপ পাইতেছে। কিন্তু একটা দেশের সমষ্টিমানব, যাহারা শুধু খাওয়া-পরা লইয়াই বাঁচে না,—যাহাদের শিক্ষা, সভ্যতা, আদর্শ প্রভৃতি লইয়াই পরিচয়,—তাহাদের যদি কোনও সময় বা অবস্থায় লোকসংখ্যা কমিতে থাকে, তবে ফস্ করিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় কি যে, ইহারা মরিতে বসিয়াছে,—ইহারা dying race? হিন্দুরা এতকাল বাঁচিয়া আছে, তাহাদের নিশ্চয়ই কোন না কোন রকমের একটা সমষ্টিজীবন আছে। যাহারা একবার একটা সমষ্টি হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সেই সমষ্টিদেহের প্রাণবস্তু কি? কি অবলম্বনে সমষ্টি বাঁধে, এবং কি আকর্ষণে ও ক্রিয়ায় সেই জোট-বাঁধা বজায় থাকে? উত্তর,—সমষ্টিলক্ষ্য ও তাহার সাধন। যে লক্ষ্য ব্যষ্টির জীবন ও সাধনাগুলিকে সংহত করিয়া সমষ্টি গড়িয়া তুলে, সেই লক্ষ্যই সমষ্টিদেহের প্রাণ। এই লক্ষ্য যতদিন অক্ষুণ্ণ আছে,

ততদিন সমষ্টি বাঁচিয়া থাকিবে,—যদি না আকস্মিক অপমৃত্যু ঘটে! যতদিন সমষ্টির প্রাণ বাঁচিয়া আছে, ততদিন সমষ্টির মৃত্যু নাই। হিন্দুরা যে লক্ষ্য লইয়া সমষ্টি হইয়াছিল, যতদিন সেই লক্ষ্য কার্য্যকারী হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন সেই লক্ষ্য সহস্র অবস্থাবিপর্য্যয়ের মধ্যেও আত্মপ্রতিষ্ঠার সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারিবে, ততদিন লোকসংখ্যা কিছুকাল কমিতে থাকিলেই বলা ঠিক নয় যে, হিন্দুরা মরিতে বসিয়াছে। শতকরা বিশজন লোকও যখন প্রতিবৎসর দুর্ভিক্ষে মরিতেছে, তখনও বলা যায় না যে একটা দেশের সমষ্টিমানব মরিতে বসিয়াছে। এরূপ লোকক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সমষ্টিলক্ষ্যের খবরও রাখিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে, দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সমষ্টির লক্ষ্য উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া, দেশের লোককে আরও দৃঢ়ভাবে সমষ্টিবদ্ধ করিয়াই দুঃখদারিদ্র্যের যে একমাত্র চরম প্রতীকার পাওয়া যাইবে, তাহারই পথ খুঁজিতেছে কি না। রোগী সাগু খাইয়া বাঁচিতেছে বলিয়াই যেমন বলা যায় না যে, সে খাইতে না পাইয়া মরিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হয় যে, এক দিকে সাগু খাইতে হইলেও অপর দিকে তাহার প্রাণপোষণের ব্যবস্থা হইতেছে,—একটা সমষ্টির অন্নকষ্টসম্বন্ধেও সেইরূপ। শুধু অন্নকষ্ট দেখিলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, ঐ অন্নকষ্টকে একটা ক্ষণিক বা অস্থায়ী ব্যাপারে পরিণত করিয়া ফেলিবার জন্য সমষ্টির লক্ষ্য মহা-উদ্যোগে আর এক দিক্ দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে কি না, আপনার প্রতিষ্ঠা খুঁজিতেছে কি না। কেবল সংখ্যার হিসাব করিয়া হিন্দুদের dying race বলা অল্পদর্শিতা ও ভাবপ্রবণতার ফল।

ভারতের সাধনা।

রোগের প্রাদুর্ভাব ও অন্নের অভাব যে দেশে বাড়িয়া যাইতেছে তাহার একটী মূল কারণ এই যে, আধুনিক যুগে একটা দেশের লোক যতদূর সমষ্টিবদ্ধ হইলে আধুনিক দারিদ্র্যসমস্যা ও রোগসমস্যা হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, আমরা এখনও ততদূর সমষ্টিবদ্ধ হই নাই। যতদিন এই disorganisation বা সমষ্টিবদ্ধতার অভাব থাকিবে, ততদিন আমাদের দেশের অস্বাস্থ্য ও অন্নকষ্ট কিছুতেই ঘুচিবে না এবং লোকক্ষয়ও হইতে থাকিবে। সেইজন্য আমাদের দেশে সমস্ত সমস্যার মূল-সমস্যা হইতেছে—নেশন গঠনের সমস্যা। সেই সমস্যার উপরই আমাদের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। আর যাঁহারা রাজনীতির সাহায্যে ঐ সমস্যার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা দেশকে মৃত্যুর পথ অবলম্বন করাইতেছেন। এই একমাত্র হিসাবে বলা যায় যে, আমরা মৃত্যুর পথে চলিতে যাইতেছি,—কেবল এই হিসাবে বলা যায়—"We are seeking to be a dying race,"—আমরা মরিবার পথ খুঁজিতেছি।

ভারত যে সাধনার পথে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে,—কখনও বীরপদবিক্ষেপে, কখনও বা জড়িতপদক্ষেপে,—সেই পথই ভারতের বাঁচিবার পথ। সে পথ আমরা দেখিতে পাইয়াছি এবং আরও দেখিতে পাইয়াছি যে, অলৌকিক ও দুরধিগম্য প্রেম ও বীর্য্যের সহায়ে সমগ্র ভারতকে ভারতের যুগাবতার সেই বাঁচিবার পথে আজ দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। কারণ, ভারতকে যে বাঁচিতে হইবে,—সে বাঁচা শুধু ভারতবাসীর জন্য নহে, সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য। যদি জগতে পরমার্থের প্রকৃত মহিমাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি মনুষ্যজীবনে পারমার্থিক উদ্দেশ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা ও রক্ষা

করা সমগ্র জগতের পক্ষে একটা চিরন্তন প্রয়োজন হয়, যদি পৃথিবীতে মোক্ষ-মার্গকে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে ভারতকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। ভারতের এই বাঁচায় বিশ্বমানবের স্বার্থ রহিয়াছে; আর সমস্ত জগতের মানুষও যদি সে স্বার্থ না বুঝে, তবে জগতের বিধাতা সে স্বার্থ রক্ষা করিবেন। তিনি রক্ষা করেন বলিয়াই, ভারত এতকাল বাঁচিয়াছে এবং বাঁচিবে। "শেষকথা"র অবতারণা করিয়া বলিয়াছিলাম যে—ভারতের ইতিহাস গড়ে ভারতের আদর্শ। আর এক ধাপ উঠিয়া বলি,—সব দেশের ইতিহাস গড়েন ও ভাঙ্গেন—শ্রীভগবান্, মানুষ কেবল নিমিত্ত। "ভারতের সাধনা"য় ভারতে তাঁরই লীলা বুঝিবার আমরা চেষ্টা করিয়াছি এবং সর্ব্বশেষেও বলিতেছি—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

সেইজন্য যদিও নেশন গড়িয়া তুলিবার সবই প্রস্তুত,—যদিও উপায় জানা আছে, কৌশল ও প্রণালী জানা আছে, পথ জানা আছে,—তথাপি কর্ম্মীর অভাব ও অর্থের অভাব দেখিয়া হৃদয় দমিয়া যায় না, মন ভাঙ্গিয়া যায় না। যিনি চোখ খুলিয়া দিয়া পথ দেখাইয়াছেন, যিনি আদর্শের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন, যিনি নেশন-গঠনের জন্য নিজের লীলাজীবনকে কেন্দ্ররূপে দান করিয়াছেন, তিনিই সাধক ও কর্ম্মীর অভাব ঘুচাইবেন, অর্থের অভাব ঘুচাইবেন,—এ বিশ্বাস পোষণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

(সমাপ্ত)

পরিশিষ্ট।

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গলার কথা।"*

(উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ,—১৩২৪।)

'প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স' এতদিনে "প্রাদেশিক সম্মিলন" হইয়াছে, এবং ইংরাজীশিক্ষিতের 'পলিটিক্যাল এজিটেশন' সেখানে আজ "বাঙ্গলার কথা"য় পরিণত হইয়াছে। সেইজন্য "উদ্বোধনে" আজ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের আলোচনা উপস্থিত না করিয়া থাকা গেল না।

"বাঙ্গলার কথা" এই আখ্যা লাভ করিয়া সভাপতির অভিভাষণটী মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড পাইয়াছি। এই অভিভাষণ পড়িতে পড়িতে আনন্দে মন ভরিয়া গিয়াছিল। ইহারই বিষয় আজ কিছু লিখিব।

বহু পুরাকাল হইতে আমাদের দেশেও একটা বিশাল জীবন-স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু আমরা—আজকালকার শিক্ষিত সমাজ—সে জীবনের সন্ধান বড় বেশী পাই নাই; কেন না, ইস্কুলের কেতাবে, সংবাদপত্রে, বিলাতের আমদানি হাজার হাজার পুস্তকে, সে জীবনের সন্ধান একরূপ দেয় না বলিলেও চলে। আর মহামহিম রাজসরকারকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের যে একটী

---

* ১৩২৪ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতা—ভবানীপুরে Bengal Provincial Conference (বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলন)এর বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের অভিভাষণের সমালোচনা।

নূতন জীবনজাল শতেক বৎসর ধরিয়া আমরা গড়িয়া তুলিতেছি, তাহাও ঐ সনাতন জীবন-প্রবাহে জলরাশির উপর তৈলধারার মত ভাসিয়া চলিয়াছে, কিছুতেই মিশিয়া যাইতে পারে নাই। যদি বল, জলের সহিত তেলের মিশিতেই হইবে, তবে তোমার সে চেষ্টা, সে পুরুষকারের কে সমর্থন করিবে ?

কিন্তু সেই চেষ্টা ও পুরুষকারের ক্ষণিক উদ্দীপনায় আমাদের 'কংগ্রেস'-'কনফারেন্স' এতদিন ডগমগ্ করিত। পাশ্চাত্যে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের স্বদেশপ্রেম রাজসরকাররূপ কর্ম্মযন্ত্রকে নিয়মিত করিয়া, ঐ যন্ত্র হইতে দেশের লোকের সর্ব্ববিধ কল্যাণের ব্যবস্থা করাইয়া লয়। ইহার নাম 'পলিটিক্স্'। আমাদের দেশে এই পলিটিক্সের অনুকরণে, জলরাশিতে তৈলবৎ ভাসমান শিক্ষিত-সমাজ হইতে কয়েকশত প্রতিনিধি আপনাদের আপনারা নির্ব্বাচিত করিয়া লন, তাহার পর ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত রাজসরকারের অভিমুখে তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম ছুটিয়া যায়,—কেন না, সেই রাজসরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার লাভ করা পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রথম সোপান। সেই ক্ষমতা লাভ করিলে তবে ত রাজসরকার-রূপ যন্ত্র হইতে দেশের সকল রকম কল্যাণের ব্যবস্থা আদায় করা যাইবে !

রাজসরকারের দিকে স্বদেশপ্রেমের এই অনিবার্য্য গতিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের অন্ধ অনুকরণ। যখন এই আবেগময়ী গতি রাজসরকারের দ্বারে-দ্বারে ব্যাহত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়ায়, তখন ঐ গতির অনিবার্য্যতার অনুপাতে 'এনার্কিজমে'র উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গালার কথা।"

এবারকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় স্বদেশ-প্রেমের এই অন্ধগতিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, রাজসরকারের দিক্ হইতে যুগযুগান্তের প্রজাসাধারণের দিকে ছুটিয়া আসিবার জন্য আমাদের স্বদেশপ্রেমকে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের সভাপতির পক্ষে এ বড় সামান্য কৃতিত্ব নহে। এনার্কিজমের জড় মারিবার পক্ষে এর চেয়ে বড় চাল আর কি হইতে পারে? সভাপতি মহাশয়ও এক জায়গায় বলিয়াছেন—"আমার মনে হয় এই কাজ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাজে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজবিদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যের ফল।"

এতকাল কংগ্রেস-কন্‌ফারেন্সের প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী দেশের যুবককে রাজসরকারের দিকে ধাবিত করিয়াছে, তাহাকে প্রকৃত দেশের কাজ দিতে পারে নাই। তাহার আশা-ভরসা, তাহার চিন্তা-সাধনা, তাহার বাদ-প্রতিবাদ, তাহার রোষ-আস্ফালন, তাহার আদর-অভ্যর্থনা, তাহার সমস্ত হৃদয়াবেগের সম্মুখে সে রাজসরকারকেই দেখিতে পাইয়াছে। কিন্তু এ কি বিলাতের রাজসরকার যে সমস্ত দেশের জীবন, সমস্ত দেশের ইতিহাস, সেই রাজসরকারে মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে, আর সেই কল্যাণময়ী মূর্ত্তিকে যে দিকে নাড়িয়া বসাইতেছে সেইদিকেই—ধর্ম্মে-কর্ম্মে সমাজে-শিক্ষায় ব্যবসা-বাণিজ্যে—লোককল্যাণ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে? বিলাতে দেশের কাজ এ ভাবে নিশ্চয়ই হইতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশে হইতে পারে না। আর হইতে পারে না বলিয়াই

পলিটিক্যাল এজিটেশনের সমুদ্রমন্থনে গরলই বেশী উঠিতেছে, অমৃতের কোনও সন্ধান নাই।

আমাদের দেশে বহু বহু শতাব্দী হইতে দেশের কাজ দেশের লোকেই করিয়া আসিয়াছে, রাজসরকার তাহার তত্ত্বাবধায়ক। গ্রামে গ্রামে লোকে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নিজের হাতে করিয়া নিজের ভাবে সংসার পালন করিয়াছে, নিজের ভাবে ভবপার হইবার তরণী প্রস্তুত করিয়াছে।* রাজা-রাজরাজড়ারা বিবাদ বিসম্বাদের অবসরে কেবল তত্ত্বাবধান করিয়াছেন—তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম, নিজেদের কাজ করে কিনা, এবং সেই ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন অপসারণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বাবধান, এই বিঘ্নাপসারণের জন্য রাজা প্রজার নিকট কর আদায় করিয়াছেন। সে কর রাজার জমির ভাড়া নয়, রাজার কাজের মজুরি।

আর এই যে দেশের লোকের ধর্ম্ম ও কাজ, তাহার ব্যবস্থা-বিধানও রাজা দিতেন না, দিতেন ব্রাহ্মণ অথবা অভাবপক্ষে সন্ন্যাসী। ফলে সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনের যে সাধনা, তাহাও যথাকালে পরমার্থসাধনায় পৌছিয়া দিতে পারিত, পরমার্থরূপ একই লক্ষ্যের সাধনে আর সমস্ত অর্থ বা প্রয়োজন নিয়ন্ত্রিত হইতে পারিত। প্রাচীন ভারতে দেশের কাজের এই যে প্রকৃতি, তাহা সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় গোড়াতেই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তিনি বলিতেছেন,—"আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত, আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্যকর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না

রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিবে। সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।"

যে দেশে দেশের কাজের মূলপ্রকৃতি এইরূপ, সে দেশে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন কি ভাবে গড়িয়া উঠিবে সে কথাও সভাপতির অভিভাষণে উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "এই যে মিলন যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়,—ইহাকে জাতিত্বের দিক্ দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী-জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ-জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটী সত্যের দিক্ দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক্ দিয়াও দেখা যায়—সেটা আমাদের নিজ নিজ এক শাসন বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক্ দিয়া। * *"

"শুধু জাতিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটী জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদানপ্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে।"

আর শাসনবিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক্ দিয়া "বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটী স্বতন্ত্র জাতি নিজ-নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইলেও, এই দুইটী শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী

জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসনবিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ, গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব।"

সভাপতি মহাশয়ের এই মন্তব্য আমরা অনুমোদন করি; কিন্তু কথাটা অন্য রকমে এবং আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়। ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism আধুনিক জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, আমাদের জাতিত্ব এখনও আত্মপ্রকাশ করে নাই। আমাদের জাতিত্ব আমাদের অতীতের ঘটনাপারম্পর্য্যে নিহিত রহিয়াছে, আমাদের জাতির আদর্শ-পুরুষদের জীবনে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের জাতিত্ব বা nationalism আমাদের ইতিহাসের তাৎপর্য্য, আমাদের ইতিহাসের মর্ম্মকথা। সেই মর্ম্মকথাকে আজ ব্যক্ত করিতে হইবে। যে গভীর ব্যঞ্জনা-সহযোগে সমগ্র ভারতে সমগ্র উচ্চ চিন্তা ও সাধনাকে ইতিহাস চিরকাল একই ছাঁচে ঢালিয়া আসিয়াছে, সেই জাতিত্বের ব্যঞ্জনাকে আজ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। আমাদের দেশের কাজের যে আজ ইহাই একটা প্রধান লক্ষ্য; কেন না, আধুনিক-যুগে জাতিত্বের (nationalismএর) অভিব্যক্তিই জীবনযাত্রায় পণের কড়ি। এ পণ না দিলে কোনও দেশই বাঁচিতে পারিবে কিনা বিষম সন্দেহ।

এই জাতিত্ব আমাদের ব্যক্ত করিতে হইবে, আর ইংরাজের জাতিত্ব ইংরাজ ব্যক্ত করিয়াছে। এই দুইটা জাতিত্ব বা nationalismএ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ত আছেই, তার উপর অবস্থারও প্রভেদ রহিয়াছে। উভয়ে প্রকৃতিতে বিলক্ষণ কেন, আগে তাহা অল্প কথায় বুঝিয়া দেখা যা'ক। একটা মানুষের মনুষ্যত্বে যেমন বিশেষ কোনও লক্ষ্যকে সে তাহার পরমপুরুষার্থ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং অন্যান্য সমস্ত সাধনার বিষয়কে সে সেই মূল-লক্ষ্যসাধনের অনুকূলে ও সহায়রূপে গ্রহণ করে, তেমনি একটা জাতি বা nationএর জাতিত্বে একটা পরমার্থ বা পরম-প্রয়োজন (supreme governing end) থাকে এবং সে অন্যান্য জাতীয় প্রয়োজন বা তাহাদের সাধনাকে সেই পরম-প্রয়োজনের অনুকূলে ও সহায়রূপে নিয়ন্ত্রিত করে। এই যে একটা দেশে সমষ্টিজীবনের সমস্ত প্রয়োজনের অঙ্গাঙ্গিভাবাত্মক সাধনা ও স্থিতি ইহাকেই জাতিত্ব বা nationalism বলে।

এখন ইংরাজের জাতিত্ব ও আমাদের জাতিত্বের প্রভেদ এই যে, যে পরম প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ইংরাজের জাতিত্ব বা nationalism গড়িয়া উঠিয়াছে, আমাদের ইতিহাস সে প্রয়োজনকে কখনও কার্য্যক্ষেত্রে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং করিবেও না; অতএব আমাদের জাতিত্ব সেরূপ পরম প্রয়োজনের সাধনাকে কেন্দ্ররূপে লাভ করিয়া কখনও গড়িয়া উঠিবে না বা আত্মপ্রকাশ করিবে না। জাতিত্ব বা nationalismএ যে প্রয়োজনের সাধনা কেন্দ্রস্থানীয়, সেই প্রয়োজনটী অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনের সার্থকতা, মূল্য, সাধনপ্রণালী প্রভৃতি

নিরূপিত করে। এই জন্য পরম প্রয়োজনের বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। জীবনের প্রত্যেক প্রয়োজনের সাধনায় সেই বৈশিষ্ট্যের একটা ছাপ থাকে। ইংরাজ পার্থিব জীবনের উৎকর্ষকে জাতীয় জীবনে পরমপুরুষার্থ, পরম প্রয়োজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল, কিন্তু ভারত যখনই একটা সমষ্টিভূত জীবন গড়িতে গিয়াছে, তখনই পরমার্থ বলিতে অন্য কিছু বুঝিয়াছে, পার্থিব জীবনকে একটা উপায় মাত্র বিবেচনা করিয়া অমৃতত্ব বা অপরিণামী জীবনকেই পরমপুরুষার্থ বা পরমপ্রয়োজন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইংরাজ ও ভারতের জাতিত্বের মধ্যে এই মৌলিক বৈলক্ষণ্য রহিয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে, উভয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়াও উভয়ের জাতিত্বের মিলন কতদূর সংঘটিত হইতে পারে।

ইংরাজের জাতিত্বের মত ভারতের জাতিত্বও যদি political nationalism হয়,—অর্থাৎ, উভয়েরই স্বদেশধর্ম্ম যদি রাজনীতি-মূলক হয়, তবে মিলন অসম্ভব। অষ্ট্রেলিয়া-ক্যানাডার দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে খাটে না; ইংরাজী প্রবাদে বলে—জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়। জীবনের মূলভাবে, শিক্ষায়, আত্মগৌরবে, ইতিহাসের এক বনিয়াদের মাহাত্ম্যে, রক্তে-মাংসে, নিতান্ত আপনার না হইলে রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় স্বপ্রতিষ্ঠ জাতি আর একটা অপ্রতিষ্ঠ জাতিকে আপনার সহিত এক করিয়া লইতে পারে না; কেন না, একটা আলাদা ইতিহাস ও মূলভাব লইয়া যে জাতিটা বাঁচিয়াছে ও বাঁচিতেছে, তাহাকে বিশ্বাস কি? আজ তাহাকে রাজনীতির মিলনসূত্রে বাঁধিয়া যথেষ্ট রাজনীতিক ক্ষমতা দিলে, সেই রাজনীতিক ক্ষমতারই স্বভাবধর্ম্মে কাল যে সে সেই

মিলনসূত্র ছিঁড়িয়া স্বাধীন হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? তাই বলিতেছি যে, রাজনীতিসূত্রে ইংরাজের সমকক্ষ একটা জাতিত্ব বা nationality লইয়া ভারত একদিন ইংরাজের সহিত মিলনে আবদ্ধ হইবে, এ আশা দুরাশা মাত্র। ভারতের ধাতেও সে দুরাশা নাই।

তবে রাজনীতিক সাম্যসূত্রে মিলন অসম্ভব হইলেও আরও গভীরতর আদানপ্রদানের যোগসূত্রে মিলন নিশ্চয়ই সম্ভব। যে পরম প্রয়োজনের সাধনা, যে আদর্শ লইয়া আমাদের দেশ বাঁচিয়া আছে ও গৌরবময় জাতিত্ব লাভ করিতে আজও বাঁচিয়া থাকিবে, সেই আদর্শসূত্রেই কেবল অন্যান্য দেশ ও জাতির সহিত তাহার অকৃত্রিম যোগাযোগ স্থাপিত হইতে পারে। এ দুনিয়ায় প্রাণের কথা লইয়াই মানুষে-মানুষে স্থায়ী সৌহৃদ্য হয়; স্বার্থপরতার মিলনসূত্র কয়দিন টিকে? রাজনীতি বা পলিটিক্স্ কি আজ ইউরোপের আন্তর্জাতিক মিলন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে? সেইজন্য ভারত ইংরাজের সহিত আরও গভীরতর যোগসূত্রে মিলিত হইতে চাহে। ইংরাজ আজ ভারতের রাজা, তাহার সে রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকুক। কেবল ভারতলক্ষ্মী ইংরাজকে যে রাজটীকা দিয়াছেন, ইংরাজ সেই রাজটীকার মর্য্যাদা রক্ষা করুক, তাহা হইলেই ভারতে তাহার সিংহাসন অচল থাকিবে। ভারতে রাজার ধর্ম্ম—ভারতীয় সর্ব্ববিধ সাধনায় "তত্ত্বাবধান ও বিদ্যাপসারণ।" যিনি সেই রাজার ধর্ম্ম ভারতে পালন করিবেন, ভারতে তাঁহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ভারতের রাজনীতি মানে ঐ রাজার ধর্ম্ম; ইংরাজের রাজনীতির অর্থ প্রজাশক্তির

দ্বারা রাজৈশ্বর্য্য ও রাজপ্রতিপত্তির সম্ভোগ। এই ইংরাজের রাজনীতির উপর দাঁড়াইয়া ইংরাজ ও আমাদের শিক্ষিত সমাজের বিবাদ বাঁধিয়াছে। আজ উভয়কেই ইংরাজের রাজনীতি হইতে ভারতের রাজনীতিতে ফিরিয়া আসিতে হইবে। তবেই সকলপক্ষে কল্যাণ ও শান্তি।

ভারতীয় রাজধর্ম্ম যদি ইংরাজ পালন করেন, তবে একদিকে রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার কর্তৃত্ব বজায় থাকিবে ও অপরদিকে আমাদের জাতিত্ব নির্ব্বিঘ্নে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমাদের nationalism রাজনীতি বা রাজনীতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করিয়া বর্দ্ধিত হয় নাই, হইতেও চাহে না এবং পারে না। পরমার্থের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচারই ঐ জাতিধর্ম্মের কেন্দ্রস্থানীয় এবং সেই কেন্দ্রীভূত প্রয়োজনের অনুরোধেই আর সমস্ত জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের সাধনা।' এ অবস্থায় রাজধর্ম্মরূপ প্রয়োজনের সাধনা যদি ইংরাজের উপরই সংন্যস্ত থাকে, তবে আমাদের জাতিত্বের অভিব্যক্তিতে ক্ষতি কি? বরং আধুনিক জগতে রাজশক্তিতে-রাজশক্তিতে যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবর্ত্তে ভারতকে সাক্ষাৎ-ভাবে যদি ঝাঁপ দিতে হইত, তাহা হইলে তাহার বিশিষ্ট জাতিত্বের সাধনা যে শুধু বিকৃত হইত তাহা নহে, সে সাধনার বিলোপ হইবার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। আমাদের রাজশক্তি ইংরাজের হাতে থাকায় আজ দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যে বাঁচিয়াও আমরা জগতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ততার পরিণাম দূর হইতে দেখিয়া প্রকৃত জাতীয় জীবনের শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছি।

অতএব ভারতে ইংরাজ রাজা ও আমরা প্রজা বলিয়া আমাদের প্রকৃত জাতিত্বের বিকাশে কোনও বিঘ্ন ঘটিতেছে না, কেবল বিঘ্ন ঘটে যদি ইংরাজ ভারতীয় রাজধর্ম্ম পালন না করেন ও আমরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম পালন না করি। ভারতীয় প্রজাধর্ম্ম কি—তাহা পূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। ভারতের প্রজা একরূপ সম্পূর্ণভাবেই গ্রামে বাস করে, আপনার গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে, ক্ষেত্রে ক্ষুধার অন্ন জন্মায়, নদী-পুষ্করণী-কূপে তৃষ্ণার জলের ব্যবস্থা করে, লজ্জানিবারণের বস্ত্র বুনে, ঘরের তৈজসপত্র নির্ম্মাণ করে, এবং দান-ধ্যানে, ধর্ম্ম-কর্ম্মে আর সমস্ত প্রয়োজন সাধনার সার্থকতা লাভ করে। ভারতীয় প্রজার এই সরল জীবনকাণ্ড আরও কত মহত্তর সাধনায় পল্লবিত ও পুষ্পিত হয় বটে, কিন্তু জীবনের আসল মূলসূত্রটী ভারতীয় প্রজা কখনও হারায় না,—দেশের কাজ দেশের লোকে করিবে তাহার জন্য রাজার দ্বারস্থ হইতে হইবে না ; আর সেই দেশের কাজ করাইবেন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ; রাজা কেবল সকলের স্বধর্ম্ম ও কর্ম্মের তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নাপসারণ করিবেন। এই তত্ত্বাবধান ও বিঘ্নপসারণ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার ব্যবস্থা-সরঞ্জাম ইংরাজরাজ গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু তাহার শাসনকার্য্যে আসল ভাবেই ভুল রহিয়া গিয়াছে এবং শিক্ষিত সমাজ ইংরাজের রাজনীতির দাবী করিয়া ও অপরদিকে ভারতীয় প্রজাধর্ম্মের অপলাপ করিয়া রাজা-প্রজার সম্বন্ধটীকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু এখনও সময় আছে। এখনও আমরা নিজেরা ভারতীয় প্রজাধর্ম্মে আগে ফিরিয়া, পরে ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিবার

জন্য ইংরাজ রাজসরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। কারণ, একমাত্র এই পথেই ইংলণ্ড ও ভারতের স্থায়ী মিলন সম্ভবপর, একমাত্র এই পথেই ভারতীয় প্রজাসাধারণ এক অখণ্ড দেশ এবং সেই দেশের এক ব্যাপক জাতীয় সাধনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাদের জাতিত্বকে জগতে ব্যক্ত করিতে পারেন। ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভারতীয় রাজধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেই অপূর্ব্ব জাতিত্বের অভিব্যক্তির যদি সহায় হয়, তবে সে কি তাহার সামান্য গৌরব!

এবার কথায় কথায় আলোচনা বাড়িয়া গেল। আগামীবারে সভাপতি মহাশয় যে কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহার কথা আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এবার অভিভাষণের মূল সূত্রগুলির বিচার হইল। সেই মূল সূত্রগুলি প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালীতে যথাযথ প্রয়োগ করা হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার বিষয়। সভাপতি মহাশয় যে সুর-লয়ে তাঁহার "বাঙ্গালার কথা" বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিলাম। আমরা দেখিলাম, সে সুর-লয় দুইটী কথায় ব্যক্ত হয়,—প্রথম, দেশের কাজ দেশের লোকই করিবে; রাজাকে দিয়া উহা করাইবার জন্য আর্জ্জি পেশ করা দেশের কাজ নহে। দ্বিতীয়, আমাদের একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে; সেই জাতিত্ব বজায় রাখিয়া ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে হইবে।

* * * *

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি, সভাপতির অভিভাষণের মূল কথা প্রকৃত দেশের কাজের প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করা। আমরা এতকাল 'পলিটিক্স' পড়িয়াছি ও 'পলিটিক্স' করিতে গিয়াছি,—

দেশের কাজ ভাল করিয়া বুঝিও নাই, করিতেও যাই নাই। এই বিষয় সভাপতি মহাশয়ের কয়েকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া এবারকার বক্তব্য আরম্ভ করিব :—"আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটী শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Burkeএর বুলি যাহা স্কুল-কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই। Gladstone-এর কথামৃত পান করি, আর মনে করি ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। Seelyর Expansion of England নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা-বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwickএর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি; ফরাসী স্কুল, জার্ম্মাণ স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে-কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে, একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের

তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়, বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা বক্তৃতা করিয়া, তর্ক করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধারকরা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না; বাঙ্গালার কথা, বাঙ্গালীর কথা ভাবি না; আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই; এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না।"

আমাদের দেশে বিলাতী পলিটিক্সের আমদানী করিয়া যে বিভ্রাট আমরা ঘটাইয়া তুলিয়াছি, সে সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়ের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। প্রথমেই আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ ছিল, আমাদের দেশে সনাতন একটা কিছু পলিটিক্স্ আছে কিনা। কিন্তু সে বিবেচনার অবসর হয় নাই। আমরা ইংরাজী পড়িয়া জীবনের যত বিভাগে "স্বদেশী"র আমদানী করিয়াছি, তন্মধ্যে এই রাজনৈতিক বিভাগের কথা এতকাল চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। আজ বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় যে বাঙ্গালার 'প্রাদেশিক সম্মিলনে' সভাপতি মহাশয় নিজেই "স্বদেশী পলিটিক্সে"র কথা তুলিয়াছেন। একটা স্বদেশী

পলিটিক্স্ কি আমাদের দেশে একেবারেই ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। সম্পূর্ণ পলিটিক্স-বিহীন হইয়া একটা দেশ কি এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? আর সে ত যে-সে বাঁচা নয়? জগতে আর কোনও দেশ এমন বিষম ঘটনাবিপর্য্যয়ের মধ্যে এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে, যে পলিটিক্সের ভিত্তির উপর আমাদের দেশ এতকাল বাঁচিয়া ছিল, সে ভিত্তির দৃঢ়তা অতি অসাধারণ, নিতান্তই আশ্চর্য্য। এ হেন স্বদেশী পলিটিক্স্ যে কি ছিল, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না;—আমরাই আবার দেশ-উদ্ধার করিতে যাই,—দুর্দ্দৈব!!

দেশের স্বচ্ছল গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা সমস্ত পলিটিক্সের কেন্দ্র-স্থানীয় ব্যাপার। এই মূলের ব্যবস্থা আগে নিষ্কণ্টক হইলে, তবেই একটা দেশের পলিটিক্স্ আর্থিক বা মানসিক উন্নতিরূপ নব নব উদ্যমে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। সুতরাং আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স্ কি ছিল, ইহার সন্ধান লইতে হইলে দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কি ছিল।

সব দেশেই পলিটিক্স্ এই গ্রাসাচ্ছাদনের এক একটা পাকা ব্যবস্থা গড়িয়া তুলে; কিন্তু সব দেশেই যে সে ব্যবস্থা একই রকমের হইবে এমন কোনও কথা নাই। পাশ্চাত্য পলিটিক্সে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার ব্যবস্থাপক হইলেন 'ষ্টেট্' বা রাজশক্তি। সেখানে রাজসরকার চাষাকে চাষ করায়, তাঁতিকে তাঁত বুনায়' কারিগর ও ব্যবসায়ীকে নিজ নিজ ব্যবসায়ে নিয়োজিত রাখে। সেখানে চাষার ক্ষেতের কথা, তাঁতির তাঁতের কথা, কারিগরের যন্ত্রাদির কথা, ব্যবসায়ীর ব্যবসার কথা, রাজসরকারের মাথার

রাত-দিন ঘুরিতেছে, এবং পদে পদে তাহাদের যে সব খুঁটিনাটির দরকার, সে সমস্ত রাজসরকার আইন-কানুন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছে। দৈবাৎ যদি পাশ্চাত্যের রাজসরকার চক্ষু উল্‌টাইলেন, তবে সমস্ত দেশের কাজে, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক সমস্ত ব্যাপারে এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত হইল। রাজশক্তি অনাময় না থাকিলেই পাশ্চাত্যের প্রজাজীবন বিঘ্ন ও অনিশ্চয়তার লীলাভূমি হইয়া উঠে। এইভাবে দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজসরকারের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের যদি এইরূপ প্রকৃতি হইত, তবে এ দেশে হাজার-হাজার রাজরাজড়ার উত্থান-পতন ও ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেও দেশের প্রজা এতকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। এতকাল যে তাহারা নিঃশব্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছে ও দেশ এবং দেশের বড় বড় আদর্শকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান রাজসরকারে বা রাজধর্ম্মে কথনও নিহিত ছিল না, নিহিত ছিল—প্রজাধর্ম্মে। রাজার নিয়োগে, রাজার প্রেরণায়, দেশের প্রজা আমাদের দেশের গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত এতকাল চালায় নাই। সে বন্দোবস্ত এতকাল নির্ভর করিয়াছে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর,—প্রজাধর্ম্মের উপর। বহুপুরাকাল হইতে আমাদের দেশে কিরূপে এই অদ্ভুত প্রজাধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়া ছিল, কিরূপে আপনার মহিমায় এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একটা ইতিহাসের আলোচনা করা এ স্থানে সম্ভবপর নহে। অবসর ঘটে ত পরে সে কথার আলোচনা করিব। কিন্তু এই প্রজাধর্ম্মের মহিমার উপর যে আমাদের

স্বদেশী পলিটিক্স্ প্রতিষ্ঠিত এবং রাজধর্ম্মের মহিমার উপর পাশ্চাত্য পলিটিক্স্ প্রতিষ্ঠিত, এই মূলতত্ত্বটী হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের শিক্ষিত-সমাজের পক্ষে আজ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সে রাজধর্ম্মের যে একটা স্থান নাই, সে কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু সে স্থান—আমাদের পলিটিক্সের মর্ম্মস্থান নহে,—আমাদের দেশের মরণকাটি-বাঁচনকাটি সে স্থানে রক্ষিত হয় নাই। আমাদের দেশে রাজা যদি তাহার রাজধর্ম্ম পালন না করেন, তবে কালে প্রজাধর্ম্মে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়,—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে মারাত্মক বিঘ্নগুলির নিরাসন করিবার জন্য প্রজাধর্ম্ম আপনাকে সম্প্রসারিত করিয়াছে, গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ নানা রকম ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছে। আসল কথা এই যে, আমাদের দেশের পলিটিক্সের জীবনকেন্দ্র প্রজারা চিরকালই নিজের হাতে রাখিয়া আসিয়াছে। প্রজাধর্ম্মের এই আত্মনির্ভরের ভিত্তি আর কোনও দেশের পলিটিক্সের দেখা যায় না। এমন কি আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে প্রজারা যে আত্মনির্ভর প্রকাশ করে, সে আত্মনির্ভরের উদ্দেশ্য—রাজার রাজধর্ম্মকে আত্মসাৎ করা; রাজধর্ম্মটী আগেই আশ্রয় না করিলে সে সব দেশের প্রজা প্রজাধর্ম্মের স্থিতি ও উৎকর্ষ সংসাধিত করিতে পারে না। কিন্তু ভারতের প্রজা রাজধর্ম্মকে আশ্রয় বা আত্মসাৎ না করিয়াও, আপনাদের সনাতন প্রজাধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। পাশ্চাত্যে রাজশক্তির কল্যাণে প্রজাধর্ম্ম বাঁচে, ভারতে আপনার কল্যাণেই প্রজাধর্ম্ম আপনি বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

ভারতীয় পলিটিক্স্ ও পাশ্চাত্য পলিটিক্সের প্রকৃতিতে ত এই প্রভেদ আছেই, তা'ছাড়া আদর্শেও আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে ক্রমশঃ গগনস্পর্শী করিয়া তোলা, ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ ঐহিক প্রতিপত্তিকে আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠার উপর মাথাতুলিতে না দেওয়া। প্রজাশক্তির প্রয়োগে ঐহিক প্রতিপত্তিকে যে দেশ যতই বাড়াইতে চাহিবে, সে ততই বাড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহা একটা অবিসম্বাদী সত্য যে, ঐহিক ঐশ্বর্য্যকে যদি স্বেচ্ছামত বাড়িতে দেওয়া হয়, তবে দেশের আধ্যাত্মিক সম্পদ্ অনিবার্য্যরূপে খর্ব্ব হইতে থাকে। কাঞ্চন-দেবতার স্বভাবই যে এইরূপ, তাহা আধুনিক দেশসমূহ কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে ক্রমশঃ দেখিবার বিষয় বটে; কিন্তু ভারতীয় সমাজস্রষ্টারা এ সত্য বহুকাল পূর্ব্বেই অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য যে আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে দিলে ভারতীয় প্রজাশক্তির হৃদয়ে ঐহিক সমৃদ্ধির অনুসরণে মাদকতা সঞ্চারিত হইবে, সেইরূপ পলিটিক্সের পথে তাঁহারা দেশের প্রজাধর্ম্মকে দাঁড় করাইয়া যান নাই। কাজে-কাজেই ভারতীয় পলিটিক্সের মধ্যে ঐহিক সম্পদ্ ও শক্তির কোনও উচ্চাশা-বীজ নিহিত নাই। এ আশা ভারতীয় প্রজা কখনও পোষণ করিতে শিখে নাই যে—একদিন তাহারা রাজশক্তিকে আত্মসাৎ করিয়া এমন রাজৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইবে যে, অপরাপর দেশের রাজৈশ্বর্য্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু এ রকম একটা রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিবার আশা এ দেশের এ প্রজাসাধারণের মনে না থাকিলেও,

আর একরকম একটা বৈশিষ্ট্য এ জগতে লাভ করিবার জন্য ও প্রকাশ করিবার জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতেই তাহারা যেন যজ্ঞদীক্ষিত হইয়া বাঁচিয়া আছে। পরমার্থসাধনার ক্ষেত্রেই সেই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ও পর্য্যবসান। কোনরূপ রাজনৈতিক বিশেষত্ব যে এ বিশেষত্বের চেয়ে শ্লাঘনীয় নহে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভারতের এই জাতীয় লক্ষ্যের ধারণা যতই আমাদের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে, ততই আমরা বুঝিতে পারিব—ভারতীয় পলিটিক্সের আদর্শ কিরূপ, এবং কেনই বা উহা ঐরূপ। জগতে ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ সংরক্ষণ ও প্রচার করা যাহার জীবনব্রত, ঘোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে নামিয়া সাধারণ রেষারেষিতে যোগদান করা তাহার শোভা পায় না, তাহার স্বধর্ম্মানুকূলও নহে। সমগ্র মানবের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও আনুকূল্যে জাতীয় জীবন গঠন করা কিরূপে হইতে পারে,—যাহাকে এ শিক্ষা জগতে প্রচার করিতে হইবে, তাহার পক্ষে আধুনিক ভ্রান্ত-জাতীয়তামূলক রাজনীতির আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিবেশে অবতীর্ণ হওয়া শুধু বিসদৃশ নহে, অসম্ভব। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জগতে শিখায়।" শুধু ফাঁকা মুখের কথায় যদি জগতে উচ্চ নৈতিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রচার করা চলিত, তবে আধুনিক পাশ্চাত্য নেশনদের সে সম্বন্ধে কোনও ত্রুটি ছিল না!

যদি আপত্তি উঠে যে, আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার আসরে না নামিলে বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা,—জাতিত্ব বা নেশনত্ব ত দূরের কথা,—তবে আবার বলিব যে, আমরা যদি আমাদের

ভারতীয় পলিটিক্সকে স্বগৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, যদি আমাদের প্রাচীন প্রজাধর্ম্ম আবার ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া উঠে ও ইংরাজের ভারতীয় রাজনীতিকে আমাদের রাজধর্ম্মে পরিণত করে, তাহা হইলে আমরা বাঁচিব ত নিশ্চয়ই, উপরন্তু জগতের আধুনিক রাজনীতির নেপথ্যে যে ভারতীয় জাতিত্ব বা নেশনত্ব সমগ্র ভারতেতিহাসের একমাত্র তাৎপর্য্য ও লক্ষ্য, তাহার প্রতিষ্ঠাও সম্ভাবিত হইবে। এই নেপথ্য আজ নেপথ্যরূপে প্রতিভাত বটে, কিন্তু রাজনীতির আসরে আজ যে আগুন লাগিয়াছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আজ যাহা নেপথ্য কাল তাহা আর নেপথ্য থাকিবে না। যে আসরে বিধাতা আজ স্বহস্তে অগ্নিসংযোগ করিয়াছেন, যে আসরের অন্তরালে আমাদের সনাতন জাতিধর্ম্মকে নূতন মহিমায় সঞ্জীবিত করিবার জন্য বিধাতা ইংরাজ-রাজনীতিকে প্রাচীররূপে ব্যবহার করিতেছেন, সে আসরের প্রাধান্য যে জগতের জীবন-রঙ্গমঞ্চে আর বেশী দিন টিকিবে না, একথা চক্ষুষ্মানের আর বুঝিতে বাকি নাই। অতএব আজ পাশ্চাত্য পলিটিক্সের আদর্শে মুগ্ধ না হইয়া ভারতীয় পলিটিক্সে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের নিকট বিধাতার আহ্বান ঘোষিত হইতেছে।

* * * *

"বাঙ্গলার কথা"র উপর এ পর্য্যন্ত যে সব কথার অবতারণা করা হইল, সমস্তই উহার তত্ত্বাঙ্গের প্রসঙ্গে; এইবার "বাঙ্গলার কথা"র সাধনাঙ্গের আলোচনা করিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

কিন্তু "বাঙ্গার কথায়" আরও দুইটী তত্ত্বকথার সদ্বিচার

আছে,—একটী পাশ্চাত্য Industrialism সম্বন্ধে ও দ্বিতীয়টী আমাদের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে। এ দুইটীই বা থাকে কেন? সেইজন্য এই দুইটী প্রসঙ্গও যথাস্থানে থাকিবে।

পাশ্চাত্য Industrialism বা শিল্প-বাণিজ্য-নীতি পাশ্চাত্য পলিটিক্সের একটী অনিবার্য্য পরিণাম। জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে মানুষের যে পার্থিব জীবন, তাহার নানা আসবাব-সরঞ্জাম মানুষ যতই বাড়াইতে চাহিবে, ততই তাহারা বাড়িয়া যাইতে পারে। আর ওদিকে ঐ পার্থিব জীবনের প্রতিপত্তিই পাশ্চাত্য পলিটিক্সের লক্ষ্য। সুতরাং পাশ্চাত্য পলিটিক্স্ ও পাশ্চাত্য Industrialism একই সুর-লয়ে বাঁধা রহিয়াছে। একটীকে গ্রহণ করিলে আর একটী অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কিন্তু, পাশ্চাত্য পলিটিক্সকে সাদরে গ্রহণ করিব, অথচ পাশ্চাত্য Industrialismকে অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করিব, এমন অসম্ভব ব্যাপার কোন দেশেই সম্ভবপর হইবে না। সেইজন্য পাশ্চাত্য পলিটিক্সের উৎসাহে আগুন ছুটাইয়া দিয়া দেশের মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ের দিকে ফিরিয়া চাওয়া স্বদেশী আন্দোলনের সময় সম্ভবপর হয় নাই। আজও যে হইবে না, তাহা যত শীঘ্র আমরা বুঝি, ততই মঙ্গল।

শিল্প-বাণিজ্যের নীতি আমাদের দেশে কিরূপ হইবে, তাহা আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স্ নিঃসংশয়ে নির্ণয় করিয়া দিতে পারে। স্বদেশী পলিটিক্সের আদর্শ ও প্রকৃতি আমরা সুস্পষ্টভাবে বিচার করিয়া দেখিয়াছি। যে নীতিতে বলে, পার্থিব জীবনের নানা আসবাব-সরঞ্জাম যথাসম্ভব বাড়াইয়া যাও, সে নীতির সঙ্গে আমাদের পলিটিক্সের কখনও খাপ খাইতে পারে না। দেশের

সমষ্টিজীবন যাহাতে ভোগবিলাসের মোহে আকৃষ্ট না হয়, তাহাই স্বদেশী পলিটিক্সের একটী উদ্দেশ্য। সেইজন্য পাশ্চাত্যে যেমন রাজৈশ্বর্য্য সমষ্টিজীবনের বনিয়াদ বলিয়া স্বীকৃত, আমাদের দেশে সেইরূপ সাধারণ চাষীর জীবনকে সমষ্টিজীবনের বনিয়াদরূপে আশ্রয় করিয়া স্বদেশী পলিটিক্সের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। সাদাসিদা গ্রাসাচ্ছাদনে স্বচ্ছলতাই আমাদের দেশের আর্থনীতির সনাতন ভিত্তি। সেই সাধারণ ভিত্তির উপর ব্যক্তিগতভাবে যেখানে যেরূপ ঐশ্বর্য্যঘটা ঘটিতে পারে ঘটুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সমস্ত দেশটা ধন-মদমত্ততায় স্ফীত হইয়া অপরাপর দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ধাবমান হইবে, এমন অর্থনীতির আদর্শ আমাদের পলিটিক্সে স্থান পাইতে পারে না। ঠিক এইরূপ মত্ততা ও প্রতিযোগিতা পাশ্চাত্য Industrialismএর জনক-জনয়িত্রী। অতএব সম্মিলনের সভাপতি-মহাশয় পাশ্চাত্য Industrialismএর পরিহার্য্যতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা সমর্থন করি। কিন্তু সহজেই মনে প্রশ্ন উঠে যে—পাশ্চাত্যের শিল্প-বাণিজ্য-নীতি আমরা যদি আজ অবলম্বন না করি, তবে পাশ্চাত্যের প্রতিযোগিতা অতি সহজেই পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে আমাদিগকে মুছিয়া ফেলিবে। পলিটিক্সে, ব্যবসা-বাণিজ্যে পাশ্চাত্য আজ যে প্রতিযোগিতার ধূয়া তুলিয়াছে, তাহাতে সমগ্র জগৎকে যোগদান করিতেই হইবে; যে দেশ যোগদান করিবে না, তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। এই সার্ব্বজনীন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার আহ্বানস্বরূপ বিধাতা ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং এই ইংরাজী আমলে প্রতিযোগিতা এড়ান অসম্ভব।

প্রাদেশিক সম্মিলনে "বাঙ্গালার কথা।"

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ইংরাজ ভারতে রাজশক্তির আসনই গ্রহণ করায় জগতের রাজনীতিক প্রতিযোগিতার বর্ত্তমান ভীষণ খাণ্ডবদাহ ও হলাহল হইতে আমরা নেপথ্যে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি। বিধাতার অভিপ্রায় লইয়া যদি কথা উঠে তবে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান যুগের তুমুল রাজনীতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারত যাহাতে নানা নেশনের মারামারি-কাড়াকাড়ির লীলাক্ষেত্রে পরিণত না হয়, সেই জন্যই ভারতকে ইংরাজের রাজনীতিক অধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আর পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ভারতের জাতীয় জীবন এমনভাবে গঠিত হয় নাই, যাহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে বিদেশীকে রাজার আসনে বসাইলেই সেই জাতীয়-জীবনের মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া উঠে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—গল্পে যেমন এক একটা রাক্ষসীর প্রাণ কোন গুপ্ত কৌটায় রক্ষিত হয়, সেইরূপ আমাদের দেশের প্রাণ ধর্ম্মরূপ কৌটার মধ্যে রক্ষিত আছে। যতদিন এই ধর্ম্মের উপর,—প্রজার স্বধর্ম্মের উপর, সমাজের স্বধর্ম্মের উপর,—আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত না পড়িবে, ততদিন আমাদের দেশের মৃত্যু নাই। আমাদের মরণ-বাঁচনের কাটি রাজনীতিরূপ পেটিকায় রক্ষিত হয় নাই, যেমন অন্যান্য দেশে হইয়াছে,—হইলে, রাজনীতিক অধীনতা আমাদের পক্ষে মারাত্মক হইয়া উঠিত। তবে যে আজ অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের চাপে মৃত্যু আসন্ন বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার মূল কারণ এই যে—আমরা আমাদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, স্বদেশী পলিটিক্সের বর্জ্জন করিয়া বিদেশী পলিটিক্সের

প্রবল রীতিতে "ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ" হইতেছি। প্রত্যেক দেশে একটা-না-একটা পলিটিক্স্ ত চালাইতেই হইবে;—আমরা যখন আমাদের দেশের প্রজাধর্ম্মমূলক পলিটিক্স্ দেশে চালাইলাম না, তখন ইংরাজ আপনার বিদেশী পলিটিক্স্ কেন না চালাইবে? তোমার ঘরের পলিটিক্স্ তুমি তোমার ঘরে চালাইলে না, বাহিরের পলিটিক্স্ ইংরাজ কেন না চালাইবে? আর সেই বাহিরের পলিটিক্স্ তুমি যে আদর ক'রে, আবদার ক'রে, নিজের অন্দরমহলে ঢুকাইতেছ, পল্লীবাসী প্রজার জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত ব্যবস্থার দায় পর্য্যন্ত ইংরাজরাজের ঘাড়ে পদে পদে চাপাইতেছ! তোমার স্বধর্ম্মের উপর আততায়ীর হাত কে আগে উঠাইয়াছে?

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রধানতঃ আমরা নিজেরাই পাশ্চাত্য প্রতিযোগিতাকে ডাকিয়া আনিয়াছি। 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' যতটা অত্যাচারের জোরে এ দেশে পাশ্চাত্য ব্যবসা-বাণিজ্য ঢুকাইয়া দিতেছিল, তার চেয়ে ঢের বেশী ব্যভিচারের জোরে ইংরাজীশিক্ষিত-সম্প্রদায় এ দেশে বিদেশী ব্যবসাবাণিজ্য ঢুকাইয়া দিয়াছেন। একদিকে পূর্ব্বপক্ষ যদিও কারিগরের আঙ্গুল কাটিয়া থাকে, অপরদিকে উত্তরপক্ষ দেশশুদ্ধ কারিগরদের মুখের গ্রাস কাড়িতেছিল। আমাদেরই বাবুয়ানার জন্য গ্রামে গ্রামে শিল্পকারিগর উদরান্নের দায়ে কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে ভাগ বসাইতে ছুটিয়াছে, চাষের জমি দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলিয়াছে, অথবা সহরে আসিয়া বিদেশী উপকরণে নূতন কারিগরী ফাঁদিয়া বসিয়াছে। এ সমস্ত ব্যাপার ত এখনও চক্ষের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় এখনও যায় নাই।

এখন, হায়! পরণের কাপড়টী পর্য্যন্ত যোগাইবার জন্ম মাঞ্চেষ্টার বা জাপানের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। দেশে ঘরে ঘরে যে সূতা কাটা হইত, সে সূতার কাপড়ে সহরে বাবুয়ানা চলে না; কিন্তু গ্রামে ফিরিয়া গিয়া বাবু হওয়া কি চলে? যাহাদের না হয় গ্রামে একটা মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের সংস্থান আছে, তা'রা অনায়াসেই ত প্রত্যাবর্ত্তনের পালা সুরু করিয়া দিতে পারেন? গ্রাম্য তাঁতির কাপড়ের ক্রেতা যদি এক্ষেত্রে দলে দলে আবির্ভূত হইতে থাকেন, তবে নিশ্চয়ই কাল তূলার চাষ আরম্ভ হইবে, চরকা ঘুরিতে আরম্ভ হইবে, তাঁত চলিতে থাকিবে। ক্রেতার আবির্ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব ও উৎকর্ষ। দেশে কাপড়ের যে সব কল-কারখানা হইয়াছে, তাহারা সহুরে বাবুদের কাপড় যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট। কিন্তু গ্রাম্যপথের ধারে যে সমস্ত দেশটা পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাচীন হাল-চাল আজ আবার প্রবর্ত্তিত না করিলে তাহার কাপড় জুটিবে কি উপায়ে? নির্লজ্জভাবে আজ আমরা কি জাপানের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া বসিয়া থাকিব এবং ক্ষণে ক্ষণে বিদেশী পলিটিক্সের শোভাযাত্রায় নাচিতে ও দেশশুদ্ধ লোককে নাচাইতে ছুটিব?

আজ পরণের কাপড়কে উপলক্ষ করিয়া একটা মস্ত সুযোগ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। স্বদেশবুদ্ধি, স্বদেশীবুদ্ধি আজ যাহার প্রকৃতভাবে জাগিয়াছে,—যে আসরে আজ কেবল রাজসরকারকে লইয়া মান-অভিমানের পালা চলিয়াছে, সে আসর থেকে সে প্রকৃত দেশের কাজের আসরে ছুটিয়া যাইবে। সে বুঝিবে—যে দেশী

'হোমরুলে'র মধুমক্ষিকা বহু শতাব্দী ধরিয়া গ্রামে গ্রামে গ্রাসাচ্ছাদনের মধুসংগ্রহ করিয়াছিল, সে মধুমক্ষিকাকে অবজ্ঞায় মরিতে দিয়া বিদেশী 'হোমরুলে'র সোণার ভীমরুলের পশ্চাতে ছুটা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। দেশের লোকে করিয়া দেশের পরণের কাপড়টা যদি আজ যোগাইতে পারি, তবে খুব ক্ষীণ হইলেও সত্যিকার 'হোমরুলে'র সামান্য একটা আস্বাদ পাওয়া যাইবে। এই আস্বাদ পাইবার জন্য কাহারও প্রাণ কি পাগল হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে নগরে-নগরে হাজার-হাজার 'হোমরুলার' সঙ্ঘের তালিকায় নাম দস্তখৎ করিলেও বলিব,—"হে ভারত, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!"

প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি সে দিন দেশের লোককে ডাকিয়া বলিয়াছেন—"আমাদের লুপ্ত ব্যবসাবাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় Industrialismকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্যতা দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি-কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে তাহাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয় তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয় সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেই-জন্য জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।"

কি যে করিতে হইবে, তাহা এর চেয়ে বিশদরূপে আপাততঃ বুঝাইবার ত আবশ্যক দেখিতেছি না। কিন্তু, কে করিবে,—এই প্রশ্নের উত্তরে সভাপতি মহাশয় একটা কার্য্যপ্রণালীর বিবরণ দিয়াছেন। সেটাও এই সঙ্গে আমরা উদ্ধৃত করি;—যথা:—

"প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ২০টী কি ২৫টী পল্লীসমাজ থাকিবে; এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচজন পঞ্চায়েৎ ব্যতীত, জেলাসমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটী পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলাসমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলাসমাজ——

(১) সেই জেলাভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষাদীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী তাহার শিক্ষাদীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীরশিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলাসমিতির অধীনে থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোট-খাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

(৬) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলা-সমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার সাধারণ পুলিশের ভার জেলাসমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, তাহা জেলাসমাজের হাতে থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণ হাইকোর্টের অধীন থাকিবে।

(৯) এই জেলাসমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুইশত হইতে পাঁচশত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলাসমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অর্থের সুবিধার জন্য একটী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটী একটী করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে। এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লীসমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলাসমাজ ও পল্লীসমাজের সকল কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলা-সমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্য-কীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে তাহা বন্ধ দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে সব ক্ষমতা আছে তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলাসমাজসমূহকে বঙ্গীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

সভাপতি মহাশয় এই যে কার্য্যের তালিকা ও কার্য্যের প্রণালী উপস্থাপিত করিয়াছেন, ইহাকে দুইটী ভাগে বিভক্ত করা যায়,—এক ভাগে "কি করিতে হইবে" তাহাই শুধু বলা হইয়াছে, আর এক ভাগে "কে করিবে" তাহাই দেখান হইয়াছে। কি করিতে হইবে,—এই অংশের, অর্থাৎ ইতিকর্ত্তব্য-তার মূলকথা—পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। পল্লীগ্রাম থেকে সমস্ত দেশটাকে গড়িয়া তুলিবার কথা যে আজ উঠিয়াছে, ইহা 'লাখো কথার এক কথা।' ইহাতে ভারতীয় সমস্ত সমস্যার যেন মূলবস্তুটী আমাদের করতলগত হইয়াছে। 'যাহা নাই

ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।' আমাদের সমষ্টিজীবনের পল্লী-গ্রামরূপ মর্ম্মস্থলে যে প্রশ্নের মীমাংসা হইল না, সে প্রশ্নের মীমাংসা সমগ্র ভারতে হইবার নহে। এই মর্ম্মস্থল হইতে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে, বাহিরে বাহিরে একটা ধার-করা চক্‌চকে হোমরুলের খোলস পরাইয়া দিলেই জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিল না।

পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিলেই পল্লীজীবনের সমস্ত অঙ্গের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বুঝায়। পল্লীতে পল্লীতে কৃষি, শিল্প, কারবার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজধর্ম্মের মূলপত্তন করা চাই। এই মূলপত্তন প্রত্যেক পল্লীবাসীর ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে, আইনের জোরজবরদস্তির উপর নহে; কারণ, ইহাই আমাদের দেশের সনাতন প্রথা। পল্লীবাসীর এই যুগযুগান্তের ধর্ম্মবুদ্ধিকে উদ্বোধিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য লোকসেবায় উৎসৃষ্টজীবন, পল্লীবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধাভাজন, ধর্ম্মশিক্ষাদাতৃগণের আবির্ভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সেইজন্য দেশে আজ সাধু ও সাধু-কল্প সেবকসম্প্রদায়ের অভাব হইবে না। প্রত্যেক পল্লীসমাজে কোনও একটা ঠাকুরবাড়ী, কোনও একটা বারোয়ারিতলা, হরিসভা বা চণ্ডীতলা প্রভৃতি সৎশিক্ষার আড্ডা স্থাপন করা খুবই সহজসাধ্য। গ্রামে গ্রামে এই সমস্ত আড্ডা ধমনীসংযোগের মত সৎশিক্ষা, সৎপরামর্শ, কর্ত্তব্যনির্ণয় প্রভৃতি আবশ্যকীয় চিন্তা ও সাধনার সঞ্চার করিয়া দিবে,—পল্লীর পঞ্চায়েৎ, মোড়ল প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে,—পল্লীসমাজ গড়িয়া তুলিবে। সঙ্গে-সঙ্গে সেই পল্লীসমাজ জেলাসমাজ নির্ব্বাচিত করিবে। অতএব

গোড়াথেকেই স্থির হইল, দেশের কাজ করিবে দেশের সাধারণ লোক,—চাষী, শিল্পী, কারিগর, ব্যবসায়ী, ভদ্রলোক প্রভৃতি, এবং দেশের কাজ করাইবে দেশের ধর্ম্মশিক্ষক-সম্প্রদায়।

তারপর, পল্লীজীবনে পুলিশের কাজ, আইন আদালতের কাজের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশের সাধারণ লোক যখন দেশের কাজের "কাজি" হইবে, তখন এই সকল রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহাদের বিরোধ হওয়ার কোনও কারণ দেখি না। রামকৃষ্ণমিশন প্রভৃতি লোকসেবক-সম্প্রদায় যখন দেশে দেশে দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেশের কাজে অগ্রসর হইয়াছেন, তখন রাজকর্ম্মচারীদের সহিত তাহাদের একযোগে কার্য্য করিতে হইয়াছে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের কাজে যতক্ষণ আমরা ইংরাজের রাজপ্রতিপত্তির বিরোধী ভাব পোষণ না করি, ততক্ষণ রাজকর্ম্মচারীদের সহিত কোনরূপ বিরোধ দূরে থাকুক, কোনও সন্দেহমূলক কুব্যবহারেরও অবকাশ থাকে না। বরং পরস্পরের সহায়তা ও সহযোগিতার ফলে দেশের কাজ সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া যায়। দেশের লোক দেশের কাজে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলে, পুলিশ ও রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্যসাধনে সহজেই সুশৃঙ্খলা ও বাস্তবতা বাড়িয়া যাইবে। তখন রাজসরকারের বিঘ্নাপসারণ, সুবিধাবিধান ও তত্ত্বাবধান প্রভৃতি কর্ত্তব্যসাধনের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজের একটা অব্যর্থ সংযোগ গড়িয়া উঠিবে। সে অবস্থায় দেশের লোকের দেশের কাজের উপর সরকারী পূর্ত্ত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, প্রভৃতি

বিভিন্ন-বিভাগীয় কর্ম্মের স্থায়ী ভিত্তি স্থাপিত হইবে। আর যদিই বা কোনও ক্ষেত্রে রাজকীয় কোনও বিভাগের সহিত দেশের লোকের দেশের কাজে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটে, তবে জেলা-সমাজ হইতে নির্ব্বাচিত লোকপ্রতিনিধিগণ রাজসভায় সেই অসামঞ্জস্যের প্রতি সেই রাজকীয় বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন। সে ত আর তখন কেবল ফাঁকা রাজনীতিক অধিকারের দাবী-দাওয়া নহে যে, বাগাড়ম্বরের ধূম্রবাহুল্যে একটা হৃদ্‌কণ্ডুয়নের সহজে নিবৃত্তি হইয়া যাইবে; সে যে কর্ম্মব্রতধারী, স্বধর্ম্মৈকপ্রাণ প্রজাবৃন্দের ব্যক্ত অভিযোগ; সে যে কাজের কথা, মুখের কথা নহে; সে কথা কোনও চক্ষুষ্মান্ চাপা দেন না, উড়াইয়া দেন না। গবর্ণমেণ্ট ত দিবেনই না;—কেন না, প্রজা যে তখন নিজের দেশের কাজের উপর সরকারী বিভাগের সমস্ত কর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করাইয়া লইয়াছে। তখন দেশের লোক 'কৌন্সিল' প্রভৃতিতে যে প্রতিনিধি পাঠাইবেন, সে প্রতিনিধিগণ সত্য সত্যই তাহাদের প্রতিনিধি, তাহাদের দৈনন্দিন কর্ম্মজীবনের সহিত, তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক আশা ও উদ্যমের সহিত এই প্রতিনিধিদের একটা বাস্তব যোগাযোগ থাকিবে। তখন আমাদের সমষ্টিজীবন কেবল একটা আশার কথা নহে, একটা কল্পিত আদর্শ নহে, তখন উহা একটা প্রত্যক্ষ বস্তুতন্ত্র সত্তা। যতদিন না দেশের জীবনে এই বস্তুতন্ত্রতার আবির্ভাব হয়, ততদিন বিলাতেই বল আর এদেশেই বল আমাদের প্রজাপ্রতি-নিধিগণ কেবলমাত্র আমাদের আশার দূত, আশার শক্তিতে শক্তিমান,—সে শক্তি ইংরাজ রাজার কর্ম্মশক্তির সম্মুখে বেশীভাগই নিস্ফল প্রয়াসে পর্য্যবসিত হইবে। অলস প্রার্থীর আশাশক্তি কর্ম্মীর

কর্ম্মশক্তির সম্মুখে কি আর শ্রদ্ধা পাইবে ? বাচনিক শ্রদ্ধায় কি কাজ হয়,—কথায় কি চিড়ে ভেজে ?

সহজেই বুঝা যায়, দেশের কাজের যে ব্যবস্থার কথা আমরা বলিতেছি, তাহার সহিত সম্মিলনের সভাপতি মহাশয়ের ব্যবস্থার একটা প্রকাণ্ড গরমিল আছে। দেশের কাজ যে কি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে মিল আছে ; কে যে করিবে, সে সম্বন্ধেও মিল আছে বলা যায় ; কিন্তু দেশের কাজ কে করাইবে, এ সম্বন্ধে একটা মস্ত মতভেদ রহিয়াছে। দেশের কাজে একটা প্রেরণা চাই, একটা বিধিবত্তা চাই। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন, সে বিধিবত্তা রাজসরকারের আইন-কানুনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কার্য্যপ্রণালীর ১৪ দফায় তিনি স্পষ্টই এ কথা বলিয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, দেশের কাজের সমস্ত প্রেরণা, সমস্ত বিধিবত্তা, আমাদের সনাতন প্রথানুসারে প্রজার ধর্ম্মবুদ্ধির উপর নির্ভর করিবে ; গ্রামে-গ্রামে ধর্ম্মশিক্ষকগণ তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশের কাজ করাইবেন। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি—আমাদের স্বদেশী পলিটিক্স্ চিরকালই এইরূপ প্রজাধর্ম্মমূলক। রাজা কিছু করিয়া দেন না, গড়িয়া দেন না,—কেবল বিঘ্নাপসারণ করেন, তত্ত্বাবধান করেন। প্রজা গড়িয়া তুলে, রাজা বজায় রাখে। আমাদের স্বদেশী পলিটিক্সের এই প্রাণধর্ম্মটীর অপলাপ করিলেই স্বদেশী পলিটিক্স্ বিদেশী পলিটিক্সে পরিণত হইবে। রাজাকে আইন-কানুন করাইয়া যদি প্রজাকে দেশের কাজ করিতে বাধ্য করিতে হইল, তাহা হইলে আগেই রাজার দরবারে আইন-কানুনের একটা আবেদনপত্র লইয়া ছুটিতে হয়। রাজাকে দরখাস্ত প্রভৃতির দ্বারা দেশের কাজে আগে

না নামাইতে পারিলে, প্রজার কাছে দেশের কাজের জন্য যাওয়া নিষ্ফল হইল। এই রাজসরকারের শক্তিদ্বারা দেশের কাজের পত্তন ও উন্নতি করার নামই বিদেশী পলিটিক্স্। সভাপতি-মহাশয়ের কার্য্যপ্রণালীর প্রস্তাবে অকস্মাৎ এই একটা গলদ ঢুকিয়া গিয়াছে।

মহাজনের হাত থেকে প্রজাকে উদ্ধার করিবার জন্য 'ব্যাঙ্ক' খুলিতে হইলে, অথবা কোন বিশেষ প্রয়োজনে ট্যাক্স বা চাঁদা তুলিতে হইলে, যদি উপস্থিত কোনও বিশেষ আইনের সাহায্য লইতে হয়—সে আলাদা কথা। ঐরূপ ব্যাঙ্ক না থাকুক, এখনও জায়গায় জায়গায় 'লোন্'-আফিস আছে; ট্যাক্স না থাকুক, চাঁদা বা বারোয়ারীর বা ধর্ম্মার্থের টাকা আদায় করা এখনও চলে। এ সমস্ত বিষয়ে প্রচলিত আইনের সাহায্যেই কাজ চলে। ব্যাঙ্ক বা ট্যাক্স প্রভৃতি ইংরাজী নাম গ্রহণ করিলেই কি সরকারী নূতন আইন-কানুনের কথা মনে পড়িবে?

তারপর সরকারী পুলিশ বা লোকাল ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রহিতকরণ, অথবা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা সঙ্কোচন ইত্যাদি যে সমস্ত রাজকার্য্য-সম্বন্ধীয় প্রস্তাব সভাপতি মহাশয়ের কার্য্য-প্রণালীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, সে সমস্ত সমর্থন করিবার আবশ্যকতা দেখিতেছি না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজকার্য্যকে দেশের কাজের সহিত সমঞ্জসীভূত করা,—যাহাতে দুইটী একেরই অঙ্গীভূত হয়। সেই উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী দেশের কাজের প্রবাহ বহাইয়া দিয়া ক্রমশঃ রাজকার্য্যের ধারাগুলিকে তাহার সহিত সম্মিলিত করাই প্রকৃষ্ট প্রণালী। রাজকর্ম্মচারী যেখানে যেমন

আছেন, তাহাতে বিশেষ আসে-যায় না। তাহাদের কার্য্যের খাতাগুলির সহিত দেশের কাজের সংযোগ ঘটানই আমাদের লক্ষ্য। সে লক্ষ্যের সাধনা কিরূপে হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মনে করুন, আজ একটা সৌভাগ্যের কথা যে স্যর সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহ রাজকীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেশের লোকের কাছে এই সকল কার্য্যসম্বন্ধে একটা পরিষ্কার স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,—যথা :—"Local self-government, supplemented by the spread of the co-operative movement, will gradually solve many of our most difficult problems—such as primary education, small industries, improved agriculture, indebtedness of the peasantry, rural sanitation and so forth, and *to this we must devote our best energies and attention in the immediate future*, bearing in mind we have got to build from the village upwards."

তিনি আরও বলিয়াছেন যে—"While I gratefully acknowledge the efforts now being made by the Government in all provinces for truly laying the foundations of local self-government, I cannot help regretting that the Resolution of the Government of India of the last summer does not go far enough or even as far as Lord Ripon's Resolution of 1882 in the direction of recommending less official control and a greater extension of the elective principle

both as to members and chairmen of Rural and District Boards. Let not our rulers forget that self-government implies the right to go wrong, and it is nobler for a nation as for a man to struggle towards excellence with its own natural force and vitality, however blindly and vainly, than to live in irreproachable decency under expert guidance from without."

স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্ধৃত উক্তি হইতে সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা যেরূপ দেশের কাজের ব্যবস্থা করিতে চাই, তাহার সহিত তাঁহার মতের একটা মূলগত ঐক্য রহিয়াছে। তিনিও পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে আমাদের জাতীয় জীবন গড়িবার বিষয়ে আন্তরিক উৎসাহসম্পন্ন। এ অবস্থায় তিনি যখন রাজকীয় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পূর্ত্তাদি বিভাগের মন্ত্রিপদে আরূঢ়, তখন দেশের প্রজা-জীবনের সহিত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড প্রভৃতির সামঞ্জস্যের সম্ভাবনা খুবই অধিক। এই সুযোগ ত উপস্থিত, কিন্তু দেশের শিক্ষিত লোক কি দেশের কাজে আজ লাগিবে?

আমাদের দেশের কাজ কি, আমাদের জাতীয়তা, ধর্ম্ম কি, যদি একবার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবে দেশের লোককে কিরূপ শিক্ষা দিতে হইবে তাহা নির্ণয় করা সহজ হইয়া যায়। প্রত্যেক দেশেই জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রকৃতি নির্ণয় করে। আমাদের দেশেও তাহাই হইবে। প্রচলিত সমস্ত বিদ্যাদির অনুশীলন ত সব দেশেই উচ্চ শিক্ষার বিষয়ীভূত, কিন্তু সেই উচ্চশিক্ষাবিস্তারকে আমাদের দেশে আমাদের দেশের কাজের সম্পূর্ণ অনুকূল করিয়া দিতে হইবে। সেই উচ্চশিক্ষার মধ্যে এমন

একটা ভাবরূপ ভিত্তির সঞ্চার করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে সমগ্র জাতীয় জীবনের দায়িত্ব প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করে, যাহাতে জাতীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য প্রত্যেক শিক্ষিত জীবনের লক্ষ্যে পরিণত হয়, যাহাতে সেই লক্ষ্যানুগত্যের ফলে স্থায়ী দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠে এবং দেশব্যাপী দেশের কাজে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান ও কাজ আশ্রয় করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা করে। আর পল্লীসমাজের নিম্নশিক্ষার ভার পল্লীসমাজকে গ্রহণ করিতে হইবে। এখন যেমন সহরের জীবনকে লক্ষ্য করিয়া সে শিক্ষায় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে পল্লীজীবনের মূলে কুঠারাঘাত পড়ে। ইহার পরিবর্ত্তে পল্লীজীবনের কর্ম্ম ও ভাবসম্পদ কি, তাহা ছেলেদের শিখাইতে হইবে, যাহাতে সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে পল্লীজীবন কিরূপে কেন্দ্রস্থানীয় তাহা ছেলেরা ক্রমশঃ বুঝিতে শিখে, যাহাতে সেই জাতীয় জীবনের আদর্শ শিখিতে চাহিয়া তাহারা সমগ্র জগতের আদর্শ ও শিক্ষায় ক্রমশঃ প্রবেশলাভ করিতে শিখে। এইরূপে পল্লীগ্রামের প্রয়োজনাদি হইতে পত্তন করিয়া চিন্তামূলক শিক্ষা ও সাধনমূলক শিক্ষা, উভয়েই ছেলেদের শিক্ষিত করিতে হইবে। এ শিক্ষায় কোনও আড়ম্বরের দরকার নাই; যেখানে যেরূপ আসবাব-সরঞ্জাম জুটিয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট; পুস্তকপরীক্ষা অপেক্ষা চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তির উৎকর্ষই লক্ষ্য করিতে হইবে। এ শিক্ষার আসল ভিত্তি শিক্ষাদাতার হৃদয় ও প্রাণ। পল্লীসমাজ ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা ইঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন, কারণ পল্লীসমাজের সর্ব্ববিধ শিক্ষার মূলকেন্দ্র হইল পল্লীসমাজের দেবস্থান বা ধর্ম্মস্থান,—হরিসভা,

বারোয়ারিতলা, চণ্ডীতলা প্রভৃতি। এখানে পঞ্চায়েৎ নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে, চাষী-ব্যবসায়ীরা মুখের কথায় আবশ্যকীব শিক্ষালাভ করিবে, অথবা আবশ্যকমত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লইবে, গ্রামবাসীরা নিজ হিতাহিত বিচার করিবে, দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী বিচার করিবে, আপনাদের ধর্ম্মবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সম্পাদন করিবে। এক কথায় এই গ্রাম্য ধর্ম্মস্থানই দেশের কাজে উৎস-স্বরূপ, এবং ইহার ধর্ম্মগতপ্রাণ, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান অধিষ্ঠাতাই 'দেশের কাজ'রূপ তরণীর কাণ্ডারী। তিনি দেশের লোককে তরণীর দাঁড় ধরাইবেন, তিনিই সারি গাওয়াইবেন ;—তিনিই দেশের লক্ষ্যসাধনারূপ তীর্থাবাসের পাণ্ডা।

স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা।*

(উদ্বোধন—পৌষ, ১৩১৮)

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে স্বামী বিবেকানন্দের একটী প্রধান অবলম্বন ছিলেন সিষ্টার নিবেদিতা। অক্ষয় উদ্যমের প্রতিমা তাঁহার সেই পূতমূর্ত্তি আজ অকস্মাৎ কর্ম্মমঞ্চ হইতে অপসারিত হওয়ায়, স্ত্রীশিক্ষা-সমস্যা যেন নবীন প্রভাবে আমাদের চিত্তক্ষেত্র অধিকার করিতেছে। কে বলিতে পারে, মহাপ্রয়াণকালে তাঁহার শিক্ষাব্রতৈকনিষ্ঠ হৃদয়ের করুণ উদ্বেগ অলক্ষিত স্পন্দনে এই জটিল সমস্যাকে আমাদের হৃদয়াভ্যন্তরালে ঐরূপে জাগাইয়া গিয়াছে কি না?

বর্ত্তমান শিক্ষাসমস্যায় মীমাংসার বিষয় প্রধানতঃ দুইটী :— 'কি শিখাইতে হইবে', এবং 'কে শিখাইবে'। কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের স্থূলভাবে একটা উত্তর দেওয়া খুবই সহজ। বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রচলিত বিভাগ যে অধুনা সর্ব্বদেশেই শিক্ষণীয় বিষয় এ কথা সকলেই জানেন। কিন্তু কি শিখাইতে হইবে, এ প্রশ্নের এরূপ অর্থ এখানে অভিপ্রেত নহে।

'কি শিখাইতে হইবে' বলিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যকেই লক্ষ্য করিয়াছি। শিক্ষা শিক্ষার্থীকে কি শিখাইবে, তাহা মোটামুটি এক কথায় বলা যায়। কারণ, শিক্ষাদানের একটা অভীপ্সিত ফল সব দেশেই নির্ণয় করা থাকে। কি শিখাইতে হইবে, এ

* সিষ্টার নিবেদিতার দেহত্যাগের অব্যবহিত পরে এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। ফলতঃ, এই সমস্যার বিস্তারিত আলোচনাপ্রসঙ্গেই "ভারতের সাধনা" শীর্ষক প্রবন্ধপর্য্যায়ের অবতারণা ও সূচনা।

প্রশ্নের উত্তর এক একটা দেশ বা সমাজ, এক এক রকমে দিয়াছে ও দিতেছে। প্রত্যেক দেশ বা সমাজের এক একটা 'জাতীয়'—বা সার্ব্বজনীন লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য অবলম্বনে সেই দেশ বা সমাজটী গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক দেশে ব্যক্তি-গত জীবনকে ঐ 'জাতীয় লক্ষ্য' সাধনের যথাসম্ভব অনুকূল ও সহায়ক করাই তদ্দেশপ্রচলিত শিক্ষার উদ্দেশ্য। মনে কর, যেরূপেই হউক রাজনীতিক একতার দ্বারা ঐহিক প্রতিপত্তি-লাভই একটা দেশের জাতীয় লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহার ফলে, সেই দেশে এমন শিক্ষা প্রচলিত হইবেই হইবে—যদ্দ্বারা সেখানকার লোক রাজনীতির সূত্র ভাঁজিয়া অতি সহজেই ঐহিক উন্নতির পথ দেখিয়া লইতে পারিবে।

তবেই বুঝা যাইতেছে যে, আমাদের দেশে 'কি শিখাইতে হইবে'—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই প্রথমে দেখিতে হইবে, —আমাদের জাতীয় লক্ষ্য কি। আমাদের দেশেও যে একটা সনাতন, সার্ব্বজনীন লক্ষ্য রহিয়াছে—এ বিষয় কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে শুভ ঘটনায় আমাদের জাতীয় জীবনের সূত্রপাত,—অতীতে যতদূর দৃষ্টি যায় চাহিয়া দেখ, উহা আর কিছুই নয়,—ব্রহ্মোপলব্ধি। আমাদের আদিম সমাজস্রষ্টারা ঐ উপলব্ধিকেই পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; অন্য সর্ব্ববিধ অর্থ বা কাম্য বিষয়ের চরম সার্থকতা এই পরমার্থলাভে। এই পরমার্থের অনুশীলন হইতেই আমরা ভাষা, সমাজ, সাহিত্য বিজ্ঞানাদি সমস্ত পাইয়াছিলাম। আবার যাহা কিছু মনুষ্যোচিত সম্ভোগার্থে পাইয়াছিলাম, সে সকলই ঐ পরমার্থের অনুশীলনে

পর্য্যবসিত হইত। পরমার্থের অনুশীলনই একাধারে আমাদের জাতীয় জীবনের উৎস ও লক্ষ্য।

কথাটি সত্য হইলে, আমাদের দেশে প্রকৃত শিক্ষার গতি কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করা শক্ত নয়। যে শিক্ষার দ্বারা সংসারের সকল ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর জীবনকে পরমার্থানুশীলনের সম্পূর্ণ অনুকূল করা যায়, সেই শিক্ষাই আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা।

এখন বুঝিয়া দেখিতে হইবে—কিরূপ শিক্ষার দ্বারা সংসার-সুলভ সর্ব্ববিধ কর্ম্মের মধ্যে পরমার্থানুশীলন করিবার যোগ্যতা শিক্ষার্থী সুনিশ্চিতরূপে লাভ করিতে পারে।

দেহ ধারণ করিয়া মানুষ আপনাকে দুই প্রকার আবেষ্টনের মধ্যে নিহিত দেখিতে পায়;—একটী পঞ্চভূতের ও অপরটী জীব-রাজ্যের। জীব ও পঞ্চভূতের সহিত যোগাযোগই তাঁহার জীবনের সর্ব্বব্যাপক ভিত্তি। এই যোগাযোগকে এক কথায় ব্যবহার বলা যায়। অতএব সম্যক্ ব্যবহারই শিক্ষার আশু লক্ষ্য,—অর্থাৎ, পরমার্থপর ব্যবহার শিখাইবার জন্যই আমাদের দেশে শিক্ষার প্রচলন হইয়াছিল এবং এখনও হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন হইতে পারে—পাশ্চাত্য-শিক্ষানুমোদিত ব্যবহার কি পরমার্থপর নহে? বুঝিয়া দেখ, জড়পদার্থ ও জীবজগতের সহিত কিরূপ ব্যবহার পাশ্চাত্যশিক্ষায় অভিপ্রেত। মানুষে-মানুষে যে ব্যবহার বা যোগাযোগ উপস্থিত হয়, পাশ্চাত্যমতে তাহার সম্বন্ধসূত্র sense of right বা স্বাধিকারবোধ। পাশ্চাত্য জগতে সমাজনীতি, রাজনীতি, চারিত্রনীতি, ব্যবহারশাস্ত্রাদি সমস্তই মানুষের

প্রতি মানুষের অধিকার নির্ণয় করিতেই ব্যস্ত। আমার বা তোমার অপরের কাছে কি প্রাপ্য, অপরের উপর কি দাবী, ইহার নির্ণয় করাই স্বাধিকারতন্ত্রের তাৎপর্য্য। কি সামাজিক, কি রাজনীতিক, কি গার্হস্থ্য,—সকল প্রকার সম্বন্ধের বিচারই এই পাওনা-গণ্ডা, দাবী-দাওয়া রূপ হিসাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে এইরূপ হিসাবের ভাবটা হাড়ে-হাড়ে প্রবেশ করে; তাই আমাদের দেশে আধুনিক সর্ব্ববিধ সংস্কারান্দোলনে পাশ্চাত্যশিক্ষায় সুশিক্ষিত সংস্কারকগণ অধিকার-নির্ণয়কেই মূলসূত্ররূপে অবলম্বন করিতেছেন। তাঁহাদের ধুয়া এই যে, "যাহার যাহা অধিকার, কেন সে তাহা পাইবে না।"

মানুষে-মানুষে যে যোগাযোগ বা আদান-প্রদান, তন্মধ্যে আদানের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়াই স্বাধিকার-নীতির তাৎপর্য্য; ইহার ফলে ভেদকেই সত্য ও নিত্যরূপে মানবসমাজে আসন দেওয়া হয়। কিন্তু মানুষকে অভেদের দিকে লইয়া যাওয়াই পরমার্থপরতার অবশ্যম্ভাবী ফল। অতএব স্বাধিকার-নীতির সহিত পরমার্থপরতা কোন মতেই খাপ খায় না। সেইজন্য দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য রাজনীতিক্ষেত্রে বা সমাজে ধর্ম্মভাবকে প্রতিষ্ঠিত করা কত কঠিন। পাশ্চাত্য জীবনপটে প্রেমের অভেদভাবরূপ রং ধরাইবার 'চার্চ্চ'কৃত শত চেষ্টা তাই যুগে যুগে বিফল হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু জীবে-জীবে ব্যবহারিক আদান-প্রদানে যদি আদানের উপর বেশী ঝোঁক না দিয়া প্রদানের উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া যায়, তবে ফল অন্যরূপ দাঁড়ায়। একজনের উপর আর একজনের

কি দাবী, তাহার হিসাব না করিয়া যদি একজনের প্রতি আর এক-জনের কি দেয়, সেই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্ববিধ সম্বন্ধ নির্ণয় করা হয়, তবে স্বাধিকার-নীতির হাত এড়াইয়া স্বধর্ম্ম-নীতির উপর সমাজ পরিবার প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করা চলে। আদান-প্রদানের মধ্যে আদানের উপর দৃষ্টি রাখা যেমন রজো-গুণের কাজ, প্রদানের উপর দৃষ্টি রাখা তেমনি সত্বগুণের কাজ। একটী হইল ভোগ-দৃষ্টি, অপরটী ত্যাগ-দৃষ্টি। ভোগ-দৃষ্টি হইতে স্বাধিকার-তত্ত্ব, এবং ত্যাগদৃষ্টি হইতে স্বধর্ম্ম-তত্ত্বের উদ্ভব। আমাদের দেশের প্রাচীন জীবনজাল এই স্বধর্ম্মতত্ত্ব অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল; সেজন্য সংহিতায়, পুরাণে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই সমাজের বিভিন্ন অঙ্গের কি স্বধর্ম্ম তাহারই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়।

পাশ্চাত্য ব্যবহার-নীতিজ্ঞ দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, right বা স্বাধিকার ও duty বা স্বধর্ম্ম একই ঢালের এপিট আর ওপিট; স্বাধিকার দিয়া যে সম্বন্ধের নির্ণয় হয়, স্বধর্ম্ম দিয়াও সেই সম্বন্ধের নির্ণয় করা চলে। অতএব এ আশঙ্কা কাহারও হইতে পারে না যে, স্বাধিকারবোধ আধুনিক জগতে সর্ব্ব ব্যবহারের যেমন মূলসূত্র হইতে পারে, স্বধর্ম্মবোধ সেরূপ পারে না।

জীব-রাজ্যের সমস্ত ব্যবহারে যেমন দুই রকম হিসাব প্রচলিত হইতে পারে দেখিলাম, পদার্থ-রাজ্যেও ঠিক সেইরূপ। ভোগ-দৃষ্টি ও ত্যাগ-দৃষ্টি—উভয়কেই পঞ্চভূতের উপরও প্রয়োগ করা চলে। পঞ্চভূতের সহিত আদান-প্রদানে কেবল আদানের দিকে নজর রাখা যেমন চলে, প্রদানের দিকে নজর রাখাও তেমনি সম্ভব। পাশ্চাত্যশিক্ষা পঞ্চভূতকে কেবলই ভোগ্যরূপে

ব্যবহার করিতে শিখায়, ভারতীয় শিক্ষা পঞ্চভূতে পরমার্থতত্ত্বের অধিষ্ঠান অনুভব করিতে শিখায়। পঞ্চভূত ত জীবের ভোগ জুটাইবেই,—পাশ্চাত্য সেই ভোগবিধানের পারিপাট্য ও উৎকর্ষ লইয়াই ব্যস্ত; প্রাচ্য সেই ভোগবিধানে পরমার্থের বিধাতৃত্ব অনুভব করিতে ও তদুদ্দেশ্যে হৃদয়ের পূজা ও শ্রদ্ধা দিতে ব্যগ্র।

এইবার আমরা বুঝিতে পারিব—শিক্ষা ব্যবহারকে কিরূপে পরমার্থপর করিতে পারে। এইবার বুঝিতে পারিব—পাশ্চাত্যের পাঠশালায় পড়িয়া, আমরা কেন এতদিন বিকৃত ব্যবহার শিক্ষা করিতেছি, কেন জাতীয় লক্ষ্য হইতে পদে পদে ভ্রষ্ট হইতেছি। শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিবর্ত্তন ত দরকার নাই,—আধুনিক জগতে প্রচলিত সকল বিদ্যার আলোচনাই সকল দেশের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও শুভপ্রদ,—কিন্তু আমাদের জাতীয় শিক্ষার যে একটা সনাতন ভাব • রহিয়াছে, তাহাতে মর্ম্মান্তিক আঘাত দেওয়া কখনই হিতকর নয়। সবিচার শিক্ষাদান কি সম্ভব নহে?—অর্থাৎ, শিক্ষাদান কালে জীবে-জীবে, অথবা জীবে-জড়ে সম্বন্ধ বিচার যখন সর্ব্বদাই করিতে হইবে, তখন আমাদের জাতীয় standpoint বা সিদ্ধান্তটা আমরা কি শিক্ষার্থীদিগকে সঙ্গেসঙ্গে বুঝাইয়া রাখিতে পারি না?—আমাদের নিজেদের কোটে দাঁড়াইয়া, আমরা কি পাশ্চাত্য জগতের পাঠ গ্রহণ করিতে পারি না? এই প্রশ্নের উত্তরেই শিক্ষা-সমস্যার প্রথমাংশের মীমাংসা নিহিত।

কি শিখাইতে হইবে—এ প্রশ্নের উত্তর,—জাতীয় লক্ষ্যের অনুকূল সম্যক্-ব্যবহার। পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদের ব্যবহারকে যে কতদূর বিকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা আমাদের আদর্শের

তুলনায় অনেকেই ভাবিয়া দেখেন নাই। স্বাধিকারবোধ উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া সমাজে, গৃহে গৃহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, ক্রমাগতই কলহ ও আক্রোশের সৃষ্টি করিতেছে; দেশের সর্ব্বত্রই right বা স্বাধিকার বজায় রাখিবার হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছে; অথচ সর্ব্বত্রই স্বধর্ম্ম কাঁদিয়া ফিরিতেছে। আবার সামাজিক, পারিবারিক সমস্ত সমস্যাই আমরা ভুল দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতেছি। ফলে, কোন মীমাংসাই কার্য্যে পরিণত হইতেছে না। যে মন স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ভাবের খিচুড়ীতে পরিপুষ্ট, তাহার দ্বারা, মীমাংসা ত দূরের কথা, সমস্যাই যথাযথ বুঝিতে পারা দায়; কথায় বলে, 'যে সরষে দিয়ে ভূত তাড়াবে, সেই সরষেতেই ভূতের অধিষ্ঠান।' সেইজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবহারের মূলসূত্রে যে প্রভেদ রহিয়াছে, তাহা দেখাইতে হইল।

ব্যবহার-দৃষ্টির এই তারতম্য প্রথমতঃ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ত্যাগ ও স্বধর্ম্মের সূত্র প্রয়োগ করিতে করিতে যে দেশের সমাজ ও শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, সে দেশের বর্ত্তমান চিন্তায়, সাধনায়, শিক্ষায়, স্বাধিকার ও ভোগের সূত্রকে প্রচলিত করিয়া আমরা একেবারে পথহারা ও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছি। এখন একমাত্র উপায় আবার সনাতন ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত হইবার ঐকান্তিক চেষ্টা। প্রকৃত জাতীয়-শিক্ষার প্রচলন এই চেষ্টার প্রধান অঙ্গ।

'জাতীয় শিক্ষা' অর্থে আমরা বুঝিয়াছি—সমস্ত বিদ্যার তত্ত্বগুলিকে আমাদের সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার-দৃষ্টিতে শিক্ষা দেওয়া। ভারতের একটা আপনার কোট আছে,—সেটা তাহার

নিতান্ত নিজস্ব কোট; এই নিজের কোটে দাঁড়াইয়া আধুনিক সমস্ত মনুষ্যোচিত কর্ম্মে আমাদিগকে যোগ দিতে হইবে। কোন-মতেই এ কোট ছাড়িলে চলিবে না,—ছাড়িলেই পথ হারাইতে হইবে। ভারতের ছাত্রদিগকে ছেলে বেলা থেকে এই কোটটীর সন্ধান দিতে হবে। তাহা হইলেই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেশের সনাতন লক্ষ্যটী ধারণা করিবে ও সমস্ত ব্যবহারে উহা বজায় রাখিতে শিখিবে।

'কি শিখাইতে হইবে'—এ প্রশ্নের একটা মোটামোটি উত্তর পাওয়া গেল। এখন প্রশ্ন এই যে—'কে শিখাইবে'। এক কথায় ইহার উত্তর এই যে, পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার শিখাইতে পরমার্থৈক-নিষ্ঠ শিক্ষকের আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষার প্রচলনে যোগ্য শিক্ষকের আবশ্যকতা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না; শিক্ষাদানের আর সকল রকম ব্যবস্থাকে ঐ মূলভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক কিরূপ হইবে, বা কিরূপ স্থানে বিদ্যালয়ের স্থাপনা হইবে—এ সমস্ত আসল কথা নহে,—সুবিধা ও সুযোগ হিসাবে নির্ব্বাচ্য; কিন্তু কিরূপ শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার অর্পিত হইবে ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

আমাদের বর্ত্তমান সঙ্কটে সুশিক্ষার ভার প্রকৃত ভাবে কে গ্রহণ করিতে পারেন? কে প্রতিক্ষণে আপনার আদর্শ-জীবনের প্রভাব দ্বারা শিক্ষার্থীর মনকে, ভোগতৎপর পাশ্চাত্য ব্যবহার-ক্ষেত্র হইতে দেশের সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহার-ক্ষেত্রে আকৃষ্ট করিয়া আনিতে পারেন? কে শিক্ষণীয় প্রত্যেক তত্ত্বকে প্রকৃত ব্যবহার-দৃষ্টিতে দেখিতে ছাত্রকে শিখাইয়া দিতে পারেন?

যাহার নিজেরই সে দৃষ্টি নাই, সে অপরকে চক্ষু দিতে পারে না। শুধু ভারতবর্ষের অতীত গৌরব বুঝাইলেও চলিবে না, অথবা শুধুই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও বিদ্যাদির আলোচনা করাইলেও চলিবে না। সকল কর্ম্মক্ষেত্রে আমরা সনাতন চরিত্র-মহিমা দেখিতে চাই,—পাণ্ডিত্য বা আচারনিষ্ঠতা ত বাহিরের কথা।

শিক্ষক-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা স্বামী বিবেকানন্দ বারম্বার দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেন—পরমার্থের ঐকান্তিক অনুশীলনের জন্য যাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এখন সেই ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ কর্ম্মযোগীদিগকে দেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, দেশের শিক্ষাদান-কার্য্য আজকাল এতদুর সঙ্কটাপন্ন যে, ঐ কার্য্যে যাহারা প্রধান ব্রতী, দুনৌকায় পা রাখা তাহাদের পক্ষে আর সম্ভব নহে,—সংসার-সংগ্রাম হইতে তাহাদিগকে অবসর লইতেই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের জাতীয় শিক্ষা-তরণীর দাঁড় যিনিই ধরুণ না কেন, উহার হাল পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় এখনও সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্মনিষ্ঠের হাতে সংন্যস্ত থাকা উচিত।

স্ত্রীশিক্ষার কথায় সমগ্র শিক্ষা-সমস্যার কথা সহজেই আসিয়া পড়ে। আমাদের দেশে কিরূপ ভিত্তির উপর স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা পাঠক দেখিলেন। স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নূতন নূতন নানাবিধ আদর্শের প্রবল সংঘর্ষ ও ঝঞ্ঝাবাত হইতে অন্তঃপুরকে আড়ালে রাখিবার ভাব হিন্দু সমাজের যেন মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে; এজন্য আগ্রহদীপ্ত সংস্কারকের হাতে তাহাকে অনেক অপবাদ ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইতেছে। ভাঙ্গা খুবই

সহজ, গড়া বড় শক্ত। এ পর্য্যন্ত দেশের সনাতন ব্যবহারভিত্তি বজায় রাখিয়া নারীচরিত্র গড়িয়া তুলিবার পথ কে দেখাইতে পারিয়াছেন? সেই প্রকৃত পথের নির্ণয় হউক, দেশের অন্তঃপুর কখনই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না,—সমাজগঠনে আমাদের সহায় হইবে। আদর্শ-হিন্দুনারী দেবীভাবে মণ্ডিতা; তাঁহার চরিত্রের সংযম, কমনীয়তা, পরার্থপরতা ও ত্যাগনিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রসূত উগ্র স্বাধিকার-অভিমান ঐ চরিত্রকে যে কতদূর বিকৃত করিতে পারে, তাহা কল্পনা করা কঠিন নহে। স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের উদ্যোগে আমাদের জাতীয় লক্ষ্যকে, আমাদের সনাতন পরমার্থৈকনিষ্ঠ ব্যবহারকে, সেইজন্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিপদক্ষেপে আশ্রয় করিতে হইবে।

বিগত মাসের উদ্বোধনে "স্বামি-শিষ্য-সংবাদে"* স্ত্রীশিক্ষাপ্রচার সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত পাঠক পড়িয়া দেখিয়াছেন। ঐ মতের প্রতিপোষক রূপে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করা হইল। স্বামীজী-সংকল্পিত স্ত্রীমঠ যদিও দেশে এখনও গড়িয়া উঠে নাই,† তথাপি নিবেদিতাপ্রমুখা শিষ্যাগণের সহায়ে

---

* "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ"—উত্তর কাণ্ড (গ্রন্থের), ত্রয়োদশ বল্লী দ্রষ্টব্য।

এতদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থের "পূর্ব্বকাণ্ডে"র নবম বল্লীতে "মহাকালীপাঠশালা" পরিদর্শনান্তে স্বামীজী ঐ প্রসঙ্গে যে সকল মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং "কথোপকথন" নামক পুস্তকে প্রকাশিত "ভারতীয় রমণী—তাহাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ" শীর্ষক আলোচনাপ্রসঙ্গে ও অন্যত্র স্বামীজীর উক্তি সকল এস্থলে প্রণিধানযোগ্য।

† বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে 'নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের' সহিত

তিনি স্ত্রীশিক্ষাপ্রচারের পত্তন করিয়া গিয়াছেন। যদি দেশের লোক তাঁহার স্ত্রীশিক্ষাপ্রচার-চেষ্টার প্রতি সম্যক্ ভাবে একদিন আকৃষ্ট হন, তবে উহার বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা যাইবে। ভারতে শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর স্থান কোথায় —এ সম্বন্ধে স্বামীজীর মতামত ভবিষ্যতে বিশদভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।*
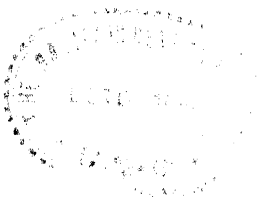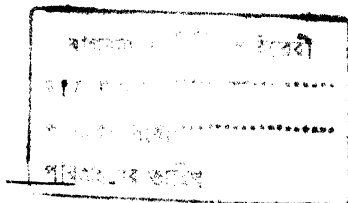
*স্বতন্ত্রভাবে ঐরূপ একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়া সম্প্রতি উহা "সারদামন্দির" নামে স্বামীজী সঙ্কল্পিত স্ত্রীমঠের আদর্শানুযায়ী পরিচালিত হইতেছে।

"ভারতের সাধনা"য় "সন্ন্যাসাশ্রম," "শিক্ষাকেন্দ্র" ও "শিক্ষাপ্রচার" প্রভৃতি প্রবন্ধে এ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

উদ্বোধন।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ-মঠ'-পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা। উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। "উদ্বোধন"-গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা; নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে	গ্রাহকের পক্ষে
বাঙ্গালা রাজযোগ (৫ম সংস্করণ)	১।০	১৵০
" জ্ঞানযোগ (৭ম ঐ)	১॥০	১।৵০
" ভক্তিযোগ (৮ম সংস্করণ)	৸০	॥৵০
" কর্ম্মযোগ (৭ম ঐ)	৸০	॥৵০
" ভারতে বিবেকানন্দ (৫ম সংস্করণ)	২॥০	২।০
" পত্রাবলী ১ম ভাগ, (৫ম সংস্করণ)	॥৵০	॥০
" ঐ ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ)	॥৵০	॥০
" ঐ ৩য় ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৵০	॥০
" ঐ ৪র্থ ভাগ	॥৵০	॥০
" ভক্তি-রহস্য (৪র্থ সংস্করণ)	৸০	॥৵০
" চিকাগো বক্তৃতা (৫ম সংস্করণ)	।৵০	।/০
" ভাব্‌বার কথা (৫ম সংস্করণ)	॥০	।৵০
" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৬ষ্ঠ সংস্করণ)	॥০	।৵০
" পরিব্রাজক (৩য় সংস্করণ)	৸০	॥০
" বর্ত্তমান ভারত (৬ষ্ঠ সংস্করণ)	।৵০	।/০
" মদীয় আচার্য্যদেব (৩য় সংস্করণ)	।৵০	।০
" পওহারী বাবা (৪র্থ সংস্করণ)		
" হিন্দুধর্ম্মের নব্য		
" বীরবা[illegible]		

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্ত্তমান গ্রন্থে অতি উত্তম রূপে বিবৃত হইয়াছে; তাহার প্রধান কারণ—গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক মহদুদার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থখানির আপাততঃ ৫ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। যথা:—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন,—৸৶০ আনা। গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ,—১।০ আনা। গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ,—১॥০ আনা। সাধকভাব,—১॥০ আনা। দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ,—১॥৶০ আনা।

"উদ্বোধন"পত্রের গ্রাহক ইঁহাদের প্রত্যেক খণ্ড যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ কম মূল্যে পাইবেন।—৸০, ১৲, ১৶০, ১৶০, ১।৴০ আনা।

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে—সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত—"Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকে পাঠক স্বামীজীর বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন;—ইহা নিবেদিতার 'ডায়েরী' হইতে লিখিত। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত—(চতুর্থ সংস্করণ)। স্বামীজী ও বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্যামূলক বিষয় সকলে তাঁহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্ব্বে ...স্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি

/স্বামী